শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

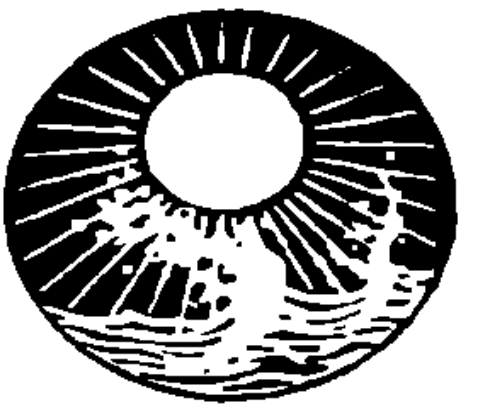

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩)

বিদ্যুৎ-সঙ্কটের জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটে গেল,
এই ত্রুটি মার্জনা করতে পাঠকদের অনুরোধ করি।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	...	৫
সোনার নিয়ম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৮
ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১২
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		...	১৬
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	...	১৯
পথের কথা	শ্রীমা	...	২৮
অন্তর্যামী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৩০
কল্পনা	সুধীর চৌধুরী	...	৩২
শ্রীঅরবিন্দের চুম্বক-আকর্ষণ	রঘুনন্দন দাস	...	৩৫
পণ্ডিচেরী	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	৪৩
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	...	৫১

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	,,	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	,,	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	,,	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nolini Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

যতই এগিয়ে চলা যায়, ভাগবৎ-সান্নিধ্যের প্রয়োজন
ততই অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।

—শ্রীমা।

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব—দশম সর্গ

ক্ষুদ্রতর মানসের রাজ্য এবং দেবতাসকল

এ সবও পার হয়ে যেতে হবে, ফেলে আসতে হবে
সকল জিনিষই, যতদিন পরমে পৌঁছান না যায়
যার মধ্যে শিশু আর জীব সত্তা হয়ে ওঠে, এক হয়ে ওঠে ;
যদবধি সেখানে পৌঁছান না যায় ততদিন আমাদের পথযাত্রার অবসান নাই।
নিরন্তর অনাদি লক্ষ্য এক ওপার হ'তে করে ইশারা ;
নিরন্তর উঠে চলে দেবতাদের সর্পিল গতি,
চেতনার বহ্নি উঠে চলে চেয়ে ঊর্দ্ধপানে।
বহুবর্ণ আনন্দের এই যে নিঃশ্বাস
আর তার শুদ্ধ সমৃদ্ধ মূর্ত্তি যে কালগত পুলকে পূর্ণ,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তারা নিষ্কলঙ্ক মহাসুখে,
গঠিত হয়েছে তারা রসের অখণ্ড স্পন্দনমালায় :
পূর্ণ আত্মার এই যে ভগ্নাংশ
বাঁধা পড়েছে অতি-প্রান্তে মহা আবেগ আলিঙ্গনে,
এই যে সীমাবদ্ধ সত্তা উন্নীত হয়েছে মহাতৃপ্তির শিখরে,
তুষ্ট সে সমুচ্চতম যৎকিঞ্চিতের সামান্য স্পর্শে,
যা কিছু তার ক্ষুদ্র অনন্তের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দৃঢ়বদ্ধ ;
এই তার অন্তহীন কালকৃত-জগৎ মহাকালকে ছাড়িয়ে চলে ;
ভগবানের বৃহৎ আনন্দের এই উচ্ছলিত বিন্দু যত,
মুহূর্ত্তেরা আপনাদের প্রসারিত করে চলেছে চিরন্তন বর্ত্তমানের দিকে,
কালখণ্ড আবিষ্কার করে অবরতাকে।
তবে সন্তুষ্ট তারা তাদের গরিষ্ঠ সম্পদ নিয়ে :
থেমে যায় তারা শিখরে এক, চূড়া যার স্বর্গের অর্দ্ধপথ মাত্র ;
তা হতে দূরে দেখা দেয় সমুচ্চতম শেষ চূড়া—সেখানে তারা উত্তীর্ণ হবে না কখনও ;
সে মহিমার বাতাসে বাঁচে না তাদের প্রাণ।
আপনাদের যে সমুচ্চ অপরূপ রাজ্য সেখানেই তারা আমন্ত্রণ করেছে,
আমন্ত্রণ করেছে যেতে তাদের নিবিষ্ট সূক্ষ্ম অতি-প্রান্তের সীমানায়,
এই জীবাটিকে আত্মরক্ষার জন্য যে আপন সীমানার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ রেখেছে ;
কিন্তু এ সব শিখর প্রত্যাখ্যান করেছে ঊর্দ্ধতর অভিযানের আহ্বান।
সু-তৃপ্ত বাসনার মহিমার মাধুর্য্য
জীবকে বেঁধে রেখেছে আনন্দের সুবর্ণ যূপকাষ্ঠে।
সেখানে আশ্রয় লভে না সেই অন্তঃপুরুষের বৃহৎ প্রসার

যার স্বগৃহ হতে পারে একমাত্র সমগ্র অনন্ত।
স্মৃতি এক ঘাসের মত নরম আর ঘুমের মত অস্ফুট,
এক সৌন্দর্য্য এক আহ্বান সরে সরে মিশে যায় পশ্চাতে,
মধুর সঙ্গীত এক ক্ষীণ হয়ে চলে যায় সুদূরে,
সুদীর্ঘ সমুন্নত পথখানির উপর দিয়ে কালাতীতের অভিমুখে।
ঊর্দ্ধে তার রাজে অনন্ত শুভ্র প্রশান্তি।
ধ্যানমগ্ন চিৎপুরুষ এক লোকশ্রেণীর পরে করে দৃষ্টিপাত—
উজ্জ্বল আকাশের পর আকাশ উঠে চলে যেন,
চলে যায় স্বচ্ছতার দেশ পার হয়ে অনক্ষ্য জ্যোতির দিকে ;
মানসের বৃহৎ জ্যোতির্ময় রাজ্যসব বিচ্ছুরিত হয় শুদ্ধতার অন্তর হতে ;
তবে প্রথম সাক্ষাতে তার, দেখা দেয় এক রজতধূসর প্রসার,
দিন-রাত্রির সম্মিলন সেখানে, অভিন্ন তারা ;
অস্ফুট চঞ্চল আলোরশ্মি এ রাজ্যে
পৃথক করে রেখেছে প্রাণের সংবেদন-স্রোতকে বুদ্ধির আত্মস্থিতি হতে।
অনিশ্চয়তার মৈত্রী
সেখানে গ্রহণ করেছে স্বস্তিহারা শাসনভার,
প্রতিষ্ঠা তার সংশয়ের বিচারগত অনুমানের নিজস্ব স্থান,
অজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অভিসার এই।
নিম্নতম প্রান্তে কণ্টকিত অধিকার রেখেছে তার,
মন সেখানে প্রায় দৃষ্টিহারা, আপনাকে পেয়ে চলেছে অলসগমনে,
তার প্রকৃতি আমাদের পার্থিব প্রকৃতির প্রতিবেশী,
স্বজাতি সে আমাদের অব্যবস্থ মর্ত্য মানসের ;
দৃষ্টি ফিরায় সে মাটি হতে আকাশের দিকে,
আবার আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে,
কিন্তু জানে না নিম্নতরকে, জানে না ঊর্দ্ধতরকে ;
তার অনুভবে রয় শুধু সে নিজে আর বাহ্যবস্তু।
আমাদের মন্থর আরোহণের এই হল প্রথম আশ্রয়—
পশুভাব-পুরুষের যে অর্দ্ধচেতনা
রূপায়িত ঘটনাবলীর সঙ্কুল বন্ধের মধ্যে নিবাস তার,
সে রাজ্য তার বোধগম্য নয়, নয় পরিবর্ত্তনসাধ্য।
শুধু দেখে যায় সে, কাজ করে যায় বিশেষ এক রঙ্গমঞ্চে,
করে দুঃখভোগ, আনন্দভোগ ক্ষণকাল তরে।
ভাবনারাজি অজ্ঞানান্ধ দেহধারী চিৎপুরুষকে চালিয়ে নিয়ে যায়
বেদনার বাসনার পথ ধরে ;
এক জগতে কষ্টশ্রম করে চলে যারা সত্য আবিষ্কার তরে

এই এখানেই রয়েছে তাদের স্থিতিসামর্থ্য, এখানেই তাদের প্রকৃতি-শক্তি :
এখানে সেই অজ্ঞান জীবনধারা রূপের পরিকল্পনা করে,
বাহ্য ঘটনাকেই যে দেখে স্থির-নির্দ্দিষ্ট বিধানরূপে,
কর্ম্ম করে চলে মুহূর্ত্তকে লক্ষ্য করে, অনন্তকে নয়,
লভ্যাংশের হিসাব করে তৎকালীন প্রয়োজন মেটাবার জন্য।
এই যে জড়মন শরীরের শাসক না হয়ে,
চালক না হয়ে হয়েছে তার দাস,
তাকে নির্ভর করতে হয় প্রান্তিকর ইন্দ্রিয়ের উপর,
সে জন্ম নিয়েছে ওই উদ্ভাসিত অন্ধকারের মধ্যে।
মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে আরম্ভে স্খলিত পদে,
দণ্ডে ভর করে যেন অনুমানকে সে দাঁড় করিয়েছে যুক্তির উপরে,
মতবাদকে রাজাসন দিয়েছে নিশ্চিত সত্য যেন,
তার বিচার চলে অর্দ্ধজ্ঞাত হতে অজ্ঞাতের অভিমুখে ;
নিরন্তর সে গড়ে তুলছে চিন্তার ভঙ্গুর গৃহ আপনার তরে,
নিরন্তর খুলে ধরছে নিজে যে-জাল বুনেছে একবার।
গোধূলির জ্ঞানী সে, ছায়া তার মনে হয় তারই আত্মা স্বয়ং ;
জীবনের ধারা তার মুহূর্ত্ত হতে ক্ষণিক মুহূর্ত্তে গতি ;
রাজা সে নির্ভর করে আছে অনুগতদের উপর,
স্বাক্ষর করে দেয় সে অন্ত মন্ত্রীদের নির্দ্দেশের উপর ;
বিচারক সে, পূর্ণ প্রমাণ তার অধিকারে নাই,
কণ্ঠে এক উচ্চারে অনিশ্চিতের স্বীকার্য্য শুধু যত,
জ্ঞানের রূপকার সে, নয় তার উৎস।
শক্তিমান নিজে আপন যন্ত্রের তবু একান্ত দাস,
অধোগত আসন তার মনে করে সে হ'ল তার প্রকৃতির উর্দ্ধতম শিখর ;
বিস্মৃত সে, আপন কৃতকর্ম্মে কৃতি তারই,
আপন অভিমানে সবিনীত অভিমানী সে,
বিশ্বাস তার, জড়মাটির কৃমিকীট সে,
আপন সৃষ্টিকে সে গ্রহণ করে আপনার স্রষ্টারূপে।
চিরন্তন জ্যোতি আর জ্ঞানের মধ্যে উঠে যাব আমরা,
মানুষের সবেমাত্র এই সুরু হতে ঊর্দ্ধপানে আমাদের উত্তরণ ;
পৃথিবীর গুরুভার ক্ষুদ্রতা ভেঙ্গে আমাদের বের হতে হবে,
আমাদের প্রকৃতিকে খুঁজতে হবে তন্ন তন্ন করে অধ্যাত্মের বহ্নিশিখায়,
কীটের ভূলুণ্ঠিত গতি হল তার সগৌরবে পাখা মেলে উড়ে চলবার পূর্ব্বাভাস,
আমাদের মানুষী স্থিতি অঙ্কে নিয়ে চলে ভবিষ্যৎ-দেবতাকে,
আমাদের মর্ত্যদুর্ব্বলতা অমরশক্তি এক।

সোনার নিয়ম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ)

আজ তোমাদের কাছে সোনার নিয়মের কথা বলব। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বিশেষ করে বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতেও শেখান হল কয়েকটি সুবর্ণ নীতি। সেসব মেনে চললে তুমি ভালো, ভালো ছেলে ও ভালো মেয়ে, সকলের তুমি প্রিয়, সকলের কাছে তোমার সমাদর। এসব নিয়ম সহজ সরল এবং সর্বজনবিদিত; তোমরাও জানো এবং কাজে লাগাতেও চেষ্টা নিশ্চয় করেছ। এই যেমন "সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলিও না, পিতামাতার আদেশ পালন করিও, শিক্ষকদের সম্মান দিবে, কাহারো মনে আঘাত দিতে নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভিত্তির উপরই গড়ে তুলতে হবে নিজের চরিত্র, দাঁড় করাতে হবে নিজস্ব স্বভাব, চলতে পবিত্র নির্মল মহৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি।

এরা—এসব নিয়মনীতি—বেশ ভালো, যতদূর তাদের ক্ষমতা: তবে সত্যি বলতে গেলে, এরা বেশি দূর নিয়ে যায় না। এসব তোমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শই করে না। বলা হয় যেমন, এরা তোমার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যায়। তোমার হৃদয় মথিত করে না, অন্তরাত্মাকে ধরে বসে না। যদি খুব আগ্রহী হও তাহলে দিন কতক এ-নীতি কিম্বা ও-নীতি পালন করে সেসব ভুলে যাও।

সেদিন তোমাদের কাছে যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী বলছিলাম; তাঁর দেওয়া নিয়মটা সুবর্ণ নীতির আরো কাছাকাছি। কার্যত তিনি বলতে চেয়েছিলেন এসব বাহ্য নিয়ম সূত্র না মেনে বরং সরিয়ে দেবে, ঢুকে পড়বে ভিতরে, খুঁজে বের করবে নিজের নিজেকে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে তোমার প্রতিবেশী বা ভাই বলে নয়, ভালোবাসবে তার মধ্যে নিজেকে পাও বলে। আসল আপনাকে খুঁজে বের কর, এইটেই হল সুবর্ণ নীতি। তোমার মধ্যে যে আত্মা তাকে আবিষ্কার কর, তখনই দেখবে সেই আত্মা তোমার প্রতিবেশীরও মধ্যে, সকলের মধ্যে।

এখানে সতর্ক থাকবে নিজের সঙ্গে নিজের আত্মাকে যেন গুলিয়ে না ফেল। যখন বলা হল তোমার আত্মাকে খুঁজে বের কর তখন তার অর্থ নয় অন্যের ভিতরে নিজের ব্যক্তিগত আত্মাটিকে পাও এবং একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই তাকে গ্রাস করে ফেল। এই আত্মা অহং নয়—অহমাতীত, এ-টি সেরকম আত্মপ্রাপ্তি নয় যা শেক্সপীয়র রিচার্ডে চিত্রিত করেছেন—যেখানে রাজা সর্বস্ব হারিয়ে, সারা পৃথিবীতে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বলে উঠলেন: "রিচার্ড রিচার্ডকে ভালোবাসে; অর্থাৎ, আমি আমি;" কারণ এই আমিত্ব খণ্ডিত সীমিত বিচ্ছিন্ন নয়; আমার আমির সঙ্গে এখানে সবার আমি মিলিয়ে ডুবে যায়, সব হয়ে যায় একক্ বা এক আত্মা, এই সব একনাত্মা স্বতন্ত্র হলেও পৃথক আমি বলে প্রতীয়মান হলেও, একই আত্মা।

প্রসঙ্গত এখানে ছেলেমেয়েদের কাছে বলা মায়ের একটি গল্প উল্লেখ করব। তিনি

যখন কলাগীদেশে ছিলেন তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুরা সমবেত হয়ে বিষয় নিয়ে আলোচনা বা ধ্যান করতেন। সেই সভায় আসতেন জনৈকা অসাধারণ মহিলা যাঁর সত্যকার উপলব্ধির সম্ভার ছিল এবং অপরকে এপথে চলবার সাহায্যে প্রস্তুত। একদিন কথা হচ্ছিল আত্মা ও পুনর্জন্ম নিয়ে—তিনি বলছিলেন কি করে দেহের মৃত্যুর পরে আত্মা অন্য জগতে চলে যায়, তারপর সময় হলে তারা প্রত্যেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে মানবাধার গ্রহণ করে। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বিভ্রান্ত বোধ করলেন এই জন্ম বিষয়ে এবং আরো ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন (প্রশ্নকর্ত্রী মহিলা): "বলছেন আত্মা নেমে এসে জন্ম গ্রহণ করে, অর্থাৎ মানবদেহ ধারণ করে। কিন্তু যতো জন্মসংখ্যা তো বেড়েই চলেছে, বছর বছর জনসংখ্যাও তেমনি ক্রমেই অতীতের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল প্রত্যেক বছরের বাড়তি জন্ম নিয়ে—তারা আগে কোথায় ছিল? সৃষ্টির প্রথম থেকেই কি তারা ছিল—অপেক্ষায়? তারা কালক্রমে একে একে দেখা দেয় ঠিক নিজের নম্বরটি বুঝে? আধুনিক যুগে আমরা আর একটি উপমা নিতে পারি। একি সেই অগণ্য তারা বা নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো যারা কালের প্রবাহ বেয়ে আমাদের নীলাকাশের সীমানার মধ্যে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে, সেই কোন বাস্তবে সুদূর তারাদের মতো যাদের আলো আজকের পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে এত সময় লাগছে?' প্রশ্নকর্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন: "তাহলে আত্মাদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, গোণা যায় তাদের?" বক্তা উত্তর দিলেন, "নির্দিষ্ট তাদের সংখ্যা এবং গোণা যায় তাদের।" দারুণ কৌতূহলাক্রান্ত উৎসুক প্রশ্নকর্ত্রী তখন বললেন, "কত তারা সংখ্যায়?" বক্তা শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে আঙুলের নির্দেশিকাটি তুলে ধরলেন, বললেন—'মাত্র একটি'।

আসল সত্য এই। এই যে বহু দেহী দেখছ, বহু লোক দেখছ, এটা বাহিরের দৃশ্য মাত্র—আসলে আত্মা একটিই, সকলেই ওই একটি। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে সকলকে সমান ভালোবাসতে পারবে, ভালোবাসার অধিকন্তু সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে যেহেতু তুমি তখন অপরাপর হয়ে যাও আর অন্যরাও তুমি। এই বিশ্বাস, তোমার এই আসল আত্মাকে খুঁজে পেতে হবে, জানতে হবে, হয়ে উঠতে হবে তা-ই। আদর্শ সোনার সূত্রটির সেরা এটি।

এই প্রাপ্তি ও সিদ্ধির পথ কি?

মা এ বিষয়ে আমাদের দিয়েছেন সুবর্ণ সূত্র—সত্যই সোনার নিয়ম এবং অতি সহজ নিয়ম। সাধারণতঃ কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত—কি কর্তব্য আর কিই বা অকর্তব্য, কোন রকম করণীয় আর কোন রকমে অকরণীয়। মা তাঁর সন্তানদের বলেছেন—"আমার সামনে যে কাজ করতে দ্বিধা বা লজ্জা হয় তা করবে না। আমার সামনে যে কথা বলতে দ্বিধা বা লজ্জা হয় তা বলবে না। আমার সামনে যা ভাবতে সঙ্কোচ হয় তা মনেও আনবে না।" তাহলে, এই রকমে চেষ্টা কর, দেখবে কি রকম সুবর্ণ সূত্র ও সহজ নিয়ম এটি। শ্রীঅরবিন্দ এরই সমর্থন করেছেন এবং একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—তোমরা সকলেই জান পরিচিত বাক্যটি—"সর্বদা আচরণ করবে এমনভাবে যে মা যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন; কারণ সত্যিই তো তিনি সর্বদা উপস্থিত।" তোমার কষ্টকল্পনার দরকার নেই

যে তিনি সম্মুখে আছেন ; সত্যই বাস্তবভাবে তিনি রয়েছেন উপস্থিত তুমি তা কল্পনা কর আর না-ই কর ; তুমি অন্ধ তাই তুমি জান না, অথচ তিনি ঠিক সর্বদাই রয়েছেন—তোমাকে দেখছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন, চালিয়ে নিয়ে চলেছেন, রক্ষা করছেন। তুমি কি করছ শুধু তাই তিনি দেখছেন না, দেখছেন আবার তোমার ভিতরের অনুভূতিও, তোমার গোপনতম চিন্তাটি পর্যন্ত। একজন বালক তার সারলাভরে জিজ্ঞাসা করেছিল," আমরা কি করি, কি ভাবি, কি অনুভব করি, কি রকমে তা তুমি ধরতে পার ?" হেসে মা উত্তর দিয়েছিলেন, "বাছা, তুমি যে আমার ভিতরে, আমার আলিঙ্গনের মধ্যে সর্বদা। তাই তো জানি। নিজের ভিতরে কি ঘটছে আমি তা জানি, জানি না ? সেই জন্যই তোমার মধ্যে কি হচ্ছে তা দেখতে পাই, তুমি আমার অংশ, আমি তুমিও।"

এখন যদি এই সহজ সূত্রটি নিষ্ঠাভরে ক্রমাগত মেনে চল তাহলে দেখবে তোমার ভিতরে কি পরিবর্তন যাদুবলে ঘটছে, কনকোজ্জ্বাতি জননীর সোনার ছেলে হবে তুমি। দেখতে পাবে তোমার চিন্তা তোমার কথা তোমার অনুভূতি তোমার প্রবৃত্তি একটা নতুন রং নিয়েছে, তোমার শরীর পর্যন্ত একটা নতুন স্বাস্থ্য ও দ্যুতি পেয়েছে। সাধারণত আমাদের মস্তিষ্ক মাটির তৈরী, চিন্তাও মালিন্যময়—ভুল ভাবনা, মলীমস ভাবনা সেখানে ; আমাদের রসনা কাদা-মাটিতে গড়া—ভুল বলি আমরা, বলি অপবিত্র জিনিস ; আমাদের হৃদয়ও ওই একই পদার্থে গঠিত—সে প্রকাশ করে অনুচিত ও অপরিচ্ছন্ন বোধ ; আমাদের প্রকৃতির নিম্নস্তরে প্রাণের রাজ্যে প্রবৃত্তি সবও ভ্রান্ত কর্মমাত্র অপরিষ্কার ; আর পরিশেষে, দেহ ত মাটিই—ব্যাধি, দুর্বলতা ও অক্ষমতার সমষ্টি। বলতে গেলে আমরা হলাম যেন এই কুৎসিৎ অপরিষ্কৃত মিশ্রণ-ভরা আধার। এখন এর ভিতরে তাহলে ঢেলে দিতে হবে সোনালী ধারা—গলিত স্বর্ণই, যাতে ক্ষয়ে যাবে ধুয়ে যাবে সব মালিন্য সব অশুদ্ধি, পাত্রটি হবে ঝকঝকে স্বচ্ছ, তার নিজস্ব জ্যোতিপদার্থ সেখানে ভরে দিতে হবে—বাহ্যের উপস্থিতির গলিত স্বর্ণ।

এই প্রক্রিয়ার শ্রীঅরবিন্দ স্বীয় কবিতায় কি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। উপসংহার করছি কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে—

তোমার সোনালী আলো নেমে এল আমার চিন্তাকোষে
মনের ধূসর কক্ষগুলি সূর্য-ছোঁয়া হয়ে উঠল,
জ্ঞানের গহন লোকের প্রদীপ্ত উত্তর,
প্রশান্ত এক জ্যোতিস্মান ও একটি অগ্নিশিখা।

তোমার সোনালী আলো নেমে এলো আমার কণ্ঠে,
আমার সকল বাণী এখন ভাগবত সুর,
তোমার আনন্দগীত আমার একটি স্বর ;
আমার কথা সব অমরত্বের মদিরায় আবিষ্ট।

তোমার সোনালী আলো নেমে এলো আমার হৃদয়ে
তোমার শাশ্বতত্ব দিয়ে আমার জীবনকে আঘাত ক'রে ;

এখন সে তোমাকে নিয়ে মন্দির হয়ে উঠল
আর সব প্রবৃত্তি উন্মুখ শুধু তোমারই দিকে।

তোমার সোনালী আলো নেমে এলো আমার দুটি পায়ে
আমার পৃথিবী এখন তোমার ক্রিড়াঙ্গন তোমার আসন।*

---

* The Golden Light

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

৫ম মণ্ডল—৯ম সূক্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১। ত্বামগ্নে হবিষ্মন্তো দেবং মর্ত্যাস ঈডতে।
মন্যে ত্বা জাতবেদসং স হব্যা বক্ষ্যানুষক্ ॥ ১ ॥
ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
হবিষ্মন্তঃ—হোমসাধকেরা, আহুতিধারকেরা
দেবম্—দেবতাকে
মর্ত্যাসঃ—মর্ত্যজীবেরা
ঈডতে—পূজা করে
মন্যে—মনন করি, ধ্যান করি
ত্বা—তোমাকে
জাতবেদসম্—জন্মবিৎ-কে, সকল জন্ম জানে যে তাকে
সঃ—সে
হব্যা—আমাদের আহুতিসব
বক্ষি—বহন করে চল
আনুষক্—নিরন্তর

হে অগ্নি, দেবতা তুমি, তোমাকে মর্ত্যজীবেরা আহুতি নিয়ে আরাধনা করে : তোমার ধ্যান করি আমি, সর্বজন্মজ্ঞাতা তুমি, তুমি নিরন্তর আমাদের আহুতি বয়ে নিয়ে চল ॥১॥

২। অগ্নির্হোতা দাশ্বতঃ ক্ষয়স্য বৃক্তবর্হিষঃ।
সং যজ্ঞাসশ্চরন্তি যং সং যাজ্যাসঃ শ্রবস্যবঃ ॥ ২ ॥
অগ্নিঃ—অগ্নি
হোতা—হোতা, আহুতিদাতা
দাশ্বতঃ—দাতাদের, দানকারীদের
ক্ষয়স্য—আবাসস্থান যে তার, গৃহভুক্ত যে তার
বৃক্তবর্হিষঃ—আসন পেতে রেখেছে যে তার
যজ্ঞাসঃ—যজ্ঞক্রিয়াসব
সম্+চরন্তি—তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয় গিয়ে
যম্—যার মধ্যে
সম্—(চরন্তি)—সম্মিলিত হয়

বাজাসঃ—পূর্ণ আসন্দ সব
শ্রবস্যবঃ—শ্রৌতজ্ঞান সব

দানকর্তা যে, গৃহভুক্ত যে, আসন প্রসারিত করে রেখেছে, তার আহুতি নিয়ে চল তুমি, হে অগ্নি, আমাদের সকল যজ্ঞকর্ম, আমাদের সকল পূর্ণ আসন্দ, আমাদের শ্রৌতজ্ঞানসব তোমারই, তোমারই মধ্যে গিয়ে সম্মিলিত হয়েছে ॥২॥

৩। উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী।
ধর্ত্তারং মানুষীণাং বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥৩॥

উত, স্ম—অবিকন্তু, আরও
যম্—যে, যাকে
শিশুম্—শিশুকে
যথা—যেমন
নবম্—নূতন, নব
জনিষ্ট—জন্ম দিল
অরণী—জ্বালানী কাষ্ঠদ্বয়
ধর্ত্তারম্—ধারককে
মানুষীণাম্—মানুষী
বিশাম্—জীবদের
অগ্নিম্—অগ্নিকে
সু অধ্বরম্—সুষ্ঠু যজ্ঞরূপী

অরণিদ্বয় নবজাত শিশুর মত জন্ম দিল অগ্নিকে, মানুষী জীবদের ধারণ করে যে, সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞকে প্রচালিত করে যে ॥৩॥

৪। উত স্ম দুর্গৃভীয়সে পুত্রো ন ক্রার্ষাণাম্
পুরু যো দগ্ধাসি বনাগ্নে পশুর্ন যবসে ॥৪॥

উত, স্ম—অবিকন্তু
দুঃ-গৃভীয়সে—কষ্টসাধ্য, দুঃসাধ্য তোমাকে বশীভূত করা (দুর্গ্রহণীয়)
পুত্রঃ—পুত্র
ন—যেমন
ক্রার্ষাণাম্—কুটিলগতিদের
পুরু—বহুল, অনেক
যঃ—যে তুমি
দগ্ধা অসি—দহন কর
বনা—বনসব, অরণ্যসব
অগ্নে—হে অগ্নি

পশুঃ ন—পশুর মত
বনসে—তৃণমধ্যে

দুঃসাধ্য তোমাকে ধরে রাখা, কুটিলতার সন্তানের মত, বহন অরণ্যসব তুমি দহন করে চল তৃণদলের মধ্যে পশুর মত, হে অগ্নি ॥৪॥

৫। অব স্মৃ যস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংবর্তি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো দিব্যুপ ধ্মাতেব ধমতি শিশীতে ধ্মাতরী যথা ॥৫॥

অব, স্মৃ—তারপরে
যস্য—যার
অর্চয়ঃ—শিখারাজি
সম্যক্—সম্যক
সম্বর্তি—সম্মিলিত হয়
ধূমিনঃ—ধূমিবেগময়, ধূমল বেগময়
যৎ—যখন
ঈম্—তাকে
অহ—আহা!
ত্রিতঃ—তৃতীয় (সত্তা), ত্রিকূট দেবতা
দিবি—স্বর্গে
উপ—সামীপ্যে
ধ্মাতা ইব—লৌহকারের মত
ধমতি—চালাই করে
শিশীতে—শাণিত করে
ধ্মাতরি—লৌহকারের (নিজের মধ্যে)
যথা—যেমন

ধূমল তার প্রজ্বলন্ত শিখাসব পূর্ণ সম্মিলিত হয়, যখন দেব ত্রিত স্বর্গে লৌহকারের মত তাকে চালাই করে, লৌহকারের নিজের মধ্যে যেন আপনাকে শাণিত করে ধরে ॥৫॥

৬। তবাহমগ্ন ঊতিভির্মিত্রস্য চ প্রশস্তিভিঃ।
দ্বেষোযুতো ন দুরিতা তুর্যাম মর্ত্যানাম্ ॥৬॥

তব—তোমার
অহম্—আমি
অগ্নে—হে অগ্নি
ঊতিভিঃ—(1) by guardings (রক্ষণ)—রক্ষণ দ্বারা
(2) by expandings (শ্রীঅরবিন্দ)—প্রসারণতাদের সহায়ে
মিত্রস্য—মিত্রের

চ—এবং
প্রশস্তিভিঃ—(সায়ণ) : utterances—স্তোত্র
(শ্রীঅরবিন্দ) : expressings—প্রশস্তিসকলের সহায়ে
ক্ষেম-যুতঃ—ক্ষেমযুক্ত (সায়ণ)
শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ—(beset by : শ্রীঅরবিন্দ)
ন—যেন
দুঃ+ইতা=দুরিতা—পদস্খলনসব
তুর্যাম—উত্তরণ করব
মর্ত্যানাম্—মর্ত্যজনদের

হে অগ্নি, তোমার প্রসারিতা সব আর দেব মিত্রের প্রশাস্তসব আশ্রয় করে আমরা শত্রুশক্তি অবরুদ্ধ মর্ত্যজনের বিপথ পদস্খলন সব যেন অতিক্রম করে যাই ॥৬॥

৭। তং নো অগ্নে অভী নরো রয়িং সহস্ব আ ভর।
স ক্ষেপয়ৎ স পোষয়দুরুব্যচস্যা সাতয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥৭॥
তম্—সেই
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
অভি—অভিমুখে
নরঃ—মানুষ (আমাদের)
রয়িম্—আনন্দসম্পদ
সহস্বঃ—হে শক্তিমান, হে বীর্যবান
আ ভর—নিয়ে এস ; সঃ—সে
পোষয়ৎ—যেন পুষ্টিসাধন করে
তুরুৎ—হয় যেন
ব্যচস্যা—পূর্ণতার (of the plentitude : শ্রীঅরবিন্দ)
সাতয়ে—বিজয়ের জন্য
উত—আর
এধি—এস তুমি
পৃৎসু—সকল সংগ্রামে
নঃ—আমাদের
বৃধে—বৃদ্ধির জন্য

হে অগ্নি, হে বলাধার, মানুষ আমরা, আমাদের কাছে নিয়ে এস সেই আনন্দসম্পদকে ; সেই অগ্নি আমাদের যেন সম্মুখে প্রচালিত করে, আমাদের পুষ্টিসাধন করে, আমাদের সঙ্গে থাকে পরিপূর্ণতার জয়ের জন্য। তাই এস তুমি, আমাদের সকল সংগ্রামে আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য ॥৭॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যাসহ)

২৭২—যে কেউ আধ্যাত্মিক শ্রেণীতে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে চায় তাকে অশেষ প্রকারের পরীক্ষাদি পাস করতে হয়। কিন্তু অনেকেই চায় পরীক্ষককে ঘুষ দিয়ে উত্তীর্ণ হতে।

২৭৩—লড়ে যাও—যতক্ষণ তোমার হাত খালি আছে ততক্ষণ হাত দিয়ে, বাণী দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে, সব রকমের অস্ত্র দিয়ে। কিন্তু শত্রুর কারাগারে কি তোমাকে শিকল বেঁধে রেখেছে, মুখ বেঁধে দিয়েছে? তাহলে তোমার নীরব আত্মা দিয়ে আর বিস্তৃত ইচ্ছাশক্তি দিয়েই লড়ো, এমন কি মৃত্যুতেও লড়বে, ভগবান তোমার মধ্যে যে জগৎব্যাপী শক্তি দিয়ে রেখেছেন তারই জোরে।

মা—সত্যকে জয় করা খুব আয়াসসাধ্য ও কঠিন। সেজন্য এমন যোদ্ধা হওয়া চাই যে হবে নির্ভীক, শত্রুকে বা মৃত্যুকে সে ভয় করবেনা, কারণ তাকে লড়তে হবে সারা জগতের বিরুদ্ধে, দেহের দ্বারা বা এমন কি দেহশূন্য অবস্থায়, তবে সংগ্রামে জয় হবে।

৬-১-১৯৭০

২৭৪—তুমি কি ভাবো যে তপস্বী তাঁর গুহার মধ্যে বা পর্বতশিখরে বসে থাকেন নিষ্কর্মা পাথর হয়ে? সে কথা কী তুমি জানবে? তিনি হয়তো তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তির স্পন্দনে আত্মিকশক্তির চাপে দুনিয়াতে কত পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন।

২৭৫—মুক্ত পুরুষ পাহাড়ের মাথায় বসে আত্মার মধ্যে যা দেখছেন তারই ফলে বাস্তব জগতে বীর ও মহৎ ব্যক্তিরা এসে তাঁদের কাজ করছে ও বাণী দিচ্ছে।

২৭৬—থিওসফিষ্টরা ঘটনা সম্পর্কে ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু মূলতঃ তারা নির্ভুল। হয়তো ভারতে বরফের মধ্যে বসে থেকে কোনো মুক্ত আত্মা তাঁর স্বপ্নেতে ভগবানকে পেয়েছিলেন, স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্ব ও সমত্বের স্বরূপে আর তাতেই ঘটেছে ফরাসী বিপ্লব।

মা—এতে বোঝা যায় যে আত্মিক শক্তি পার্থিব শক্তির চেয়ে কত বেশি বড়ো। তবে সার্থকতা আনবার জন্য দুএরই দরকার। ৭-১-১৯৭০

২৭৭—সব রকমেরই কথা ও কর্ম তৈরি হয়ে আসে শাশ্বত নীরবতা থেকে।

২৭৮—সমুদ্রের গর্ভে কোনো চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু উপরে রয়েছে বিপুল কলরোল আর তটের উপর তরঙ্গাঘাত। মুক্ত আত্মার বেলাতেও তাই হয়, প্রচুর কর্মকোলাহলের মধ্যে থেকে। আত্মা কিছুই করেনা, কেবল কর্মের প্রশ্বাস নিক্ষেপ করে।

মা—এতে বোঝাচ্ছে যে কর্ম প্রথমে জন্মায় চেতনার মধ্যে, আর জীবের ভিতরকার এক স্বতন্ত্র শক্তি তাকে বাস্তবে রূপ দেয়, লোকে ভাবে সেই তার প্রবর্তক। ৮-১-১৯৭০

২৭৯—হে ভগবানের সৈনিক ও বীর যোদ্ধা, তোমার পক্ষে শোক দুঃখ বা লজ্জা কোথায়? তোমার জীবনই একটা গৌরব, সকল কর্ম তোমার নিবেদিত, জয় তোমার দিব্যত্ব, আর পরাজয়ও তোমার জয়।

মা—ভগবানে যে নিবেদিত তার দুঃখ লজ্জা নেই, কারণ ভগবান সর্বদা তার কাছে কাছে থাকেন, তাই সব কিছুই তার পক্ষে গৌরবময়। ৯-১-১৯৭০

২৮০—তোমার নিম্ন প্রকৃতি এখনও কি পাপ ও শোকে বিচলিত হয়? কিন্তু তার উপর দিকে রয়েছেন বসে দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে তোমার আত্মা, স্বরাট, প্রশান্ত, মুক্ত, জয়যুক্ত। বিশ্বাস রাখো যে শেষ হবার আগেই মা তাঁর কাজ সমাধা করবেন, তোমার সত্তার উপাদান বস্তুকে পর্যন্ত আনন্দে ও বিশুদ্ধতায় পূর্ণ করে দেবেন।

২৮১—তোমার হৃদয়ে যদি এখনও কষ্ট থাকে, বহুকাল যাবৎ কোনো উন্নতি না হয়ে থাকে, শক্তি ঝিমিয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাদের অতি প্রিয় পরম প্রভুর সেই কথাটি মনে রেখো—"আমিই তোমাকে সকল পাপ ও দুঃখ হতে রক্ষা করব, তার জন্য শোচনা কোরোনা।"

মা—শ্রীঅরবিন্দ এখানে আমাদের আত্মাকে বলছেন প্রত্যেকের ভিতরকার ভগবৎ উপস্থিতির কথা; সেই উপস্থিতির নিশ্চয়তা হলো আমাদের সকল দুঃখের সান্ত্বনা, কারণ শেষ পর্যন্ত তার জয় হবেই। ১০-১-১৯৭০

২৮২—শুচি আছে তোমার আত্মায়; কর্মের মধ্যে শুচি অশুচি কিসের?

মা—শ্রীঅরবিন্দ এখানে সাধারণ শুচির কথা বলছেন না। শুচি মানে এখানে "ভগবানের প্রভাব" তাঁরই প্রকাশ। বর্তমানে পৃথিবীর সকল কর্মে তা হয় না।

১২-১-১৯৭০

২৮৩—হে মৃত্যু, আমাদের ছদ্ম বন্ধু ও সুযোগদাতা, কবে তুমি তোমার ফটক খুলে আগের থেকে আমাদের জানিয়ে দিতে ইতস্তত করবেনা; কারণ তাহলে আমরা তোমার লৌহ ঝনঝনাতে কোনো ভয় পাবোনা।

২৮৪—মৃত্যু কখনো কখনো বর্বর পরিচারক হয়, কিন্তু সে যখন তার পার্থিব পোষাক বদলে ফেলে জাঁকালো পোষাক নেয়, তখন তার সে বর্বরতা ক্ষমা করা যায়।

২৮৫—হে অবিনশ্বর আত্মা, তোমাকে হত্যা কে করবে? হে আনন্দময় আত্মা, তোমাকে পীড়ন কে করতে পারে?

প্রশ্ন—ব্যথাবেদনা মানুষের বিবর্তনে কিরূপ অংশগ্রহণ করেছে?

মা—কষ্ট, দুঃখ, কামনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যত প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব সকল কাজ

প্রশ্ন—তবে জগতে প্রথম থেকেই মৃত্যুকে ঘিরে এত ব্যথা বেদনা কেন?

মা মানুষের অহং ও অজ্ঞতাই ওর কারণ। কিন্তু ঐ সব ব্যথা বেদনাগুলো মানবের বিবর্তনের কাজে অংশ গ্রহণ করে। ১৩-১-১৯৭০

করে অচেতনার ভিতর থেকে চেতনাকে জাগাতে, এবং সেই চেতনাকে আরো উন্নতির প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে। ১৪-১-১৯৭০

২৮৬—তোমার ভিতরকার অংশগুলি যখন হতাশা ও দুর্বলতাকেই পছন্দ করবে, তখন তুমি এই কথা ভেবো, "আমি হচ্ছি সেই ব্যাক্কাস ও আরেস ও অ্যাপোলো প্রভৃতি দেবতা ; আমি হচ্ছি অগ্নি, অজেয় এবং বিশুদ্ধ ; আমি হচ্ছি সর্বদা প্রজ্বলন্ত সূর্য।

২৮৭—নিজের মধ্যে Dionysian উচ্ছ্বাস থেকে সংকুচিত হয়োনা, তবে এটা দেখবে যেন তার ভারসুখে তৃণখণ্ডবৎ না হয়ে যাও।

২৮৮—সকল দেবতাকেই সহ্য করতে শেখো, ভিড় ক'রে এলে তার চাপে বিচলিত হয়ে যেন ভেঙে পড়ো না।

মা—এর মানে, বিভিন্ন ধর্মের নানা দেবতাদের সম্পর্কে কেউ যেন ভয় না পায়, কারণ মানুষ হওয়াতে আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁরই বিষয়ে আমরা ওর থেকে চেতনা পেতে পারি। ১৫-১-১৯৭০

২৮৯—মানুষ তার শক্তি ও আনন্দে ক্লিষ্ট হয়ে দুঃখ দুর্বলতাকেই কাম্য ও গুণ বলে মেনেছে, জ্ঞানে ক্লান্ত হয়ে অজ্ঞানতাকেই শ্রেয় করেছে, প্রেমে ক্লান্ত হয়ে হৃদয়হীনতাকেই উন্নতি ও প্রজ্ঞা বলে জেনেছে।

২৯০—সহ্য করা নানা রকমের। আমি ভীরুকে দেখেছি প্রবলের কাছে গাল পেতে দিতে। দুর্বলকে দেখেছি সবল অত্যাচারীর কাছে মুখ বুজে চেয়ে থাকতে। আর শ্রদ্ধেয়কে দেখেছি ঢিল মারলে খুশি হয়ে হাসতে। প্রথমটি উপহাস্য, দ্বিতীয়টি ভয়াবহ আর তৃতীয় সহ্যটি হলো সাধু ও দিব্য ভাবাপন্ন।

মা—শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, সব কিছু অবস্থাতেই প্রেম বিকাশ ভগবত্তার লক্ষণ, যে আঘাতকারীকেও ভালোবাসে ও প্রেম দেখায়, সে মানুষকে কী শিক্ষাই দেয়। ১৭-১-১৯৭০

২৯১—আপন আততায়ীকে ক্ষমা করা মহত্ত্ব বটে, কিন্তু অন্যের প্রতি অত্যাচারের বেলাতে তা নয়। তবু তাতেও ক্ষমা করতে পারো, কিন্তু দরকার মত তার শোধও নিতে পারো।

২৯২—এশিয়ার লোকে হত্যাকাণ্ড করলে তাকে বলা হয় অন্যায় অত্যাচার ; ইউরোপের লোকে তা করলে বলা হয় যুদ্ধের ক্রিয়া। দুই জিনিসের মধ্যে তফাৎ বিচার ক'রে জগতের ন্যায়নীতি বুঝে নাও।

মা—এতে বোঝাচ্ছে মানুষের বিচারশক্তি কি অন্ধতা ও তাদের অহমিকার কি প্রতিক্রিয়া। মানুষ যতকাল অজ্ঞান থাকবে ততকাল তাদের বিচারবোধ ও মতামতের কোনো মূল্য নেই সত্যের কাছে, এই কথা জানা চাই।* ২০-১-১৯৭০

—শ্রীমা

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"আমরা যার সম্বন্ধে ভাবি তা আমাদের ঘিরে থাকে।"

উত্তর : এটি খুব দামী কথা। তুমি যদি খারাপ কথা ভাবো তাহলে খারাপই ঘিরে থাকবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন—"অহং চেতনাকে ত্যাগ করা সোজা কথা নয়। বাইরের চেতনাতে তাকে জয় করলেও আধ্যাত্মিকের দিকে তা আরো বেড়ে ওঠে।"

আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে অহং কেমন ক'রে আসবে?

উত্তর : যেমন দেহ প্রাণ ও মনের অহং আছে তেমনি একটা আধ্যাত্মিক অহংও আছে। এমন অনেকে আছে যারা প্রাণপণ চেষ্টাতে তাদের অহংকার ও তার সংকীর্ণতাকে জয় করেছে এবং আধ্যাত্মিক চেতনাতে পৌঁছেচে; কিন্তু তাই নিয়ে তাদের একটা গর্ব ও মূল্যবোধ এসে পড়েছে, যারা ওরূপ পারেনি তাদের হেয়জ্ঞান করে দেখেছে। এটা খুবই খারাপ জিনিস। এতে আবার সেই অহংকারই এসে পড়ে। এমন অনেক আছে। দেহ-গত প্রাণগত চেতনাতে তারা জয়ী হয়েছে, কিন্তু সেই জয়-চিন্তাই তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে স্ফীত হয়ে তারা প্রভুত্ব ফলায়। এ এমন সাধারণ যে কেউ তা লক্ষ্য করেনা।

প্রশ্ন : এ কথার অর্থ বুঝলাম না "তথাকথিত প্রকৃতির শক্তিক্রিয়া মানুষের চেয়ে অনেক বৃহৎ এবং মানুষের ক্ষমতার চেয়ে তা অনেক বেশি।"

উত্তর : বুঝতে পারোনি? মনে করো, ঝড় বইছে কেন তার জবাবে বৈজ্ঞানিক বলবে —ওটা প্রকৃতির শক্তিক্রিয়া, অমুক অমুক কারণে তা হচ্ছে, এই বলে ঠাণ্ডা গরম, উপর নীচের তথ্য দিয়ে বোঝাবে "ওরই ফলে আবহাওয়াতে বায়ুস্তরের জোর বেড়ে যায়।" কিন্তু বাস্তবিক তা ঠিক নয়। ওর পিছনে রয়েছে বৃহৎ বৃহৎ সত্তা, তারা এমনই বৃহৎ যে আমাদের দৃষ্টির কাছে অগোচর। মনে করো একটা পিঁপড়েকে বলো যদি মানুষের আকৃতি বর্ণনা করতে, সে কি তা পারবে? সে হয়তো কড়ে আঙুলের প্রান্তটুকুই দেখবে, আর পায়ের উপর হেঁটে যাওয়াই তার পক্ষে অনেকখানি, গোটা মানুষটা তার ধারণাতেই আসবে না। এও তেমনি। যে সকল সত্তারা আনে ঝড়জল ভূমিকম্প প্রভৃতির কাজ, তারা এতই বড়ো যে হয়তো তাদের পায়ের প্রান্তটুকু ছাড়া আমরা তাদের আয়তন সম্বন্ধে কিছুই জানিনা।

প্রশ্ন : মা, তবুও তো সাধারণ অহমিকার চেয়ে আধ্যাত্মিক অহমিকা ভালো জিনিষ ?

উত্তর : সাধারণ অহমিকার চেয়ে তা আরো মারাত্মক ! কারণ তা যে অহমিকা সে কথা জানাই যায়না। যাহা অহমিকা নিজেও চিনতে পারো আর অন্যেও চিনিয়ে দিতে পারে, ঘটনার মধ্যে প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি মহৎ হলে যখন সকলে তোমার ভক্তি করতে থাকে তখন তুমি বুঝতেই পারোনা যে কতটা অহমিকা তোমার হচ্ছে। তা খুবই মারাত্মক জিনিস, স্থূল ধরনের গর্বের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, অহং থাকলেও তো ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় ?

উত্তর : তাঁর সঙ্গে যখন মিলন ঘটে তখন তা নয়, অহং তখন ঘুচে যায়। কিন্তু সে অবস্থা স্থায়ী হয় না। তারা আবার তখন আগেকার অবস্থায় ফিরে যায়, আর সেটাই হয় মারাত্মক। উপলব্ধি পেয়েছে ভেবে নিজেকে তারা বাহবা দেয়, মনে করে তারা অসাধারণ ব্যক্তি হয়ে গেছে, সকলের চেয়ে বড়ো, সেটাই পরিতাপের কথা।

প্রশ্ন : মা, আপনি এখানে বলেছেন—"তুমি আমাকে যাই কেন দাও, জীবন কিংবা মৃত্যু, সুখ কিংবা দুঃখ, আনন্দ বা বেদনা, যা দেবে তাই আমি সাদরে গ্রহণ করব।"

কিন্তু ভগবান কি আমাদের দুঃখ কিংবা বেদনা দিয়ে থাকেন ?

উত্তর : ওটি অন্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ওটি কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রার্থনা। যেখানে শক্তি ব্যক্তিতে রূপায়িত হয়েছে সেখানে ভগবানের কাছে মানুষের আবেদন এইভাবেই করা হয়। ওর প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গেলে তা একরোখা মাষ্টারি কথার মতো হবে। আসল মর্মটা এই যে সবই তো ভগবানের মধ্যে আর সকলই ভগবান। সুতরাং তোমার চেতনা বদলে যদি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারো তাহলে তখন সবই পাল্টে যাবে। যেমন, ব্যথাবেদনা বা দুঃখদুর্দশা এলে তখন মনে করবে যে ওগুলির ভিতর দিয়ে ভগবান তোমার আরো কাছে এলেন, তাতে তোমার আনন্দই আরো বাড়বে। তবে তেমনি চেতনা নিয়ে তা বুঝতে হবে, নতুবা সাধারণভাবে বুঝতে গেলে সমস্তই যে ভগবান, এ কথার বিপরীত অর্থ করা হবে।

একই জিনিস, একই স্পর্শনতন্ত্রের, তুমি তাকে যেমন মনোভাবে নেবে সেই ভাবে তা পরমানন্দেরও হতে পারে আবার অতিদুঃখেরও হতে পারে। যেমন তোমার চেতনার অবস্থা তারই উপর সেটা নির্ভর করে। বাস্তবিক দুঃখকষ্ট বলে কিছু নেই, আসলে কেবল চেতনার হেরফের। আমি কোথায় যেন একবার লিখেছি যে তোমার চেতনা পালটে গেলে তখন যদি দেখ যে অন্যেরা তেমনি ভাবেই ঝগড়া লড়াই করছে, তেমনি কষ্ট দুঃখ পাচ্ছে তাহলে আশ্চর্য হয়ে বলো যে সবই তো সামঞ্জস্যপূর্ণ, সবই যখন সুন্দর সুষমাময়, সবই দেখা যায় আনন্দের, "তবে কেন ওরা আমার মত ক'রে দেখছেনা ?" তার কারণ সকলে তোমার মত প্রস্তুত হয়নি। যারা সাধারণ চেতনার মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে ঐসব জিনিসই বাস্তব।

আবার অনেকে আছে যারা কেবল নিজে নিজেই সে আনন্দ পেতে চায়না, তাই নিজেদের পরমানন্দে থাকা ছেড়ে অন্যদেরও এপথে আনার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

জগতে ভালোর ও পুণ্যের দিকটা অত্যন্ত অনুভবকেন্দ্রিক। একজনের পক্ষে যেটা ফলে, অন্যের পক্ষে সেটা ফলেনা। প্রত্যেকে চলবে তার নিজ নিজ পথে। সুতরাং কাউকে বলা চলেনা, "আমি যা করছি তাই করো"। অথচ সকল গুরুরাই বলে, "আমার দেখাদেখি চলো তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছবে"। তার বদলে বরং বলা যায় "আমার মতো যদি চলো তবে আমারই মতো হবে।"

(নীরব থেকে)

ও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। গোড়ার দিকে বলা হয়েছে আমরা যে জিনিস ভাবি তাই আমাদের ঘিরে থাকে। এ কথার মানে বোঝো তো? (এক-জনের দিকে ফিরে) যখনই তুমি কিছু ভাবতে থাকো তখনই যেন তোমার হাতে একটা চুম্বক আসে, সেই চুম্বক তাকে টেনে আনে যা তুমি ভাবছিলে—বুঝেছ? যেমন, অনেক লোক এমন আছে যারা কেবল যত বিপদ আপদের কথাই ভাবে, নিত্যই তারা ভয় করতে থাকে যে এখনই একটা দুর্গতি ঘটবে। অনেকে এমন আছে, এখানেও আছে। তারা তাদের চুম্বক দিয়ে দুর্গতিকে টেনে আনে, কেবলই নিজেদের জন্য নয়, অন্যদেরও। এতে তাদের মস্ত একটা দায়দায়িত্ব এসে পড়ে। যদি কিছু ভাবতেই হয়, না ভেবে থাকা যায়না, কারণ মাথার মধ্যে চিন্তা সর্বদাই ঘুরছে—তাহলে মন্দের দিকে না ঘুরিয়ে ভালোর দিকে ঘোরানো হোক না কেন? কত রকমের যে ভালো জিনিস হতে পারে সেই কথাই তারা ভাবুক না কেন। যেমন, যদি কারো অসুখ হয়ে থাকে, তাহলে এমন না ভেবে: "না জানি কি কঠিন ব্যারাম হয়ে দাঁড়ায়, যদি অমুক রোগটা হয় তাহলে তো শীঘ্রই নারায়ক হয়ে উঠবে"—এমন সব কথা না ভেবে যদি ভাবো: "ও বিশেষ কিছু নয়, ভিতরের কোনো অদৃশ্য শাসনের বাহ্য বিকৃত রূপ, কেউ বুঝতে না পারলেও জিনিসটা তাই। ঐরূপ শাসনের ভিতরকার বিশৃঙ্খলা ঘুচিয়ে দেবে। আর এই যে রোগের বাধা, ভগবৎ-কৃপার শক্তি তাকে সরিয়ে দেবে, সামান্য একটু অসুখ অসুবিধা ছাড়া ওর কোনো চিহ্নই থাকবেনা।" এই ধরণে নিত্য ভাবতে থাকা চলে। যদি মনকে ছোটাতে চাও তাহলে এইভাবে ছোটাও, তার বিশেষ ফল পাবে। যদি এই ধরণে ভাবতে থাকো: আমি আরো ভালোরকম ক'রে শিখবো, আরো ভালো ক'রে জানবো, আরো বেশি সুস্থ হবো, আমার কোনো বিপদ হবেনা, মন্দ লোকেও ভালো ব্যবহার করবে, অসুস্থ যারা তারা সেরে উঠবে, নতুন বাড়ি তৈরি হবার থাকলে তাও হয়ে যাবে, খারাপ অবস্থা দূর হয়ে ভাল অবস্থা আসবে, জগৎ উন্নতির দিকে এগোতে থাকবে, সকল দিকে সদ্গতি আসবে, ইত্যাদি—এই সব কথা নিয়ে সর্বক্ষণ ভাবো। তাহলে দেখবে যে তোমাকে ঘিরে যত কিছু ভালো ভালো জিনিসই ঘটছে। যারা আবহাওয়ার মধ্যে কেবল কালো চিহ্নই দেখতে থাকে, তাদের মনের মধ্যে সেই কালো অক্টোপাসের দাঁতের মত কামড়ে ধরে—তার বদলে ঐরকম ভালো

দিক দিয়ে ভাবলে তখন দেখবে সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল কত সুন্দর সুন্দর ছবি। যারা চিত্রকর তারা ঐরূপ ভাবনা থেকেই সুন্দর ছবি আঁকে।

প্রশ্ন : না, আপনি বলেছেন—"প্রত্যেক বারের ধ্যানেতে নতুন কিছু দেখবে, কারণ প্রত্যেক ধ্যানেই নতুন জিনিস ঘটে।" ধ্যানের পরে কি জানতে পারা যায়, ধ্যানের মধ্যে কি ঘটেছিল?

উত্তর : আমি ঠিক সেই কথাই বলি : মনোযোগ রেখে চেতন থেকো। যদি একাগ্র হয়ে মনোযোগ লাগিয়ে থাকো, তাহলে ও সম্বন্ধে চেতন হতে পারবে।

প্রশ্ন : না, দুঃখকষ্ট আসে অজ্ঞানতা ও বেদনা হতে, কিন্তু যিনি জগন্মাতা তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য কেন বেদনা ভোগ করেন? আমি "সাবিত্রী" মাতার কথা বলছি।

উত্তর : তাঁকে পৃথিবীতে নেমে সন্তানদের প্রকৃতির মধ্যে ঢুকতে হয়, তাই তখন তাদের কষ্টগুলোও তাঁকে নিতে হয়, নতুবা তাদের অগ্রসর করানো যায়না। তিনি যদি দুঃখশূন্য পরমা চেতনাতে তাঁর চরম প্রজ্ঞার মধ্যেই থাকেন, তাহলে এখানকার মানুষে সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটতে পারেনা। তবে তিনি নিজেকে কখনো ভুলে যাননা ; তাদের চেতনার মধ্যে অংশ নিয়েও তিনি তাঁর আপন চেতনাকে বজায় রাখেন। তাই দুই চেতনাকে মিলিয়ে তিনি তাদের অগ্রসর করাতে পারেন। তাদের চেতনার মধ্যে ঢুকে যদি তিনি তাদের দুঃখকষ্টগুলো ভোগ না করতেন তাহলে তিনি কোনোরূপ সাহায্য তাদের দিতে পারতেন না। সে কষ্টভোগ অজ্ঞানতার মধ্যে নয়, তা হয় তাদের সঙ্গে একাত্মতার দ্বারা। তাদের ভিতরকার স্পন্দনগুলি তিনি গ্রহণ করেন বলে আপন সংস্পর্শ দিয়ে তিনি তাদের সে অবস্থা হতে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন। তা যদি না করতেন তাহলে কেউ তাঁকে অনুভব করতেই পারতনা, তাঁর জ্যোতিকে সহ্য করতে পারতনা।...সকল ধর্মেই সর্বত্র বলা হয়েছে ভগবানের ত্যাগশক্তির কথা, তাঁর ইচ্ছাকৃত আত্মত্যাগের কাজ সম্বন্ধে, আর সে কথা মোটের উপর সত্য। তাঁর নিজের পূর্ণ চেতনা, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ শক্তিকে ছেড়ে বাহ্য জগতের অজ্ঞানতার মধ্যে তাঁর নেমে আসার দরকার হয়, জগতের বর্তমান অবস্থা উত্তীর্ণ করে দেবার জন্য। নতুবা ভগবৎ প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের কাজ হতে পারেনা। এই কারণেই অবতারের প্রয়োজন হয়। ভগবৎ চেতনা ও ভগবৎ শক্তি যদি সরাসরি উপর থেকে কাজ করে জড়ের রূপান্তর ঘটাতে পারতো, তাহলে তাঁর মানবদেহ গ্রহণের প্রয়োজন হতোনা। তাহলে সত্যের স্তরের পূর্ণ চেতনার প্রভাবেই কাজ হতে পারতো ; কিন্তু কাজ জগতের উন্নতির পক্ষে এতই বিলম্বিত ও মন্থর হতো যে, সেই কারণেই তাঁকে এখানে নেমে মনুষ্য প্রকৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়। মানবদেহ নিয়ে তিনি অংশতভাবে মানবপ্রকৃতি গ্রহণ করেন। তবে মূল চেতনা ও সত্যের সংস্পর্শ ঠিক থাকে, দুই জিনিসকে মিলিয়ে রূপান্তরের বিচিত্র ক্রিয়া ঘটে। জড়ের সঙ্গে স্পর্শে না এনে তার কিছুই হতে পারত না।

প্রশ্ন : সাবিত্রী কি আগের থেকে জানতেন, তাঁকে কেমন কাজ করতে হবে?

উত্তর : হাঁ, তাই তিনি বলেছিলেন। তোমরা কি পড়োনি? এমন কি তাঁকে বলা হয়েছিল তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। তিনি বললেন, তা হোক। পড়োনি? ওটা এখানে আবৃত্তি করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : তিনি কি জানতেন যে "দুঃখজননী" "শক্তিজননীর" সাক্ষাৎ পাবেন?

উত্তর : নিশ্চয় জানতেন। স্পষ্টই লেখা হয়েছে যে সবকিছুই তিনি জানতেন যা কিছু হবে। তিনি স্পষ্ট সকলকে বলেছেন, তোমাদের যা প্রয়োজন তা আমি দেবো। না জানলে অমন কথা বলতে পারতেন না। না জানা থাকলে কেমন ক'রে বলবেন?

প্রশ্ন : "সাবিত্রী" কাব্যে আছে, দুঃখজননী বলছেন—জগতের যখন শেষ নিদ্রা আসবে তখন আমিও হয়তো চিরন্তন নিদ্রাতে ঘুমিয়ে পড়বো।

উত্তর : আ! ও হলো মানবচেতনা। মানবচেতনাই বলে যে সকল দুঃখ যখন ঘুচবে তখন "আমি ঘুমোবো"। শ্রীঅরবিন্দ তার কথাই ওখানে বলেছেন। তারা ভাবে যে কেবল প্রলয় যখন আসবে তখন চরম শান্তি মিলবে। কিন্তু এতো বিপরীত রকম কথা হলো, কারণ জগৎ যখন থাকবেনা তখন কোনো কিছুই থাকবে না, শান্তিও না। কিন্তু মানবচেতনারই এটা বিপরীত কথা—"যতদিন জগৎ আছে ততদিন দুঃখও আছে, ততদিন আমাকে ভুগতে হবে। জগৎ যখন অনস্তিত্বের শান্তির মধ্যে যাবে তখন আমিও শান্তিলাভ করব।" এটা হলো কাব্য ক'রে বলা যে দুঃখ যতদিন জগতে আছে ততদিন তা আমার জন্যও আছে। জগতের বেলা যখন থামবে তখন আমারও থামবে।

প্রশ্ন : তাহলে তখন "দুঃখজননীর" কি হবে? সে তখন কি করবে?

উত্তর : সে তখন হবে "আনন্দজননী।"

প্রশ্ন : সাবিত্রী হলেন স্বয়ং মায়ের চেতনা, তাই নয় কি?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : আর সত্যবান কি হলেন?

উত্তর : তিনি হলেন অবতার স্বরূপ, নয় কি? ভগবানের প্রতিভূ।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মা, আপনি বলেছেন—"চৈত্যসত্তাকে অনুভব করার ও তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারার অনেক উপায় আছে। তার মধ্যে কোনোটা মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটা ধর্মীয়, এমন কি কোনোটা যান্ত্রিক"।

এর কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবেন ?

উত্তর : যান্ত্রিক উপায় হল হঠযোগের আসন প্রভৃতি, সেই উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। ধর্মীয় উপায় যারা ধর্মবিশ্বাসী তাদের আন্তরিক পূজা প্রার্থনাদি। যে ধর্মই হোক, প্রকৃত বিশ্বাস নিয়ে যদি তার শিক্ষা ও নির্দেশাদি মেনে চলা হয় তবে তাতেও মিলবে। মনস্তাত্ত্বিক উপায় হলো যোগ, আপন অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে শাশ্বতকে খুঁজে পাওয়া। এই হলো মোট কথা।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, "তোমার লক্ষ্য হোক উচ্চ ও বিস্তীর্ণ," এর মানে কি হবে ?

উত্তর : মানে জানতে চাও ? উচ্চ মানে কি ?...যেমন, অনেকের লক্ষ্য টাকা-পয়সা হোক, কারো বা লক্ষ্য রোগ আরোগ্য হোক। এই রোগ সারানোর লক্ষ্যের চেয়ে প্রথম লক্ষ্যটি অনেক নীচু। অনেকের লক্ষ্য জীবনে সুখস্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে উপভোগ করা, সব চেয়ে ভালো অবস্থায় জগতে থাকা। এও মামুলি রকমের নীচু দরের লক্ষ্য। আবার অনেকের লক্ষ্য সমাজের সমূহ উন্নতি, কিংবা জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, যেমন রেডিয়ম আবিষ্কারক মিষ্টার ও মাদাম কুরি। এগুলি হলো উচ্চ লক্ষ্য। "নিঃস্বার্থ" মানে নিজের সুখ বা নিজের লাভের দিকে না চেয়ে অন্যকে সাহায্য করতে চাওয়া। আর সর্বোচ্চ বা লক্ষ্য তা হলো ভগবানের সঙ্গে মেলা, ভগবানের কাজকে সম্পূর্ণ করা—এ লক্ষ্য সব চেয়ে বড়ো। প্রথম অধ্যায়ে আমি এ নিয়ে কিছু বলিনি কারণ ওটা সর্বসাধারণের জন্যে লেখা, যাদের উপরের সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে সব চেয়ে উচ্চ ও সব চেয়ে নিঃস্বার্থ লক্ষ্য হবে ভগবানকে আবিষ্কার, ভগবানের সঙ্গে মেলা, ভগবানেরই কাজ করা। কী বিশেষণ আমি ওখানে প্রয়োগ করেছি ?

প্রশ্ন : উচ্চ ও বিস্তীর্ণ, উদার ও নিঃস্বার্থ।

উত্তর : হাঁ। বিস্তীর্ণ মানে যা ব্যক্তিগত চেতনার স্বার্থসঙ্কীর্ণ সুবিধাবাদী গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা হবে বৃহৎ ও ব্যাপক—সে লক্ষ্য সমাজও হতে পারে, জাতিও হতে পারে, দেশও হতে পারে, পৃথিবীও হতে পরে। কেউ সমগ্র পৃথিবীর জন্য কোনো কাজ করছে এ নিশ্চয় বৃহৎ লক্ষ্য।

প্রশ্ন : ওর পরে বলেছেন, "এতে তোমার জীবন নিজের কাছে ও সকলের কাছে মূল্যবান হবে"।

উত্তর : হাঁ। অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো হলে তোমার কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজনীয় হলেই তোমার মূল্য। কেবল নিজের সংকীর্ণ অস্তিত্বটুকু নিয়ে লেগে থাকা খুবই বিরক্তিকর। নিজেকে অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হয়। সে জীবনে কোনো আগ্রহ থাকে না। অনেকে আপন ক্ষুদ্র একটি সংসার নিয়েই আবদ্ধ থাকে, ছেলেটা কাশছে দেখলেই

মহা বিব্রত হয়ে ওঠে, রান্না খারাপ হলেই রেগে ঝগড়া করে, চাকরি চলে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বলে "পরিবারকে খাওয়াবো কেমন ক'রে ?" এমন বেঁচে থাকা হলো গর্তের মধ্যে কেঁচোর বেঁচে থাকার মতো।

প্রশ্ন : চৈত্যসত্তা কি প্রত্যেকের মধ্যেই বিশুদ্ধ অথবা বিশুদ্ধ ক'রে নিতে হয় ?

উত্তর : চৈত্য সর্বদাই বিশুদ্ধ। কিন্তু তা অল্পবিস্তর ব্যক্তিগত ও স্বাধীনক্রিয় হয়। চৈত্য মানেই তা সর্বদা বিশুদ্ধ, কারণ তা ভগবৎ সংস্পর্শযুক্ত ও সত্তার সত্যকে তা প্রকাশ করে। কিন্তু সত্তার অন্ধকারের মধ্যে তা একটা স্ফুলিঙ্গমাত্র হতে পারে, অথবা পূর্ণ স্ফুরিত সচেতন ও জ্যোতির্ময় হতে পারে। দুই অবস্থার মধ্যে বিস্তর তারতম্য আছে।

প্রশ্ন : প্রায়ই কি তা পর্দাঢাকা থাকে ?

উত্তর : বাহ্য চেতনা তার সংস্পর্শ পায় না, কারণ সে চেতনা অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হয়েই থাকে, যা কিছু দেখে শোনে বলে এবং করে সবই বাহ্য কোলাহলের মধ্যে, ভিতরের দিকে দৃষ্টি নেই, তাই গভীর দিকের সাড়া সে টের পায়না।

প্রশ্ন : চৈত্যের কোনো ক্ষমতা আছে কি ?

উত্তর : ক্ষমতা ? চৈত্যই সত্তার নিয়ন্ত্রণকারী। চেতন না হলে জানা যায় না কিন্তু সেইই পরিচালক। খুব মনোযোগ করলে জানা যায় কিন্তু অধিকাংশের তা নিয়ে কোনো ধারণাই নেই। যেমন, কেউ হয়তো বাহ্যচেতনাতে কিছু মনস্থ ক'রে কাজের বেলাতে ঘটনাচক্রে অন্যরকম ক'রে ফেললে, তখন চেঁচামেচি ক'রে ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বলে যে প্রকৃতি বাদ সাধলে, অথবা (বিশ্বাস অনুযায়ী) ভগবানের এটা অবিচার, ইত্যাদি। অথচ হয়তো তেমনি রকম ঘটাই দরকার ছিল। ভিতরের উন্নতির পক্ষে। আর যদি তুমি চৈত্যের সাহায্য চাও সুখে থাকা, উপার্জন করা, বংশেতে ভালো সন্তানের জন্য, তেমন সাহায্য সে করবে না। কিন্তু চৈত্য তোমার মধ্যে এমন অবস্থা এনে দিতে পারবে যাতে ভগবানের সঙ্গে মিলনের জরুরী প্রয়োজনের দিকে তোমার চেতনার মধ্যে আগ্রহ জেগে ওঠে। যখন তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা সফল হচ্ছে তখন তারই উৎসাহে ও উচ্চাকাঙ্খায় তুমি তোমার বাহ্য অজ্ঞানতার তৎপরতা নিয়েই অল্পবিস্তর নিমগ্ন হয়ে থাকো। কিন্তু যখন তুমি একটা প্রবল ধাক্কা খাও, তোমার মনের পরিকল্পনা সব ভেস্তে যায়, যা পেতে চেয়েছিলে তা মেলে না, নিজেকে একেবারে ব্যর্থ বোধ করতে থাকো, তখনই এ সবের চেয়ে সত্য ও গভীর কিছুর দিকে তোমার ভিতরকার দরজা খুলে যায়। তখন যদি কিছু জেগে উঠে পিছন দিকে ফিরে চাও আর যদি ঐকান্তিক হও, তখন নিজেই বলো, "হাঁ আমি ভুল করেছিলাম, হয়তো প্রকৃতি বা ভগবৎকৃপা বা আমার চৈত্য ঠিক জিনিস দেখিয়ে দিলে। এই হলো চৈত্যের কাজ।

প্রশ্ন : চৈত্যই চায় ভগবানের সঙ্গে সত্তার একাত্মতা হোক।

উত্তর : নিশ্চয়। চৈত্য সেই ইচ্ছাই করে। ওর অস্তিত্বের কারণই হলো তাই, ঐ তার কাজ। হয়তো মনের মধ্যে (কখনো বা প্রাণ ও দেহের মধ্যে) অজ্ঞাতে চৈত্যের প্রভাবে ঐরূপ ক্রিয়া জাগে। তার ফলে ঐ সকল অংশ ভগবানের দিকে আশ্পৃহা নিয়ে দিব্য জ্ঞান, দিব্য মিলন ও ভগবৎ সংস্পর্শ চাইতে থাকে।

প্রশ্ন : চৈত্য কেমন ক'রে সত্তার অভিব্যক্তি ঘটায়?

উত্তর : তাই কি আমি বলেছি?

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, "চৈত্য বলি আমাদের সত্তার মূল মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্রকে যেখানে আমাদের অস্তিত্বের সর্বোচ্চ সত্য, তাকেই সে অভিব্যক্ত করতে পারে।"

উত্তর : ও! ওটা অস্তিত্বের সত্য, মূল সত্য নয়। সত্তার অস্তিত্বের ভিতরকার কেন্দ্রসত্য। চৈত্য এমন ঘটনার মধ্যে এনে ফেলে যাতে সত্তার সত্য বেরিয়ে আসে কিংবা বাহ্য সত্তা ভিতরমুখী হয়ে যায়—বাইরে কোনো অবলম্বন না পেয়ে সে তখন ভিতরের দিকে অবলম্বন খোঁজে; আর চৈত্যই তাকে সে অবলম্বন দেয়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, "দেহের একটা চমৎকার গুণ আছে সব কিছুকে সহ্য করার ও মানিয়ে নেবার। এমন সব কাজ সে করতে পারে যা কল্পনার বাইরে। দেহের স্থূল ও স্বেচ্ছাচারী যে প্রভু তার দ্বারা চালিত না হয়ে যদি সে সত্তার কেন্দ্রসত্যের দ্বারা চালিত হয় তাহলে কত কিছুই সে করতে পারে। ধীর স্থির হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সে তখন প্রতি মিনিটে তার উদ্দিষ্ট কাজ করে, সে জানে যে কাজের মধ্যে সে কেমন করে বিশ্রাম পায়, বিশ্বশক্তির সংস্পর্শে এসে চেতনভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে।"

কাজের মধ্যে বিশ্রাম কেমন করে হতে পারে?

উত্তর : তা হবে আভ্যন্তরীণ নির্বাচন-ক্রিয়ার নিশ্চয়তার দ্বারা। যখন কিছুর জন্য আন্তরিক আশ্পৃহা করো, তখন যদি নিশ্চয় করে জানো যে সেই আশ্পৃহা সাড়া পাবে এবং তার সর্বোত্তম জবাব মিলবে, তাহলে তখন ভিতরকার স্পন্দন-চাঞ্চল্য আপনা হতে শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি সন্দেহ থাকে, অনিশ্চয়তা থাকে, ঠিক কাজ হচ্ছে কিনা বা লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে কিনা তাই নিয়ে ইতস্তত থাকে, তাহলে সত্তা তখন চঞ্চল হয়ে তার মধ্যে একটা ছোটোরকম ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়, তাতে শান্তি মেলেনা। কিন্তু তার বদলে অটল শ্রদ্ধা নিয়ে আশ্পৃহার সঙ্গে যদি জানো যে কোনো আশ্পৃহাই (অবশ্য তা হবে ঐকান্তিক) কখনো বিফল হয়না, তাহলে তুমি শান্তই থাকবে। যথাসাধ্য আগ্রহের সঙ্গে আশ্পৃহা করবে, কেন তা তখনই সফল হচ্ছেনা তাই নিয়ে কোনো স্নায়বিক চাঞ্চল্য আনবেনা।

কেমন ক'রে অপেক্ষা করতে হয় তা তুমি জানবে। আমি কোথায় যেন বলেছি "অপেক্ষা করতে জানা মানে সময়কে আপন দখলে পাওয়া।" এটি খুব সত্য কথা। উত্তেজিত হলেই সময় দখলের বাইরে চলে যায়, তখন শক্তিও চলে যায়, উত্তেজিত প্রয়াস প্রচেষ্টা বিচলিত হয়। ধীর স্থির শান্ত হয়ে জানা যে সত্য যা তা হবেই, যখনই হোক, তাহলে তা নাতি-বিলম্বে হবে। সেই শান্ত অর্থাৎ বিশ্রামপূর্ণ অবস্থাতেই তুমি সব কিছু কাজ ভালো ভাবে করতে পারবে।

—শ্রীমা

পথের কথা

৩০ আগস্ট, ১৯৭২

আমি স্পষ্ট দেখি : চেতনাই সব কিছু চালিত করে, চিন্তা নয়। সেই চেতনা যদি স্থিরভাবে ভগবানের দিকে উন্মুক্ত থাকে তাহলে সব কাজই ঠিক ঠিক হয়। সর্বদাই চেতনার মধ্যে সমগ্র জগৎ হতে কত কিছু এসে পড়ছে (হাতের ভঙ্গী করলেন) যা ভগবৎ ক্রিয়ার বিরোধী। সুতরাং আমি যদি তখন অনড় হয়ে চুপচাপ থাকতে জানি (হাত খুলে নিবেদনের ভঙ্গী), অর্থাৎ অনস্তিত্বের ভাব নিয়ে...তাকে স্বচ্ছতা বা অনড়তাও বলা যায় কিনা জানিনা—যাই হোক, চেতনার ঐরূপ একটা অচঞ্চল অবস্থা (পূর্ববৎ ভঙ্গী) : চেতনার ঐ ভাব থাকলে তখন সবই খুব ভালো, কিন্তু যেমনি একটু নড়চড় হবে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্ত করতে যাবে, তখনই সব বিগড়ে যাবে। তবে ঐ ভাবটি খুবই জোরালো।

দেখ, স্থূল দেহের হাজার রকম অনুভূতি, সে বলে, "ওঃ! অমন পরমানন্দের অবস্থা হতে পারা অসম্ভব।" ওর এই বোকামিই সব কিছু বিলম্ব ঘটায়। যেন দেহের কোষগুলি নিত্য কষ্ট সইতে ও সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত থেকে তেমন অবস্থাকে ধারণ করতে অপারগ হয়। কিন্তু যদি তা পারে...তাহলে অত্যাশ্চর্য।

কেবল কথা এই, ওই অবস্থা স্থায়ী হয়না—সব সময় থাকেনা—কারণ সর্বদাই নানারকম বিপ্রক্রিয়া ঘটছে (ভঙ্গী করলেন)। কিন্তু এটা এখন স্পষ্টই দেখছি যে চেতনা চিন্তার স্থান গ্রহণ করছে।

আর ওর মধ্যে যা প্রভেদ (কি বলব?) : চিন্তা হলো এমন জিনিস যা কেবল ঘুরতে থাকে (অনুরূপ ভঙ্গী) ; আর চেতন হলো এমন জিনিস যা নাকি (নিবেদনের ভঙ্গী) এই, ব্যাখ্যা করে বলতে পারিনা।

(মা চোখ বুজে হাত খোলাই রাখলেন)

তোমার কি কিছু বলবার অথবা জানবার আছে?

ভক্ত : হাঁ, আমি জানতে চাইছিলাম, ঐ ক্রিয়াকে কেমন ক'রে ত্বরান্বিত করা যায়। বাস্তবের জীবনে চারদিক থেকে কত ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, নয় কি? তার মধ্যে কেমন ক'রে ও-জিনিস ত্বরান্বিত হতে পারে?

উত্তর : যদি কোনোক্রমে বিচলিত না হও তাহলে অনেক তফাৎ হয়ে যাবে।

ভক্ত : হাঁ।

মা : অনেকটাই তফাৎ বুঝেছ কি? আমার দেহ এখন জানতে শুরু করেছে যে ভগবত্তার দিকটাই হলো জীবন (হাত প্রসারিত করে), যে জীবন নিত্য প্রগতিশীল ও জ্যোতির্ময়, কিন্তু অতীতের দিকের অভিজ্ঞতা বলছে, "না, তা সম্ভব নয়"। এই তো মুশকিল, ঐ "সম্ভব নয়" কথাটাই বিলম্ব ঘটিয়ে সব মাটি করছে।

তার কারণ, দেহ যেমনই ঐ সত্য মনোভাবটি ছেড়ে দেয়, অমনি শুরু হয় যত ব্যথা, বেদনা, কষ্ট...অমনি আসে মৃত্যু ও বিলয়ের ধারণা। ওতেই জড়ের দিকের নির্বোধতা আরো জোর পায়। সুতরাং আমার কোন কিছু না বলাই ভালো, কেবল নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া ছাড়া।

ভক্ত : আমার তরফ থেকে আমি জানতে চাই যে ঠিক কোন জিনিসেই নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রাখব?

মা : (নীরব থেকে) তুমি কি মনে করো যে চিন্তা থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছ?

ভক্ত : হাঁ, তা হয়েছি, পুরোপুরি। থাকে কেবল একটা যান্ত্রিক রকমের চিন্তা-স্পন্দনের ক্রিয়া, কিন্তু আমি কোনো চিন্তাকে আদৌ কাজ করতে দিইনা। কেবল বোধ করি যে উপর থেকে কিছু পাচ্ছি। চিন্তার কাজ নিয়ে ভাবতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মা : হাঁ, তাহলে ঠিকই হচ্ছে, তুমি ঠিক পথেই যাচ্ছ।

ভক্ত : হাঁ, কিন্তু কাজের দিক থেকে একটা সংগ্রাম টের পেতে থাকি, যেন তারই মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছি।

মা : আমার দিক থেকে দেখি, কাজের জন্য যা কিছুর উপর নির্ভর করতাম সবগুই যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে; সুতরাং এখন (এমন কি সামান্য বিষয়েও) তাই বলি : তোমার যা ইচ্ছা...এখন কেবল আমার ওটাই সম্বল। যে কিছু জানেনা, সে সাধারণভাবে বাইরের থেকে দেখে বলবে—নির্বোধ।

ভক্ত : কিন্তু আলো পেয়েছে এমন লোকও নিতান্ত কম নেই। তাই নয় কি?

উত্তর : হতে পারে। (হেসে) তাদের পক্ষে তো ভালো কথাই।

(নীরব থেকে)

প্রায়ই, প্রায়ই আমি পরম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি : কেমন ক'রে আমি তোমার কাজেতে সাহায্য করব, যখন স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে কিংবা বলতে পারি না। এই এক অবস্থা... দেহ কিন্তু তা বোধ করে না। দেহের ধ্রুব বিশ্বাস যে কাল যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় আবার একে জোরদার ভাবে কাজে লাগাতে, তখনে দেহ ঠিকই তা করতে পারবে। শক্তি তার আছেই (আপন বাহু ধরে মাংসপেশীগুলি দেখিয়ে). কখনো মনে হয় প্রচণ্ড বল আছে!... কেন? ইচ্ছার মধ্যে তাই রয়েছে...সুতরাং চুপ ক'রে থাকাই ভালো।

ভক্ত : কিন্তু ও তো ইচ্ছাকৃত অবস্থা, আমি নিজেও ঐ রকম জিনিস বোধ করি আপনার সম্বন্ধে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপে এই কথা বলে যে আপনি অমনি অনড় হয়ে বসে থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রবল কেন্দ্রস্বরূপ।

মা : হাঁ, আমি তা জানি, তা জানি। প্রবল বটে, প্রচণ্ড শক্তি...।* —শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

অন্তর্যামী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

যে আমার অন্তর্যামী,
আমি তোমার লজ্জার কারণ না হয়ে উঠি,
তোমায় কলঙ্কিত করি না যেন—
কোন শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টি দিয়ে
কিংবা বিভ্রান্ত পদক্ষেপে
কিংবা এমন কোন দীর্ঘশ্বাসে যা উচিত হয় নি তোমার জন্যে।
সূর্যকিরণের মত ঋজু, অনাবিকৃত প্রসারের মত অনাবিল হয়ে
আমার সমগ্র সত্তা যেন তোমাতে মিলিত হয়
তোমারই মাঝে সংহত হয়।

তোমার কণ্ঠ শুদ্ধ, মৃদু—
মর্ত্য আধারে ফুটে উঠেছে যা কিছু
তাদের মধ্যে, আহা, কোমলতম সে।
তোমার তুচ্ছতম ইচ্ছা, একান্ত আকস্মিক আকাঙ্খাও
যেন হয়ে ওঠে আমার কাছে বজ্রনির্ঘোষ অনুজ্ঞা
আর দুর্বার প্রবেগ এক
তার ত্বরিত রূপায়ণের।

তুমি হলে সেই স্থপতি
যে গড়ে তোলে রূপ যত অন্তর হতে,
গভীরতম যত ভিত্তি হতে:
যে সৌধ গড়ে তোল তুমি
তা অবিকম্প ঊর্দ্ধে উঠে চলে
কোন কিছুই পারে না তাকে রোধ করতে
কোন কিছুই পারে না তাকে টলাতে,
সে দাঁড়িয়ে থাকে, যুগ-যুগান্তরের বিস্ময়,
পদপ্রান্তে লুটিয়ে থাকে তার মহাকাল
শ্রদ্ধায় আর সম্ভ্রমে।

তুমি আমাদের সেই শিশু
যাকে আমরা বহন করি গর্ভে যেন,
আর বড় করে তুলি আমাদের প্রতি কোষ আর
রন্ধ্র-নিংড়ান জ্যোতি দিয়ে,
তুমি বেড়ে চল দিব্য করুণার প্রতিটি বিন্দুর সাথে,—
যা ঊর্দ্ধ হতে ঝরে পড়ে
আমাদের মর্ত্যতার পরে—
আমাদের সাধারণ মৃত্তিকা, যা আবাস হয়েছে
ভাগবত গৃহপতির
তা ক্ষয় হয়ে চলে, লয় হয়ে যায়
যেমন করে ভেসে যায় ছায়া একটা,
তারপর তা মিশে যায় তোমার আপন সত্তায়।*

---

* To the Heights থেকে অনুবাদ। অমিয়া মজুমদার

কল্পনা

সুধীর চৌধুরী

কল্পনা করি আমি যে রয়েছি বিশ্বমায়ের কোলে,
মা'র বুক থেকে পরম শরণে মাকে ডাকি মা মা বোলে ;
বসিয়া মায়ের অভয়-অঙ্কে,
ধ্বনি মা'র জয় হৃদয়-শঙ্খে,
মায়ের লীলায় অঙ্গনতলে জীবন আমার দোলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল চিরন্তনীর কোলে।

কল্পনা করি চলিয়াছি আমি মায়ের করুণারথে
আশ্রয় মেলে মর্ত্যজীবন-রূপান্তরের পথে ;
ঊর্দ্ধ-চেতনা-সোপান পারায়ে
চলিয়াছি আমি আমারে ছাড়ায়ে ;
আমার প্রতিটি অঙ্গ মায়ের আলোকের পানে খোলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল জগন্মাতার কোলে ॥

কল্পনা করি জগজ্জননী রয়েছে আমার সাথে
রেখেছে তাহার অভয়হস্তস্পর্শ আমার মাথে।
জীবনে আমার যাহা প্রয়োজন,
নীরবে তাহার হয় আগমন,
মায়ের প্রসাদ নির্ভর মম জীবনের পলে পলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল মহা অসীমার কোলে।

কল্পনা করি মুক্তি আমার মায়ের চরণে বাঁধা ;
আমার জীবনবীণার রাগিণী মায়ের সুরেতে সাধা।
মম জীবনের প্রতিটি ছন্দ
মায়ের দোলায় লভে আনন্দ ;
মায়ের অনলে এ হৃদয়তলে চৈত্যপ্রদীপ জ্বলে।
কল্পনা করি আমি শ্রীমায়ের শরণ-স্নিগ্ধ কোলে।

কল্পনা করি দেবদুর্লভ লভেছি জীবনখানি,
মায়ের চরণে আপনারে আমি প্রতিটি নিমেষে দানি,

আপন ভাবের প্রতিটি মুকুল,
সুখ দুঃখ হাসি কান্না ও ভুল,
অঞ্জলি হয়ে লুটায় নীরবে জননীর পদতলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল পরাপ্রকৃতির কোলে।

কল্পনা করি প্রপঞ্চ হ'তে আমি বহুদূরে সরে,
রহি জাগ্রত মায়ের সমুখে মায়ের বিধান ধরে।
মা বিনা আমার ভবনে ভুবনে
কেহ নাহি রহে আমার চেতনে;
মায়ের মূরতি বিরাজে আমার দৃষ্টির শতদলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল সর্ব্বময়ীর কোলে।

কল্পনা করি আমাতে জননী, জননীতে আছি আমি,
মা'র লীলা লাগি' মা'র সাথে আমি এসেছি ধূলায় নামি।
আমি আর মোর জীবনের সবি
মায়ের কেবলি—এই অনুভবি;
আমি আর নাই আমার মাঝারে, কোন মায়া মোরে ছলে?
কল্পনা করি আমি যে রয়েছি মহামায়া মা'র কোলে।

কল্পনা করি এ হৃৎপিণ্ডে মায়ের নিশাস বহে,
মোর ধমনীতে জগন্মাতার শোণিত-প্রবাহ রহে।
চক্রে চক্রে মম এ দেহের
উথলে স্মরণ মায়ের স্নেহের,
মায়ের শক্তি-সত্তায় মম জীবনের গতি চলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল মহাশক্তির কোলে।

কল্পনা করি আমি চলে গেছি তমসার পরপারে;
সূর্য্যবর্ণ পুরুষস্বরূপে জানিয়াছি আপনারে;
অহংএর খেলা করিয়াছি সারা,
এ জীবনে ঝরে অমৃতের ধারা,
অসীমের পারিজাত ফুলমালা পরেছি আপন গলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল মাতা অদিতির কোলে।

কল্পনা করি মৃত্যুবিহীন সত্তা আমার, এসেছি এই ধরণীতে,
আমি আর মাতা চির অভিন্ন সৃষ্টির আদি হতে।
অমরত্বেরে ফোটাতে জীবনে,
নিয়েছি জন্ম ধূলি-অঙ্গনে,
আঁধার আলোকে রূপান্তরিত মাতৃপ্রসাদবলে।
কল্পনা করি আমি অনন্ত আলোকময়ীর কোলে।

মাতৃকল্পতরুমূলে বসি এই কল্পনা করি—
আমি যে মায়ের, আমি যে মায়ের জন্ম জন্ম ধরি।
আর কেহ নহে, আর কিছু নহে,
আমারে ভরিয়া মা-ই শুধু রহে,
এ জীবন হোক রূপান্তরিত মায়ের করুণানলে।
কল্পনা করি আমি চিরকাল ভগবতী মা'র কোলে।

আমার কল্পলোকে এ ধরণী হয়েছে দিব্যধাম—
প্রতিটি মানুষ হয়েছে দেবতা, ব্রহ্ম বিনিকাম,
ঈশা এষণায় ভূলোকের জীব
হয়ে গেছে সবি প্রমুক্ত শিব,
সৃষ্টা সৃষ্টি হয়ে গেছে এক পরম প্রেমের ফলে,
কল্পনা করি আমি প্রেমময়ী জননী শ্রীমার কোলে।

শ্রীঅরবিন্দের চুম্বক-আকর্ষণ

(স্মৃতিচারণ)

শ্রীরঘুনন্দন দাস

কোনো-কোনো মানুষের জীবনে তার অজ্ঞাতে কখন কী করে যে তার শুভ সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হ'য়ে যায় তা' সে বুঝতে পারে না।

গত ১৯৩৪ সালে শ্রীঅরবিন্দের চুম্বক-আকর্ষণে প্রথম যখন আমি শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে পণ্ডিচেরী এসে মা-শ্রীঅরবিন্দের দিব্যস্পর্শ ও আশীর্বাদ পেলাম, তার পূর্বে কি আমি জানতাম যে আমার জীবনের সেই সুমহান সুদিব্য সম্ভাবনার বীজ আমার অজ্ঞাতে আমার অন্তরে উপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল আমার কৈশোর-জীবনেই একটি শুভ মুহূর্তে ?...শ্রীঅরবিন্দের নাম এবং তাঁর অলৌকিক যোগশক্তির কথা আমি প্রথম শুনি আমার এক বাল্যবন্ধুর কাছে। বন্ধুটি তখন মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার, মহারাজার হাই স্কুলে পড়তো সেখানকার স্কুল-বোর্ডিংএ থেকে। তাদের হেড মাষ্টার ছিলেন যোগী বরদাচরণ। আমার বন্ধুটি তাঁরই কাছে শোনে শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক যোগশক্তির কথা। ছুটিতে একবার আমার সেই বন্ধু আমাদের দেশ—আজিমগঞ্জে এসেছে,—একদিন বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে-বেড়াতে সে আমাকে বললো—"জানিস, বরদাবাবু সেদিন আমাদের বললেন, পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনার এমন উঁচুতে উঠেছেন যে তিনি ইচ্ছা করলে এই পৃথিবীটাকে একদিনে বদলে দিতে পারেন!"...সেইদিন আমি প্রথম শুনলাম শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ যোগশক্তির কথা। সেই শুভ মুহূর্তে, আমার অজ্ঞাতে, আমার ভবিষ্য-জীবনে এক সুমহান সম্ভাবনার বীজ হল উপ্ত।...আমার চেতনার অগোচরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ধীরে-ধীরে তা' শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ ক'রে ফল প্রদান করলো অনেক-বছর পরে—আমি যখন কলকাতায় আমাদের বন্ধু ঋষভচাঁদের সঙ্গে তাঁর সিল্ক-ব্যবসায়ে হ'লাম কর্মলিপ্ত। আমার বাল্যবন্ধু পরীচাঁদও তখন ঋষভচাঁদের সাথে তাঁর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে। আমরা তিনজনেই আজিমগঞ্জ শহরের অধিবাসী,—ছেলেবেলায় আমরা একই স্কুলে পড়াশুনা করেছি। ঋষভচাঁদ ছিলেন আমাদের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়। তিনি ঐ স্কুলে উচ্চ শ্রেণীতে পড়তেন, পরীচাঁদ ও আমি একই সাথে পড়তাম নিম্ন শ্রেণীতে। তারপর ঋষভচাঁদ কলকাতায় কিছুদিন পড়াশুনা করে বহরমপুরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হন। এমন সময় দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বাংলার সর্বেসর্বা মহাত্যাগী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একদিন আমাদের বহরমপুর শহরে আসেন বক্তৃতা দিতে। তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে আমরা লেখা-পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে নেমে পড়ি দেশের কাজে,—আজিমগঞ্জ শহরে তাড়ি-মদের দোকানে পিকেটিং আর স্বদেশী-তহবিলের জন্য ট্রেন-যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু ক'রে দিই। ঋষভচাঁদ তখনও

বহরমপুর-কলেজে। কিন্তু গান্ধীজীকে যখন প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় তখন তার প্রতিবাদে তিনি তাঁর বি-এ পরীক্ষার ফি জমা না দিয়ে, কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে আজিমগঞ্জে ফিরে এসে স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দেন। আমরা ট্রেন-যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে ঋষভচাঁদের কাছেই তা জমা দিয়ে আসতাম। ঐভাবেই চলতে থাকে আমাদের দেশের কাজ।...

এইভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আমার অভিভাবকরা পছন্দ না করায় আমি কলকাতা পালিয়ে যাই এবং পার্কে-পার্কে নেতাদের বক্তৃতা শুনে বেড়াই। একদিন মির্জাপুর-পার্কে একটি স্বদেশী সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বক্তৃতা দেবার পূর্বে সুভাষচন্দ্র বসুকে সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুভাষবাবুকে সেই প্রথম দেখলাম ঐ সভামঞ্চে দেশবন্ধুর পাশে। তিনি আই-সি-এস হয়েও, সিভিল-সার্ভিস প্রত্যা-খ্যান ক'রে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।...আর-একদিন হ্যালি-ডে-পার্কে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে প্রথম দেখলাম গান্ধীজীকে। আমরা পার্কে গিয়ে হাজির হয়েছি, গান্ধীজী তখনও সভায় আসেননি, কয়েক-মিনিট পরেই এসে হাজির হ'লেন। কলরবরত শ্রোতৃমণ্ডলী, গান্ধীজী সভামঞ্চে উঠে হাত তুলে শুধু বললেন—"মেরে পেয়ারে ভাইয়োঁ আওর বহিনো, শান্ত্ হো যাও।" সঙ্গে-সঙ্গে সব শুদ্ধ।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর আহ্বানে আমি কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হ'য়ে তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিই।—তারপর তিন-চারটে বছর এ-দেশ সে-দেশ ঘুরি... গয়া, কাশি, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, দিল্লী, আগ্রা, হরিদ্বার ইত্যাদি। তারপর পুরীতে মাস-দুই কাটিয়ে কলকাতায় যখন ফিরি তখন শ্রদ্ধেয় মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের আয়োজন চলছে। সুভাষ বসু তখন সেখানে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর জি, ও, সি। পার্কসার্কাসে কংগ্রেস-অধিবেশনের মণ্ডপ দেখতে গিয়ে সেদিন দেখলাম সুভাষবাবু একটি মস্তবড় বলিষ্ঠ ঘোড়ার পিঠে চেপে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি সেখান থেকে গেলাম আমাদের তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহক্ষেত্রের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ক্যাপটেন পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ক্যাম্পে। বাসনা—আবার স্বেচ্ছাসেবকদলে যোগ দেওয়ার। পঞ্চাদা' পরের দিন দেখা করতে বললেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসে বন্ধু পরীচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সব ভেস্তে গেল। পরীচাঁদ আমাকে বলল—এরকম করে ঘুরে না বেড়িয়ে সিল্ক হাউসে তাদের সঙ্গে কাজ করতে। ...আমি তখন বিবাহিত এবং একটি শিশুপুত্রের পিতা। সংসারে অর্থেরও প্রয়োজন। সুতরাং স্বদেশ-সেবার নেশা ত্যাগ করে সংসার-সেবায় মন দিতে হ'ল। কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে গৌণ। ঋষভচাঁদ-পরীচাঁদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের কাজে যোগ দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য আমার ভাগ্যবিধাতা, আমার অগোচরে, অন্যরূপ স্থির ক'রে রেখেছিলেন। তা-ই এবার ক্রমে বিবৃত করছি।

ঋষভচাঁদদা' একদিন সন্ধ্যার পর একটু আগেই দোকান বন্ধ ক'রে পরীচাঁদকে ও

আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাসায় গেলেন। পরে জানতে পারি সেই দিনটি ছিল পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের একটি নির্দিষ্ট দিন।...সেদিন আমরা ঋষভদার সঙ্গে তাঁদের বাসায় পৌঁছে একটি ঘরে গিয়ে বসলাম। সামনে দেখলাম একটি স্বল্প-উচ্চ আসনে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের ফোটো সাজানো। ঋষভচাঁদ সেই ফটো-দুটির সামনে ফুল রাখলেন এবং ধূপ-শলাকা জেলে দিলেন। আমরা তখন তিনজন একসঙ্গে মেঝের ওপর একটি মাদুরে চুপ করে বসলাম ধ্যানের ভান নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে ঋষভচাঁদ শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা বিষয়ে আমাদের কিছু বললেন। যতদূর মনে পড়ে এটা ১৯২৯।৩০ সালের কথা। সেই দিন আমি প্রথম জানতে পারলাম যে, ঋষভচাঁদ শ্রীঅরবিন্দের সাধন-পন্থার একজন সাধক। পরীচাঁদও তাঁর অনুগামী। সেইদিন সেখানে আমি প্রথম দর্শন করলাম শ্রীমায়ের আলোক-চিত্র। সেইদিন থেকে আমারও অন্তর-পুরুষ আকৃষ্ট হ'ল মা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতি... ঋষভচাঁদ, পরীচাঁদ ও আমি বাল্যকালে একই স্কুলে পড়েছি, একসঙ্গে কিছুদিন দেশের কাজও করেছি। এবার একসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু বিধাতা এর পরের পর্ব আমাদের ভাগ্যে কী স্থির করে রেখেছেন তা আমরা তখনও বুঝতে পারিনি।...কিছুদিন পরে পরীচাঁদের অগ্রজ উদীরচাঁদও আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের কাজে যোগ দিলেন।—কী উদ্দেশ্যে কে তাঁকে টেনে নিয়ে এল ঐ একই কর্মক্ষেত্রে?...আমাদের দিনগুলো ব্যবসায়ক্ষেত্রে একসাথে বেশ আনন্দে কেটে যাচ্ছে।...একদিন আমরা শুনলাম—পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে বিজয় নাগ এসেছেন কলকাতায়। তিনি কলেজ স্ট্রীটে 'আর্য পাবলিশিং হাউসে' এসে উঠেছেন। ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কিন্তু দু-তিন দিন পরে শুনলাম তিনি দেশে চলে গেছেন।

এর কিছুদিন পরে আমি, পরীচাঁদ ও ঋষভচাঁদ একদিন সিল্ক হাউসে কাউন্টার টেবিলের ভিতর দিকে চেয়ারে বসে আছি, তখন সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, দোকানে খদ্দের-পত্র বড়-একটা নেই। এমন সময় এক প্রৌঢ় ব্যক্তি, মাথায় তাঁর স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল আর মুখে দাড়ি-গোঁফ, হঠাৎ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ালেন এবং বলে উঠলেন—"আমি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।" নাম শুনেই আমরা তো হকচকিয়ে উঠলাম, তাড়াতাড়ি কাউন্টারের বাইরে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম: তাঁর চোখের দিকে চাইতেই বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর দৃষ্টি সাধারণ দৃষ্টি নয়, একটা উজ্জ্বল আভা তা' থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে। বারীনদা বললেন যে, আপাতত তিনি কলেজ স্ট্রীটে আর্য পাবলিশিং হাউসে উঠেছেন। আমাদের আর-একজন সহকর্মী—অনিল কুমার ভট্ট বারীনদার সঙ্গে আর্য পাবলিশিং হাউসে গেলেন। অনিল ভট্টের, পণ্ডিচেরীতে বারীনদার সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান ছিল। আমরা তখন বুঝতে পারলাম না বারীনদা হঠাৎ কেন পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতায় এলেন।

পরের দিন বড়-বড় অক্ষরে আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর প্রকাশ হ'ল "অগ্নিঋষি বারীন্দ্রকুমার কলিকাতায়"। ইত্যাদি। দু'তিনদিন পরে বারীনদা আমাদের কাছে

খবর পাঠালেন তাঁর খাওয়া-খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, আমি তখন চোরবাগানে, বুক্কারাম বাবু ষ্ট্রীটে আমাদের দেশের তিনজন বন্ধুর সঙ্গে একটি বাসায় একসঙ্গে রান্না ক'রে খাওয়া-দাওয়া করতাম। বারীনদার নৈশ-ভোজনের ভার আমিই নিলাম। রোজ রাত্রে পরোটা আর তরকারি বা ছোলার ডাল রেঁধে বারীনদাকে দিয়ে আসতাম আর্য পাবলিশিং হাউসে।

বারীনদার কাছে শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে কিছু শুনতে ইচ্ছে হওয়ায় আমরা তাঁকে নিয়ে এলাম আমাদের অপর এক বন্ধু হেমাঙ্গ বরাটের ঘরে; আমরা সবাই ব'সে গেলাম বারীনদার কথা শুনতে। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল—কেন তিনি পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতায় এলেন এবং কতদিন থাকবেন, তখন তিনি বললেন যে, এ বিষয়ে এখন তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিষয়ে তিনি মাত্র কয়েকটি কথা বললেন—"শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে গিয়ে যোগ-সাধনা আরম্ভ করেন তখন তিনি বলেছিলেন—My yoga is for the liberation of my country. পরে তিনি ঘোষণা করলেন—My yoga is for the liberation of humanity. আরও পরে তিনি বললেন—এ-ও অহং-ভাব। ঘোষণা করলেন—My yoga is only for God."

কলকাতায় বারীনদা আবার 'বিজলি' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি গান্ধী-নীতিকে পুনরায় তীব্র অথচ সরস ভাষায় আক্রমণ শুরু করলেন। তখন গান্ধীজী তাল-গাছ কাটা আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। বারীনদা সেই তালকাটাকে উপহাস ক'রে 'বিজলি'তে লিখলেন যে, হরতালি-করতালি-ব'াপতালিতে মানুষের কর্ণ বধির, তার ওপর এই তালকাটার তান সামলাতে পারলে হয়। ইত্যাদি। তারপর বারীনদাকে দেখি তিনি কিসের প্রতিবাদ-সভায় মিছিলে যোগ দিয়ে রাজপথে হেঁটে চলেছেন। তিনি তখন বাস করছেন শ্যামবাজার-অঞ্চলে মোহনলাল ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর দোতলায়। সেই ফ্ল্যাটে আমাদের অনিল ভট্টও সস্ত্রীক বাস করছেন একটি ঘরভাড়া নিয়ে। তাঁর তখন মাত্র কয়েক-মাসের একটি কন্যাসন্তান। একদিন অনিল ভট্ট আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে সেই শিশু-কন্যাটিকে দেখালেন।...এর অল্প কয়েকদিন পরেই, একদিন বিকেলে আমি, পরীচাঁদ ও ধ্রুবচাঁদ সিল্ক হাউসে বসে আছি। এমন সময় অনিল ভট্ট সেখানে এসে হাজির। ধ্রুবচাঁদের সামনে একটি চেয়ারে বসে অনিল ভট্ট তাঁকে বললেন—"দাদা, আমি ঠিক করে ফেলেছি পণ্ডিচেরী চলে যাবে।"...অনিলবাবুর তখন খুব অর্থ-কষ্ট চলছে। কোনও কারণে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের কাজ তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাই ধ্রুবচাঁদ তখন ভট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিচেরী যাবার রাস্তা-খরচ আছে তো? উত্তরে ভট্ট বললেন—"না, হেঁটেই যাব ঠিক করেছি।" ...ধ্রুবচাঁদ তখন একটু মৃদু হেসে বললেন—"ছেলেমানুষী করো না, আমি টাকা দিচ্ছি, টিকিট কেটে ট্রেনে যাও।"

ধ্রুবচাঁদ অনিল ভট্টকে টাকা দিলেন, ভট্ট পরের দিনই পণ্ডিচেরী পাড়ি দিলেন স্ত্রী এবং শিশু-কন্যা পিছনে ফেলে সেই মেয়েটি আমাদের আশ্রমের অণিমা ভট্ট।...

পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে অনিল ভা আর ফিরলেন না। তিনি কলকাতায় ঋষভ-চাঁদকে চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করলেন—একবার তিনি পণ্ডিচেরী এসে আশ্রমের পরিবেশ এবং মা-শ্রীঅরবিন্দের যোগ-শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করে যান।...কয়েক মাসের মধ্যে ঋষভচাঁদও স্থির করে ফেললেন—তিনি পণ্ডিচেরী যাবেন; গত ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা তাঁকে মাল্যভূষিত করে মাদ্রাজ-মেলে তুলে দিয়ে এলাম।... এইভাবে শ্রীঅরবিন্দের চুম্বকশক্তি আকর্ষণ করতে থাকলো এক-একটি লৌহ-দৃঢ়তাকে।... ঋষভচাঁদও পণ্ডিচেরী চলে গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি জানালেন যে, তিনি ঠিক করে ফেলেছেন—আর দেশে ফিরবেন না,—আশ্রমেই স্থায়ীভাবে বাস করবেন।...ঋষভচাঁদের সঙ্গহারা হয়ে আমরা কতকটা মন-মরা হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় আমাদের প্রায় তিনটে বছর কাটলো কোনো রকমে। ঊর্মীরচাঁদও শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি পেয়ে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিচেরী গেলেন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন-লাভের বাসনায়। পৃথ্বীসিং নাহারও গেলেন তারপরে। ঊর্মীরচাঁদ দর্শন ক'রে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন কয়েক-মাসের জন্য। এরপর এল সেই স্মরণীয় ১৯৩৪ সাল। এই বছরে ঊর্মীরচাঁদ আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে আবার পণ্ডিচেরী পাড়ি দিলেন চিরদিনের জন্য। পরীচাঁদ ঠিক ক'রে ফেলল, আগামী নভেম্বর-দর্শনে সে পণ্ডিচেরী যাবে। সমস্যা দেখা দিল আমার। পরীচাঁদকে আমি বললাম "ঋষভদা আশ্রমবাসী হলেন, তুমিও যাচ্ছ,—আমি তা হলে দাঁড়াই কোথায়?" ...পরীচাঁদ বললো—"দর্শনের অনুমতি চেয়ে তুমিও শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লেখো"।

অন্তরের প্রেরণায় লিখলাম শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি—পরিষ্কার বাংলায়। তার সারাংশ মোটামুটি এই—(আমার অন্তরাত্মা কখন যে তাঁকে পরম গুরু ব'লে বরণ করে নিয়েছে তা মোটেই টের পাইনি, তাই প্রথমেই কলমের মুখ থেকে বেরোলো)—"আরাধ্য গুরুদেব। বুঝি, জীবনে সব-কিছুরই একটা উদ্দেশ্য আছে, কিছুই উপেক্ষার নয়, এমন-কি প্রতিটি ধূলিকণারও একটা মূল্য আছে। কিন্তু যতক্ষণ না বস্তুর অন্তর্নিহিত সেই সত্য আমার উপলব্ধির মাঝে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ছে ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারে না।...আমাদের অগ্রজ-প্রতিম ঋষভচাঁদ আশ্রমে স্থান পেয়েছেন, তাঁর সাহচর্যে আমরা তৃপ্তি ও আনন্দ পেতাম, তাঁর অভাব আজ আমরা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করছি। মনের অবস্থা এই রকম।—কী-একটা আকর্ষণ কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মনের এইরূপ অবস্থায় আপনি কি আমার আশ্রমে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করেন?

যতদূর মনে পড়ে ঐ চিঠি লিখেছিলাম আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই। এর কয়েক-দিন পরেই পণ্ডিচেরী-আশ্রম থেকে আমার নামে একটা খামের চিঠি এসে হাজির। খামটা খুলে পড়লাম, লিখছেন আশ্রম-সচিব শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়—

"শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন আপনি আগামী নবেম্বরের দর্শনের জন্য আসিতে পারেন, অনুমতি পাইলেন। ইতি—

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১৯-৮-৩৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

ঐ কথা-ক'টি পড়ে তখন আমার মনে যে এক অপূর্ব ভাবের ও আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ অনুমতি তো সাধারণ কোন পার্থিব-বিষয়ের অনুমতি নয়, এ-যে পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের আহ্বান! এ-আহ্বান ও আকর্ষণকে রোধ করে কে? সংসারে তখন আমার স্ত্রী, তিনটি শিশু-পুত্র; তৃতীয়টি মাত্র আট মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু। ...উদয়সিং নাহারও সেবার প্রথম ২৪শে নবেম্বরের দর্শনে যাবার জন্য অনুমতি পেয়েছে। ওরা ঠিক করেছে দর্শন-দিনের হপ্তাখানেক আগে পণ্ডিচেরী রওনা হবে। আমি পরী-চাঁদকে বললাম—"তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আমারও একটা টিকিট ক'রে নিও। পরীচাঁদ বললে—দর্শনের অনুমতি তো পেলে, আশ্রমের বাড়ীতে তোমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল কিনা সেটা চিঠি লিখে জেনে নাও।" তাই আবার লিখলাম চিঠি শ্রীঅরবিন্দকে। নলিনীদা সঙ্গে-সঙ্গে চিঠির উত্তরে জানালেন—ট্রেজার হাউসে নীচের তলায় একটা বড় ঘরে পরীচাঁদ ও উদয়সিং-এর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানে একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট আছে আমার থাকার জন্য। যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, পণ্ডিচেরী গিয়ে আমাকে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজতে হবে না আমার বাসের জন্য। খবর শুনে পরীচাঁদও খুশি হ'ল, সেও ঐ চিঠিতে জানতে পারলো তার শ্যালক উদয়সিং এবং তার নিজের থাকার জায়গা কোথায় ঠিক হয়েছে।...ক্রমেই দিন কাছিয়ে এল পণ্ডিচেরী পাড়ি দেবার। কলকাতা থেকে দেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং স্ত্রী-পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে এলাম,—তাদের কোনো আকর্ষণ বা পিছুটান মোটেই টের পেলাম না। নির্দিষ্ট দিনে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে মাদ্রাজ মেলে চেপে বসলাম। আমাদের পুরাতন বন্ধু চন্দ্রদীপও সেবার আমাদের পণ্ডিচেরীর সহযাত্রী হয়েছিলেন। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, একই কামরায় আমরা চারজন আমাদের আসন গ্রহণ করলাম। ভেবেছিলাম—মেল ট্রেন, তার ওপর থার্ড ক্লাস, নিশ্চয়ই খুব ভিড় হবে। কিন্তু যে কামরাটায় আমরা উঠলাম, তাতে যাত্রী খুব কম, কাজেই আমরা ভালভাবে বসবার এবং আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবার যথেষ্ট জায়গা পেলাম। কয়েকটা ষ্টেশন পরে অপর যাত্রীরাও প্রায় সবাই নেমে গেল। কোন-এক অলৌকিক শক্তির বিধানে আমাদের দূর-ভ্রমণ আরামদায়কভাবেই যেন স্থিরীকৃত ছিল। আমরা কবে কোন ট্রেনে পণ্ডিচেরী রওনা হব তা চিঠি লিখে শ্রীঅরবিন্দকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। ভক্তবৎসলের করুণা এইভাবেই বর্ষিত হয় ভক্তের ওপর। আমাদের কামরায় আমরা আরামে শুয়ে-বসে মাদ্রাজে পৌঁছে, এগমোরে গাড়ী বদল ক'রে নির্দিষ্ট দিনে পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম ভোরবেলায়। করুণাময়ী মা আমাদের জন্য ষ্টেশনে তাঁর মোটরগাড়ী পাঠিয়েছিলেন, সেই গাড়ীতে আমরা ট্রেজার হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা সেদিন সন্ধ্যার সময়েই শ্রীমার দর্শন পেলাম মেডিটেশান হলে সান্ধ্য-ধ্যানের সময়।

ট্রেজার হাউসের ওপর-তলায় শ্রীদিলীপকুমার রায় বাস করেন শুনে আমরা পরের দিন বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের অনুরোধে—"যমুনো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে"। গানটি তিনি গাইলেন

ভাবে বিভোর হ'য়ে। কবি নলিনীকান্তের সঙ্গেও প্রথম পরিচয় হ'ল সেদিন। তিনি ওই ১৯৩৪ সালেই আশ্রমে এসে শ্রীমায়ের শ্রীচরণে স্থান পেয়েছেন। সাহানা দেবীর সঙ্গেও সেদিন ওখানে দিলীপদা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের বন্ধু অনিল ভট্টকেও আমরা সেদিন সেখানে পেয়ে খুশি হলাম। ক্ষমতাচাঁদের সঙ্গে পরে সাক্ষাৎ হল তাঁর আবাসে। আমাদের ক্ষীরোদবাবু ও তিনি পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকতেন তখন।

আশ্রমের পরিবেশ তখন গুরু-গম্ভীর,—সর্বত্রই ছেয়ে রয়েছে এক অপূর্ব প্রশান্তি! আশ্রমে সাধক-সাধিকার সংখ্যা তখন সওয়া-শো থেকে দেড়-শো ছিল ব'লে মনে হয়।... শ্রীমা প্রত্যহ সকালে ওপর থেকে নেমে এসে মেডিটেশন হলের ভিতর দিকে উত্তর-পূর্ব কোনে একটি স্বল্প-উচ্চ চেয়ারে বসতেন এবং সমবেত ভক্তদের আশীর্বাদ দিতেন। আমরাও রোজ সকালে আশ্রমে গিয়ে মেডিটেশান হলে বসতাম মা নেমে আসার আগেই।...হলে উপবিষ্ট আশ্রমিকদের মাঝে তখন মাত্র একটি বালককে রোজ দেখতাম—সার্ট ও পায়জামা পরা। মা নেমে এসে আসন গ্রহণ করার পর ঐ বালকটিই প্রথমে উঠে গিয়ে, মায়ের কোলের ওপর মাথা রেখে মাকে প্রণাম ক'রে, মায়ের আশীর্বাদী-পুষ্প নিয়ে চ'লে যেত। সেই ছেলেটিই হ'চ্ছে আমাদের আশ্রমের রমেন পালিত। আশ্রমে তখন বালক বলতে, বোধহয়, রমেনই ছিল সবে ধন নীলমণি।...বালক-রমেনের পর মাকে প্রণাম করতো মুখে কালো দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা এক ফর্সা ব্যক্তি; মায়ের কোলের ওপর মাথা রেখে তাকে কতভাবেই নৃত্যভঙ্গী করতে দেখেছি শিশুর সারল্য প্রকাশ করতে। পরে জানতে পারি তাঁর নাম "শুদ্ধানন্দ ভারতী।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন "রাধানন্দ"। তারপর আমাদের নলিনীদা' এসে মাকে প্রণাম করতেন। সকলের প্রণাম শেষ হ'লে আমরাও উঠে গিয়ে মায়ের কোলের উপর মাথা রেখে মাকে প্রণাম ক'রে নিত্য নবজীবনের আস্বাদ পেতাম। মা রোজই একটা ক'রে নূতন সিল্কের সাড়ী প'রে আসতেন। অত-গুলো ভক্তের মাথার তেলে মায়ের শাড়ী নষ্ট হ'য়ে যাবে ব'লে মা তাঁর কোলের ওপর সিল্কের একটা ছোট্ট কাপড় রাখতেন, সেই কাপড়টার উপর মাথা রেখে ভক্তরা মাকে প্রণাম করতো।

এর পরে এসে হাজির হ'ল আমার জীবনের সেই সুবহান্ স্মরণীয় ও বাঞ্ছনীয় দিন ২৪ নভেম্বর। তখন শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিতেন সকালের দিকে। দর্শনার্থীদের নাম একটা লম্বা কাগজে ক্রমানুযায়ে টাইপ ক'রে মেডিটেশান্ হলে একটা বোর্ডে রাখা থাকতো। দর্শনার্থীরা সেই তালিকা অনুযায়ী পর-পর লাইনে দাঁড়াতো। ঐ তালিকার একটি কপি থাকতো শ্রীঅরবিন্দের কাছে, সেটা দেখে তিনি বুঝতে পারতেন কার পরে কে আসছে তাঁর সামনে।

২৪শে নভেম্বর আমরা সকালে স্নানাদি সেরে মেডিটেশান হলে গিয়ে দাঁড়ালাম নামের তালিকা অনুযায়ী। যথা সময়ে শুরু হ'ল উত্তরায়ণের অভিযান। শ্রীমায়ের দর্শন এবং তাঁর দিব্যস্পর্শ লাভ আমাদের আগেই হয়ে গেছে। এইবার আমরা দর্শন পাবো পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের।—মনে সে কী এক অবর্ণনীয় ভাবের স্ফুরণ। আমাদের

লাইন ক্রমেই এগিয়ে চললো স্বর্ণ-সিঁড়ি বেয়ে দিব্য-আবাসের অভিমুখে। পণ্য প্রকোষ্ঠের সামনে এসে, দরজা পেরিয়ে মেঝের ওপর পা দিয়ে সামনে চেয়ে দেখতে পেলাম শ্রীমায়ের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ। সম্মুখে সেই দিব্য আবির্ভাব লক্ষ্য ক'রে আমার সমগ্র সত্তা বিস্ময়ে ও পুলকে হল অভিভূত।...তাই না কবি গেয়েছেন "এ কি অপূর্ব আবির্ভাবের আলো।"...আমার সম্মুখবর্তীরা ক্রমে সেই যুগল মূর্তির সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রণাম শেষ করার পর এল আমার পালা। তাঁদের একেবারে সামনে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম পাশাপাশি শিব-শক্তি উপবিষ্ট স্বয়ং দুর্গারূপে শ্রীমা, আর শ্রীঅরবিন্দ জাগ্রত মহাশিবরূপে। প্রথমে আমার মাথা নুইয়ে দিলাম মহাশক্তির যুগল চরণে। কমল-চরণের কোমল স্পর্শে আমার অন্তর হল শিহরিত। শ্রীমা আমার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীমায়ের শ্রীচরণ থেকে মাথা তুলে প্রণত হ'লাম শ্রীঅরবিন্দের চরণ-যুগলের উপর। শ্রীঅরবিন্দ একটু ঝুঁকে আমার মাথা চেপে ধরলেন—কী-সে স্নিগ্ধ এবং শক্তি-সঞ্চারক স্পর্শ। সার্থক হয়ে গেল আমার সমগ্র সত্তা সেই সুদিব্য স্নিগ্ধস্পর্শে। দিব্যপুরুষের শ্রীচরণ থেকে মাথা তুলে প্রণত হলাম মা-শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণের মাঝখানে। শিব-শক্তি তখন এক সাথে আমার মাথায় তাঁদের হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। যুগপৎ যুগলমূর্তির সেই সুদিব্য স্বর্গীয় স্পর্শে আমার জীবন ও জনম হ'ল সার্থক, হ'ল ধন্য।

পণ্ডিচেরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

দক্ষিণপথ ছেড়ে কয়েক দিনের জন্য উঠে এলুম উত্তরে। সূর্য অস্ত যায়নি তখনও, এসে পৌঁছলুম পণ্ডিচেরীতে।

দাক্ষিণাত্যের নির্দিষ্ট নিয়মে পণ্ডিচেরীতে তখন বসন্তকালের শেষপ্রান্ত। অর্থাৎ মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে।

মস্ত শহর পণ্ডিচেরী। এটি ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে স্বয়ংশাসিত অঞ্চল, তামিলনাড়ুর প্রশাসনের অধীন নয়। ফরাসী সংস্কৃতি রক্ষণের এ-টি অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু বড় শহরে যেমন হয়। বাজার হাট দোকান পসার সবই ঘনসন্নিবিষ্ট। ওরই মধ্যে যানবাহনের ভিড়। পণ্ডিচেরিতে এই আমার প্রথম। বিগত চল্লিশ বছর ধরে সুযোগ সন্ধান করে ফিরেছি, সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করেছি বারবার, কিন্তু তখনও পণ্ডিচেরী ছিল অনেক দূরে। তখনও কাল পূর্ণ হয়নি।

পণ্ডিচেরী মানে শহর-বাজার-জেলা-প্রদেশ কোনটাই নয়, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বললেও তার পরিচয় দেওয়া হয় না। পণ্ডিচেরীর সত্য পরিচয় হল, ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এখানে তাঁর সর্বশেষ যোগাসন রচনা করে ধ্যাননিমীলিত হয়ে রয়েছে। আমি সেই তীর্থদর্শনে এসেছি অবশেষে।

একটি প্রশস্ত নালা পণ্ডিচেরীকে পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছে। স্পষ্টত সাগরতীরবর্তী পূর্ব শহরটি এতকাল ধরে ফরাসী রাজপুরুষরা অধিকার করে ছিলেন, এখানে তখন ভারতের অস্তিত্ব ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরির খবর কেউ রাখেনি। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে যেদিন সঙ্গোপনে একটি জাহাজযোগে বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবের গুরু এখানে এসে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখনও তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। সেই দিন থেকে বাঙলার সঙ্গে পণ্ডিচেরীর প্রথম পরিচয়। এর আগে তিনি যখন ফাঁসির আসামীরূপে কারারুদ্ধ ছিলেন তখন সেই বঙ্গাব্দ ১৩১৪, ৭ই ভাদ্র তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটি রচনা করেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—"

একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে কারারুদ্ধ থাকাটা অরবিন্দের পক্ষে বিধাতৃনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বিনাশর্তে ফাঁসির আসামীর কারামুক্তি তখনকার দিনে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। অতঃপর উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরবর্তী পাবলিক লাইব্রেরির প্রাঙ্গণে কারামুক্ত অরবিন্দ যে-যুগান্তকারী বক্তৃতা দান করেন সেটিতে বাঙালী জাতি নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। সেদিনকার বাঙালী প্রথম কান পেতে শোনে, কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে থাকাকালীন তাঁর যোগদৃষ্টির সম্মুখে দিব্যবিভায় বিভাসিত স্বয়ং বাসুদেব প্রতিভাত হন। একপক্ষে "ভারত আমার

বাণীমূর্তি" শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনাই পরাধীন ভারতের রাহুগ্রাসমুক্তিরই সাধনা। তাঁর জন্মতিথি ১৫ই আগষ্ট হল ভারতেরও নব জন্মতিথি। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতালাভের সেই দিনে শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে হাজরা-পার্কে যে-বিশাল জনসমাবেশ ঘটে, সেদিন আমার উপর সেই সভার কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়।

সেই আমি আজ এখানে এসেছি আমার নোঙর-ছেঁড়া নৌকা নিয়ে। সঙ্গে এসেছে আমার চিত্তের দৈন্য আর ভাবের দারিদ্র্য। এসেছে তার সঙ্গে আমার সারা জীবনের অবসাদ আর ক্লান্তি। আমার অবিনশ্বর ক্ষুধার পরিতৃপ্তি এখানে আছে কিনা, সেটাও আমার পক্ষে জানার দরকার ছিল বৈ কি।

আশ্রমে পৌঁছবার আগে মনে মনে কথা তোলাপাড়া করছিলুম। কিন্তু যোগাশ্রম মানে যে কেবলমাত্র একটি তথাকথিত 'মঠ' নয়—এখানে না এলে এটি কোন দিনই বুঝতে পারতুম না। এটি একটি ছোটখাট পরিচ্ছন্ন বসুধা ও জনবিরল জনপদ। বলতে পারা যায়, পণ্ডিচেরীর একটি 'পশ' অঞ্চল। এ-পাড়া ও-পাড়া, এপথ-ওপথ—যে পথে যতটা যেতে পারো, যখন যে কোনও বাড়িতে ঢুকতে পারো—প্রত্যেকটি বসতবাড়ি আশ্রমেরই অঙ্গ, কেননা প্রতিটি বাড়ি সাধকেরই বাসা।

প্রথমেই পেলুম শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে। তিনি চিরকালের রঙ্গ-রসিক, এবং তাঁর বাসস্থানও নিকটবর্তী রঙ্গপিল্লাই ষ্ট্রীটে। আমার জন্য তিনি স্থানীয় গভর্ণমেন্ট হাউসের অতিথিশালায় একখানা ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গেই দেখলুম বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরীকে—তিনিও অভ্যাগত, তাঁর সঙ্গে পণ্ডিচেরীর নাড়ীর যোগও বহুকালের। ওঁদের পেয়ে মনে হল বাড়ি ফিরে এসেছি।

সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী। সেদিনকার হর্ষোৎফুল্ল উপল সমুদ্র জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। পৃথিবীকে সেদিন আরেকবার যেন মায়াচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। সমুদ্রতটের বাঁধনের উপরে সুদীর্ঘ, প্রশস্ত ও সুন্দর পথটি পণ্ডিচেরীবাসীদের পরিভ্রমণের স্থান। পথটি সমুদ্রের সমান্তরাল। পথের একধারে সাগরের আকুলি বিকুলি, অন্যধারে সারিবদ্ধ অট্টালিকা একটির পর একটি।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে থেকে ষোল বছরের কিছু বেশি তাঁর যোগসাধনার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহসাধকদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতেন এবং সম্ভবত এক আধবার লোক-লোচনের সামনেও উপস্থিত হতেন। তাঁর বাসভবন ও গতিবিধির প্রতি বছরের পর বছর নজর রাখত আর এক সাধক, সে হল ব্রিটিশ ভারতের গোয়েন্দা। সে ব্যক্তি বাঙ্গালী ছিল কিনা জানিনে, কিন্তু সরকারী রেকর্ডে জানা যায় ব্রিটিশ আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা ছিল বাঙ্গালী!

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও অধ্যাত্ম সাহিত্য রচনার কালে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত ও দার্শনিক পল রিশার ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী মীরা শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে পণ্ডিচেরিতে আসেন এবং মিঃ রিশার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একযোগে সাহিত্য রচনার কাজ করতে থাকেন। এমন

সময় ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে ওঠে এবং সস্ত্রীক মিঃ রিশার ফ্রান্সে ফিরে যান। অতঃপর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রিশার একা আসেন পণ্ডিচেরীতে। তখন থেকেই এখানে তিনি বসবাস করছেন। এ বছরে তাঁর বসবাসের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

আশ্রম উপনিবেশটি সদাসর্বদা যেন আপন ঔজজ্বল্যকে প্রকাশ করছে। যে বৃহৎ দোতলা উদ্যান বাটিতে শ্রীঅরবিন্দ বসবাস করতেন ও যোগসাধনায় নিমজ্জিত থাকতেন, সেই বাটিতেই তিনি ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মহাসমাধি লাভ করেন। সেই বাটিরই বহিঅঙ্গনে তাঁর কনকজ্যোতিষ্মান দিব্যদেহকে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁর তিরোভাবের পাঁচদিন পরে, কারণ পাঁচদিন অবধি তাঁর দেহদর্শনাকুল অশ্রান্ত ও অগণিত জনসমাবেশের চক্ষুর সম্মুখে এই মহাযোগী এবং দৈবমানবের দেহজ্যোতিবিকিরণ ম্লান হতে চায়নি! এই সংবাদের অলৌকিকতায় সমগ্র ভারতের চিত্ত সেদিন ভাবাপ্লুত হয়ে ওঠে। অবশেষে ৯ই ডিসেম্বর বৈকালে শ্রীমা বলে পাঠান, শ্রীঅরবিন্দের পায়ের বড় আঙুলে একটি কৃষ্ণবিন্দু দেখা দিয়েছে, এবার তাঁকে সমাধিস্থ করার লগ্ন উপস্থিত।

একটি বর্শাচা ও সুশ্রী মার্বেল পাথরের বেদীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদেহ সুরক্ষিত রয়েছে। আমি দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে দেখছিলুম প্রভাতকাল থেকে রাত্রিকাল অবধি এই সমাধির উপরে পুষ্পার্ঘ দিয়ে প্রণাম করে চলেছে সকল সম্প্রদায়ের নরনারী ও বালক বালিকা।

শ্রীঅরবিন্দ যোগাশ্রমের এই অট্টালিকাই হল প্রধানতম কেন্দ্র। এইটেই মুখ্যভবন। কিন্তু এ ভবনটি নানা বিভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে দেখা যাচ্ছে প্রকাশনা বিভাগের আপিস। একটু অন্যদিকে ঘুরে গেলে আশ্রমের মুখ্যসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের কর্মকেন্দ্র ও শয়নকক্ষ। আরও একে একে অনেকে—যাঁরা পণ্ডিত ও সাধক, এবং যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সকল ভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়ে থাকতেন। ওদের কারো কারো মুখে আমি সেই মহাযোগীর ব্যক্তিগত ছোট ছোট সরস ও মধুর কাহিনী শোনবার জন্য বসে যেতুম।

শ্রীঅরবিন্দ জীবনরসিক ও রঙ্গরসিক—দুই ছিলেন, এ আমার জানা ছিল। ১৯৩০ ও ৩১ সালে তাঁর সহোদরা ভগ্নী সরোজিনী ও আমি একই ফ্ল্যাটে পাশাপাশি ঘরে বাস করতুম। তারও কয়েক বছর আগে শ্রীঅরবিন্দের এক অনুগত সহচর তাঁর প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার যখন বিবাহ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন ক্ষুব্ধ মনে সরোজিনী দেবী সেই সংবাদটি শ্রীঅরবিন্দকে জানান। চিঠির জবাবে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, সরোজিনী, তোমার রুষ্টপত্র আমি পেয়েছি। অমুক ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে যাচ্ছে শুনলুম। কিন্তু সে যখন তৃতীয়বার বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত হবে, তখন আমাকে আর একবার জানিয়ো। ইতি—সেজদা।

শ্রীঅরবিন্দরা ছিলেন চার ভাই ও এক বোন। বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ, সরোজিনী ও বারীন্দ্র। এদের কথা আমি অন্যত্র বলব।

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০, পূর্ণিমা তিথি। মহীয়সী মীরা রিশার ওরফে যোগাশ্রমের শ্রীমা আজ ৯৩ বছরে পদার্পণ করবেন। এই উপলক্ষে তিনি সমবেত সাধক সম্প্রদায় ও জনমণ্ডলীকে দর্শন দান করবেন সন্ধ্যা ঠিক ছটায়। তখনও প্রচুর পরিমাণে দিনমান থাকবে। আশ্রম উপনিবেশে একটি প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য করছিলুন।

এখানে আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ রয়েছেন বহু এবং তাঁরা সকলে বয়সের। আশি বছর বয়স পেরিয়ে গেছে এমন সব ব্যক্তিরা শুধু অতিশয় সক্রিয়ই নন, তাঁরা নব যুবকের মত প্রকাশ্যে দৈহিক ব্যায়াম চর্চা করেন এবং চরকির মতো ঘুরে বেড়ান। তাঁদের রকম সকম দেখে হাসি পায় না, বরং উৎসাহিত মনে এই কথাই আসে—বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে যাই! কোথাও অসুস্থতা দেখছিনে, প্রতিবাদ বা অসন্তোষের চিহ্ন নেই কোথাও, সুখের বা সম্ভোগের সন্ধানে ছুটছে না কেউ, দুঃখিত মনের কোথাও মালিন্য কোথাও দাগ ফেলছে না। তার বদলে দেখতে পাচ্ছি বিশ্রম্ভালাপে, হাসি পরিহাসে, সরস আলাপচারীতে, সবত্ন কর্মকুশলতায় এবং স্বচ্ছ আনন্দে সবাই নিত্যমুখর। যারা চিরদিন ধরে দ্বন্দ্বের দোলায় কষ্ট পায়, অর্থাৎ এটা, না ওটা, ওটা না সেটা, ঠিক কোনটা?—এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যারা জীবন কাটায়, যারা নিরাসক্ত নিস্পৃহ নিস্পৃষ্ট ও নির্বেদ মন নিয়ে শত শত সন্ন্যাস আশ্রমে উঁকে ঝুঁকে বেড়ায় তারা পণ্ডিচেরীতে এসে থমকিয়ে যেতে পারে। এটা অন্য জগৎ, অন্য আকাশ, অন্য সমুদ্র। এখানে সর্বত্যাগী ফকির হতে কেউ বলেনা, আর নিগ্রহের কথা কেউ তোলে না, গেরুয়াধারীকে দেখলে এখানে মানুষ চমকিয়ে ওঠে কথায় কথায় শিবশম্ভো-ধ্বনি শোনা যায় না, ভোগাসক্তির প্রতি এখানে রূঢ় প্রতিবাদ নেই। এখানে মন্দির নেই, ষোড়শ উপচারে বিগ্রহপূজা নেই, কথায়-কথায় মন্ত্রপাঠ কেউ করছে না। এখানে অবাধ স্বাধীনতার উপরে শাসন নেই কোথাও, কিন্তু চুলচেরা শৃঙ্খলা রক্ষার শতসহস্র আধুনিক নিত্য অভ্যস্ত। সকাল থেকে রাত্রি অবধি আশ্রমিকদের জীবন নিজস্ব শান্ত নীতি ও নিয়মে চলে। সংখ্যাতীত বর্ষীয়সী মহিলা, যুবতী, তরুণী—বালিকা—আপন আপন কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় করে চলেছে। তরুণ-তরুণী ও বালক-বালিকা—যারা ভারত ও বহির্ভারত থেকে এখানে এসেছে বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভাষায় পড়াশুনা করতে, তাদের চেহারাগুলি যেমন সুশ্রী তেমনি নিষ্কলুষ এবং তাদের পোষাক বা ইউনিফর্ম অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। পরনে যিনি হাফপ্যান্ট, গায়ে হাফ বা ফুলসার্ট। সর্বপ্রকার খেলাধূলার মধ্যে তারা সবাই একাকার। কেউ কৃশ-কাহিল-রুগ্ন-দুর্বল-বিবর্ণ বা নিস্তেজ নয়। আশ্রম-উপনিবেশের যে কোনও মাঠ ময়দান, জলাশয়, বন-বাগান, পথঘাট—যেখানেই গিয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছি, মনে হয়েছে বহু বর্ণের ফুল ফুটে উঠেছে।

আজ বিশেষ দিনটির সকালের দিকে শত শত লোক সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে এই মুখ্যভবনের দোতলায় উঠে শ্রীঅরবিন্দের শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, তাঁর পদচারণার পথ, তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্র, টেবিল চেয়ার, সোফা-কাউচ, কাগজপত্র ও লেখাপড়ার খুঁটিনাটি—একে একে নিঃশব্দে নির্বাক হয়ে দেখে-দেখে চলে যাচ্ছে। সব আছে সাজানো, শুধু

তিনি উপস্থিত নেই। যিনি সর্বাপেক্ষা সুপ্রত্যক্ষ, যাঁর আভাস পাচ্ছি প্রতি সামগ্রীতে, যাঁর অস্তিত্ব বোধ করছি প্রতি সাধকের ভাবনায়, শুধু তাঁকে দেখছিনে চর্মচক্ষে। শরীরী ও অশরীরীর মধ্যে এতটুকুও পার্থক্য আছে কিনা, এই ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। যাঁকে প্রত্যক্ষ দেখছিনে, তিনি যে উপস্থিত নেই—কে বললে? এই কক্ষগুলির মধ্যে যে-টুকু শূন্যালোক যেখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, সে ত' অনন্ত বিশ্বাকাশেরই একটি ছোট্ট টুকরো! আমি এই শূন্যের ইতিহাস কতটুকু জানি?

আমি অপেক্ষা করছিলুম যথাসময়ে। সন্ধ্যা ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট আগে অভ্যর্থনা বিভাগের অধিকর্তা চারুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে উঠে গেলেন দোতলার উপরের খোলা ছাদে। ছাদের উত্তরপ্রান্তে তিনতলা উঠেছে। সেই তিনতলা ঘরে আছেন শ্রীমা। ঘরের কোলে পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। শ্রীমা ওই ঘর থেকে ছাদে বেরিয়ে আসবেন। আমরা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এই দোতলা ছাদ থেকে তিন-তলার ছাদে তাঁকে দেখতে পাব।

ছ'টা বাজতে পাঁচ আমার ঘড়িতে। ঘড়ি মেলানো ছিল—যাঁদের মধ্যে আমি জায়গা নিয়ে বসেছি তাঁরা প্রায় সকলেই আশ্রমিক এবং সাধক। মুখ্যসচিব, পণ্ডিত ও দার্শনিক নলিনীকান্ত গুপ্ত—যাঁর সামনে দিয়ে শ্রীমার এখানে অবস্থানকালের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে এবং যিনি এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের তন্নতন্ন ক্রমোন্নতির প্রথানতম প্রত্যক্ষ-দর্শী তিনিও এসে বসলেন আমাদের এই জনা-পঁচিশেকের মাঝখানে। ওরই মধ্যে লক্ষ্য করলুম বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অসংখ্য বাড়ির ছাদগুলি উৎসুক দর্শকের সংখ্যায় ভরে গেছে। সংবাদপত্রাদির রিপোর্টাররা, সরকারি প্রচার বিভাগের তরফ থেকে একাধিক মুভি-ক্যামেরা, সাধারণ ক্যামেরাধারী অন্যান্য বহু উৎসাহী ব্যক্তি, দূরবীন হাতে দূরের বহু লোক,—অধীর অপেক্ষায় তারা তিনতলার ব্যাল্‌কনির দিকে অপলক চক্ষে চেয়ে রয়েছে। তারা সবাই নিশ্চুপ, টুঁ শব্দটি কোথাও নেই।

ঘড়ির বড় কাঁটাটি দেখতে-দেখতে এলো বারটার অঙ্কে, সেকেণ্ডের কাঁটা এসে সেই সোজা হয়ে '৬০' অঙ্কে ছুঁলো,—শ্রীমা বেরিয়ে এলেন ব্যাল্‌কনিতে।

স্তব্ধ পৃথিবী, বাকরুদ্ধ। নিস্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস বিশ্বচরাচর। নিত্যচঞ্চল প্রাণীজগৎ সহসা যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। আমরা সবাই যেন কাঠের পুতুল, সবাই যেন এই মুহূর্তে তাদের হৃৎস্পন্দনটুকু নিবেদন করে দিয়েছে শ্রীমার উদ্দেশ্যে।

আমরা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, তাই শ্রীমাকে সুস্পষ্ট দেখছিলুম। নিচের থেকে তাঁর আবক্ষ মূর্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের ঠিক সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। মিড-ভিক্টোরিয়া যুগের মতো সাদা-সাদা লেসযুক্ত তাঁর জ্যাকেট, পুরো হাতার জামা। বুকের ঠিক মাঝখানে রক্তবর্ণ একটি বড় তারকা সমান 'ইন্‌সাইনিয়া'—বোধহয় ব্রকেট, ফুল নয়। তিনি এখানে ওখানে ঘুরে এপাশে-ওপাশে—নিচে সকলকে দেখে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর চলাফেরার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ-সজীবতা প্রকাশ পাচ্ছিল, তাতে ওঁর জীবনকাল

দীর্ঘতর হবে, এটি অনুমান করা যাচ্ছিল। নাটকীয় সাড়ে পাঁচ মিনিট। এরই মধ্যে দেবীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান। উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য ছিল নাটকীয়। প্রতি দর্শকের মনে সাতটি সেতারের তার চড়াসুরে বাঁধা ছিল এতক্ষণ—সেই বাঁধন শিথিল হয়ে এলো শ্রীমা আবার যখন অন্তরালে চলে গেলেন।

আমি কলকাতার লোক। জনসমাবেশ কাকে বলে জানি। সভা, মিছিল, চটুল-প্রকৃতি তথাকথিত জনগণ—তাদের চেহারাও আমার অজানা নয়। কলকাতা হলে এতক্ষণ আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি উঠত,—'জয় শ্রীমায়ি কি জয়' অথবা 'শ্রীমা যুগ যুগ জিয়ে'—

আমি উঠে গিয়ে ছাদের পাঁচিলে মুখ বাড়িয়ে দেখি, নিচের রাস্তাগুলোয় হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে নরনারী তখনও স্তব্ধ, নিশ্চল ও রুদ্ধবাক হয়ে দণ্ডায়মান। তাঁরা এমনই নিশ্চুপ ও স্থাণুবৎ যে ছাদের উপর থেকে যদি কেউ একটি আলপিন ফেলে নিচের রাস্তায় তবে তারও আওয়াজ শোনা যেতে পারে। না, এ আমার নতুন আবিষ্কার। আমার জীবনে এমন সুশৃঙ্খল ভদ্র ও শান্ত জনতা কোথাও কোনদিন দেখিনি!

এবার আমার পরিভ্রমণ ও দৃশ্যাদর্শনের পালা। আশ্রমের এই উপনিবেশ এবং অধ্যাত্ম সাধনার এই প্রতিষ্ঠান যে কত বৃহৎ, এটি চট করে বাইরে থেকে বুঝতে পারা যায় না। আশ্রমের সাধকসংখ্যা দু'হাজার। প্রতিদিন তাঁদের জন্য তিনবার আহারের আয়োজন হয়। অর্থাৎ দৈনিক ছয় হাজারখানা থালা পড়ে। যারা রান্না করে, থালা মাজে, ঘর ধোয়, কুটনো-বাটনা-জল-তোলা ঘরের পাট ইত্যাদি কাজে লিপ্ত, তারা সবাই সাধক, কি পুরুষ কি মহিলা। বস্তুত, শ্রেণীহীন সমাজ, শ্রমের মর্যাদা এবং বারোয়ারী রান্নাভোজ—যেটাকে সাম্যবাদীরা বলে কমিউনিটি কিচেন বা কমিউন—একালে তার প্রথম জন্ম এই যোগাশ্রমে। এর আগে অর্থাৎ শত-সহস্র বছর আগে পুরীর শ্রীক্ষেত্রে এই বারোয়ারী রান্নাভোজের প্রথা সর্বাগ্রে চালু হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রথা অধ্যাত্মবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। শ্রীমা এখানে এই ব্যবস্থাপনাকে কালক্রমে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

আশ্রমিকদের বসবাসের ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য প্রায় পাঁচশ'খানা সুদৃশ্য পাকা বাড়ি নেওয়া আছে—যার অনেকগুলির ভিতরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। এদের মধ্যে তিনশ'খানা বাড়ি আশ্রমের নিজস্ব, বাকিগুলি ভাড়া নেওয়া। এমন বহু অট্টালিকা রয়েছে নানা পল্লীতে, যাদের সঙ্গে সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান ও ফলের বাগান সংলগ্ন। বড় বড় ধানক্ষেত, শাক-সব্জির বড় বড় খামার, গম ও কলাই উৎপাদনের মাঠ, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সরবরাহের জন্য বড় বড় গব্যশালা, হাঁস-মুরগি পালনের বড় বড় প্রতিষ্ঠান,—এসবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উচ্চশিক্ষিত ও অক্লান্ত কর্মীরা রয়েছেন। চোখেই দেখতে পাচ্ছি দেশপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, সুপণ্ডিত, কবি, সাহিত্যকর্মী, শিল্পী, গায়ক ও গায়িকা এবং এঁরা ছাড়াও অধ্যাপক শিক্ষক, বহু ভাষাবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারজীবী, কারিগরীবিদ্যা-বিদ, রাজনীতিক, এমন কি যাঁরা সিনেমা ফিল্ম্ প্রযোজক—তাঁরাও এই আশ্রমের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত। ভারতের অন্য কোথাও অদ্যাবধি এ আশ্রমের জুড়ি দেখিনি। আর কিছু নয়, কিন্তু এতবড় একটা বিশ্বসমাজের সংহত কর্মকেন্দ্র অপর কোথাও দেখা যায় না। এখানে রয়েছেন ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ক্যানাডিয়ান, ইটালিয়ান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান—এবং কে নয়? পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মিলিয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বে তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য 'অরোভিল' নামক যে বিশাল একটি উপনিবেশের পত্তন করা চলছে সেটি শ্রীমার দ্বারা পরিকল্পিত এবং শ্রীঅরবিন্দের সাধনার দ্বারা দীক্ষিত। এই অরোভিলের ভিত্তি-স্থাপনার জন্য ছয়টি মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক দেশের মাটি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। একটি পাহতলায় বসে আমি অরোভিলের কর্মতৎপরতা দেখছিলুম। শ্রীঅরবিন্দ হলেন মন্ত্র, শ্রীমা সেই মন্ত্রের সিদ্ধি। শ্রীঅরবিন্দ হলেন পরম যোগ-সাধনার দৈবচেতনা, শ্রীমা হলেন কর্ম-সাধনার পরমা অভিব্যক্তি।

একদা গঙ্গোত্রীর এক আশ্রমে বসে তিনশ'বছর বয়স্ক সেই চিরনগ্নঋষি কৃষ্ণাশ্রমকে প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার এই আশ্রমবাসিনী বৃদ্ধা মাতাজি কে?

মাতাজি। মৌনী কৃষ্ণাশ্রম একবার তাঁর দুই হরিদ্রাভ চক্ষু উপর দিকে তুলে তুষারাবৃত পর্বতচূড়ার বাইরে অনন্ত নীল গগনে দৃষ্টি বুলিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। তারপর এক হাতের একটি আঙুল দিয়ে অন্য হাতের উল্টোপিঠে সাংকেতিক দেবনাগরি অক্ষরে লিখলেন, 'উনি ব্রহ্মচারী ভগবৎস্বরূপ। স্ত্রীব্যক্তি।'

অর্থাৎ মাতাজি হলেন আসলে পুরুষ, পুরুষের অপর অভিব্যক্তি হল নারী। এখানে যোগাশ্রমের কবি নিশিকান্ত একদা শ্রীমাকে এক কবিতায় সম্বোধন করেছিলেন 'শ্রীঅরবিন্দা' এই নতুন সংজ্ঞাটি আমার ভাল লেগেছিল।

সাধকগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী—যথা ধুতি, শাড়ি শার্ট ফতুয়া ও মেয়েদের নানাবিধ পরিচ্ছদ এখানে তৈরি হয়। প্রাক্তন সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সাহানা দেবীর পরিচালনায় রয়েছে দর্জি বিভাগ। কামারশালা, কুমোরশালা, ধোবিখানা, কাগজকল, তাঁতের ঘর, রুটি তৈরীর কারখানা, জুতো বা খড়ম তৈরীর আড়ডা, ডাক্তারখানা, হোমিওপ্যাথির কেন্দ্র, ছুতোর ও রাজমিস্ত্রির আড়ডা, মোটর বাহিনীর মেরামতি কেন্দ্র ইত্যাদি এরা সব ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। প্রয়োজনীয় ঝি-চাকর বা ঝাড়ুদার মোতায়েন করবার জন্য একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। আশ্রমিক-পরিচালিত ফেশনারী দোকান, রেষ্টুরেন্ট —তারও অভাব নেই। মূল আশ্রমের আহার হল নিরামিষ, যেখানে দৈনিক ছয় হাজার খানা পড়ে। কিন্তু এমন বহু সাধক আছেন যারা নিজ নিজ বাসভবনে অভ্যাসবতো আমিষ আহার করেন। সাধকদের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা স্বীকৃত। শিল্পীশ্রেষ্ঠ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় যাঁর বয়স এখন ৮৭ বছর, তিনি ছবি আঁকেন আপনবনে। তাঁর আঁকা রঙীন ও সুবৃহৎ চিত্রপট—শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা—মুখ্য আশ্রম ভবনকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে। দার্শনিক শিশিরকুমার মিত্রের কাজ অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা। এঁরা ছাড়াও বহু বন্ধু ও মহিলাগণকে দেখেছিলম যাঁদের অনেকের সঙ্গে এককালে আমার কিছু

কিছু ঘনিষ্ঠতাও ছিল। অনেকে হারিয়েছে অনেক, অনেকের নোঙর ছিঁড়েছে, অনেকে রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে এসেছেন, অনেকে জেনেছেন নবজীবনের আস্বাদ এবং অনেকে খুঁজে পেয়েছেন এমন বস্তু—যা চিরজীবনের পরিতৃপ্তি এনে দিয়েছে।

বিদায় নেবার আগের দিন সন্ধ্যায় সাহানা দেবীর ভবনে গানের ও আবৃত্তির একটি আসর বসেছিল। সেই আসরে সাহানা দেবী বহু কাল পরে তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে সেই সর্ব-জনপ্রিয় গানটি আরেকবার গাইলেন :

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে,
ভোরের আলোয় মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে।
ভরানদী ছায়াতলে ছুটে চলে,
ধোঁয়ে কাকে, পিছুডাকে।'

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩০)

অহংএর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া চাই, নাহলে সম্যক্ জ্ঞানযোগে আরূঢ় হওয়া অসম্ভব। অন্নময় প্রাণময় মনোময় কোষগুলি উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষের সন্ধান পেলে যোগভূমি লব্ধ হয়। একসত্য ঈশ্বর—এই অদ্বৈততত্ত্ব মনের দর্শনে পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। যখন আলোর মত সত্য দর্শন হয়, যে আলো অন্তর-বাহির সবই আলো করে আছে, অন্তরে যাকে পেলাম, বাহিরের সবই সেই আলোয়ই ভরে আছে, একমাত্র সেই আলোই সত্য, এই বোধে বোধ হওয়াই যথার্থ জ্ঞানযোগ। আর নিজেকে দেহ-প্রাণ-মন থেকে মুক্ত করে যখন জানি, তখনই 'আমার' বন্ধনটি মন থেকে খসেনি—অতি সূক্ষ্ম গভীরেও সেই মনের অহং আমার 'সব' জানাকে সীমাবদ্ধ করে। আমিই সাধনা করি, কিন্তু আমার সাধ্যও থাকছে "আমি।" একটা ছোট আমি, আর একটা বড় বা "পাকা আমি"। যোগে এই দুটি তত্ত্বকেই ভাল করে জেনে ও বুঝে না চললেই মুস্কিল। কেননা "আমা" বলে আমির যে বোধ, তা তো থাকছে। এই নিয়ে দার্শনিক যে সব আলোচনা আছে, শ্রীঅরবিন্দ তার সবগুলির সার গ্রহণ করে এই দুরূহ অহংতত্ত্বের আলোচনায় আলোক-পাত করেছেন। লৌকিক আমি যেমন আছে, এ যে থাকবে না সেটা তো বোঝা যায়, এ হল সাময়িক সৃষ্টি, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় আত্মউপলব্ধি হবে কার? সেই মূল অহন্তার সন্ধান করতেই হয়।

চৈত্যপুরুষকে দেখেছি তিনিই দেহরথের মধ্যস্থিত "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ", অতি সূক্ষ্ম একটি জ্যোতির কণা, তিনিই অধূমক দীপশিখা। দেহ-প্রাণ-মনের তিনিই প্রভু, তিনিই যথার্থ আমার আমি বা আত্মা। কাজেকাজেই সেই অবিনাশী আত্মতত্ত্ব যা কিনা সব ছেয়ে আছেন "যেন সর্বমিদং ততম্" সেও তিনি। বৌদ্ধমতে এ হল আত্মভাব, আত্মা শেষ পর্যন্ত শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, একেবারে অসৎ (Non-existence) পর্যন্ত উজানে গতিমুখ তার। আদি বেদান্ত বা উপনিষৎ বলেন ঐ শূন্যের বুকেই পূর্ণের উপলব্ধি হয়। একরস-প্রত্যয় আত্মাই সূর্যের মত দেদীপ্যমান, আলাদা আলাদা ভাবে তার অস্তিত্ব থাকে না। ভক্তিপথের সিদ্ধান্ত আবার একটু অন্যরকম। জীবের অহং গলে গেলেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, জীবেরও নিত্য সত্তা শুদ্ধ জীব, জীব কৃষ্ণদাস, একরস প্রত্যয় নয়। এ হল প্রকৃতির দিক, শুদ্ধ জীবই প্রকৃতির শুদ্ধ রূপ। কিন্তু এই তিনরকম অনুভব বিভিন্ন বলে যেমন মনে করতে পারি, তেমনই এ-ও নিশ্চিত জানি যে পরম সত্য একই, তাঁকে সব দিক দিয়ে এক সংবর্ত ল চেতনায় অনুভব করতে পারা যাবে না কেন? তাহলে তো একই সঙ্গে যুগপৎ আস্বাদন অনুভব প্রত্যয় আনন্দ সবই সম্ভবপর হবে। সর্বভাবে সব দিক দিয়ে

অবিরোধে সত্যকে পূর্ণভাবে জানার অর্থও তাই—জানা পাওয়া অনুভব করা একাত্ম হওয়া ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে সেই জ্ঞান, অনন্ত।

আত্মা বৃহৎ আর তার বিপরীতমুখে অহংএর খণ্ডিত সঙ্কীর্ণ বোধ। শ্রীঅরবিন্দ দেখালেন প্রকৃতির সৃষ্টিতে কাজ চালানোর জন্য ওই অহং-এর উদ্ভব; অহং না থাকলে এক মহাশূন্যের মত ফাঁকা অবস্থা হয় এটাও সত্য। তাই কাঁচা আমিকে ছাড়িয়ে "পাকা আমি"কে নিয়ে মহাশূন্যের যোগ শুরু করতে হয়। ওই খণ্ডিত অহংকে না ছাড়লে জীবনের গোল মেটে না, দুনিয়ার গুঁতোগুঁতি সব ঐ অহংকে নিয়েই। একই আত্মা সবার অন্তরে, একই চিৎপুরুষ সকলের মধ্যে জাগছে, এ না দেখতে পারলে সর্বাত্মভাব না হলে সবার সঙ্গে মিলব কি করে?

ছোট আমি কাঁচা, সে তার খদ্যোতের আলো ছাড়া আর কিছু দেখতে চায় না, তা সে যত বড় গলা করে মানবতার উদার বুলি আউড়ে নিজেকে বড় বলে প্রচার করতে চাক না কেন। যতক্ষণ না তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে মানবতাবাদ ও অভ্যুদয়ের আদর্শ এক অখণ্ড সুষমায় বিধৃত হয়ে তার আত্মবোধে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা তার বুদ্ধিকে কলুষিত করে ও বিরোধ সে ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। অহং খণ্ডিত হলে আত্মভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়, আবার আত্মবোধে সকলের মধ্যে নিজেকে দেখে অনুভব করতে পারলে আত্মার ঔদার্যে দেশপ্রাণ মানব বিরাট হয়ে মহৎ হন। শুধু মন দিয়ে কোন আদর্শ নিয়ে চলতে গেলে পার্থক্যটাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, চেতনা জ্ঞানকে খণ্ডিত করে। এমনি করে দেহের ও প্রাণের অহং মনের আনন্দকে খণ্ডিত করে বলেই নিজের ক্ষুধাটাই শুধু সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। সকলকে বঞ্চিত করেও নিজের উদরপূর্তি করে ক্ষুদ্রমনা সুখী হয়। আবার ওই ভোগের আনন্দেই অপরকে খাইয়ে একরকম সুখ পাওয়া যায়। তখন বোঝা যায় ভোগে আর ত্যাগে ভাললাগার স্বাদ দুরকম, সবার জন্য ত্যাগ করার দুঃখ বা বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হয়। এই আনন্দকেই সঙ্কুচিত করছে অহং। সত্য চৈতন্য জ্ঞান আনন্দ খণ্ডিত হলে শক্তিও খণ্ডিত হয়, তাতে দৈন্য দেখা দেয়। মানুষ তখন অসহায় বোধ করে এবং দল বেঁধে আবার শক্তিমান হয়ে উঠতে চায়। কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি সাধক হবে যদি এটা মানুষের বোধে আসে যে একা যা পেরে উঠি না, দশজনে মিলে তা করে মহৎ সিদ্ধি লাভ করব। কিন্তু এর উপায় হল সঙ্ঘশক্তিকে চিন্ময় বোধে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করা। তাহলে ওই খণ্ডিত অহং বিসর্জিত হয়ে বৃহৎ আত্মা মহান আত্মায় পরিণামিত হবে। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। আমার 'আমি'কে পরিণত করার অর্থ হল, জীবাত্মারা যে সব পৃথীভূত একই আত্মসত্তা (collective self), এক সমগ্রচৈতন্যের মধ্যে সকলে বাস করছে, বাহিরের সব সঙ্ঘশক্তির মধ্যেও তারই বিস্তার, এই বোধে বোধ হওয়া। আজকালকার যুগে এই মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ হবার তাগিদ রয়েছে, এই কারণে আত্মচৈতন্যকে বিশ্বচৈতন্যে মিলিত করা প্রয়োজন। এটা উপলব্ধির বিষয়, শুধু মনন বা বিচারের বস্তু নয়। সর্বাত্মভাবের মূল কথা যেমন সেই

নির্বিশেষ গুণাতীত চৈতন্যে যেমনই বিশ্বচৈতন্যে আত্মাগুলি সব সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিরাজিত হবে, আত্মদীপগুলি সেই অপর অনালোকের আলোয় বিভাসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু যাঁরা এসব নিয়ে কাজ করতে যান, তাদের নৈতিক সমর্থন থাকলেই ভাবনাতে অনেক গলদ থাকে, সেগুলি দেখবে কে? বিশ্বমানবতার ধারণায় মনের সীমানা বড় হয়, চিন্তায় প্রসারতা আসে, এটা খাঁটি কথা। তাছাড়াও পাপপুণ্যের বোধ থেকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি জাগে, কিন্তু তবুও চেতনার গভীরে এই নীতিবোধ নিয়ে যেতে পারে না। তাই কিছুকাল পরে এটা যখন ভেঙে যায়, তখন বুঝে দেখা প্রয়োজন যে আরও গভীরে যেতে হবে। কিন্তু সকলের সঙ্গে দল বেঁধে মনের সংস্কার নিয়েই চলি, তাই সেখানে যে আরও গভীরের দাবী থাকতে পারে, আরও কিছু করণীয় থাকে, সেটা দেখতে বা করতে চাই না। যেমন ব্যক্তি-জীবনের নীতিবোধ আর সমাজগত জীবনের নীতিবোধ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। অশুদ্ধ অহংকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলা হয়, যে কোনও উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, তা সে যেমন করেই হোক না কেন, এই নীতিতে কোনও একত্ব স্থায়ী হতে পারে না। সাধ্য ও সাধনের মধ্যে যদি সমান সততা না থাকে, তাহলে শুভবুদ্ধির উন্মেষ সুদূরপরাহত, তার দৃষ্টান্ত বহির্জগতেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যর্থতার কারণ আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হচ্ছে না, আর তা যদি না হয় সব বিশ্বজননীন ভ্রাতৃভাবেরই অকালমৃত্যু অনিবার্য।

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে সবার হিতসাধন করতে গিয়ে তোমার ওই ক্ষিষ্ট অহং যদি প্রসারিত করে তোল তো সেই ক্লেশ সংক্রামিত হয় কিভাবে ও কোথায় সেটা দেখতে হবে। যাদের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববোধ নেই সত্তা নেই সেই জনগণের মধ্যেই ঐ গলদটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। জনগণের গণ ও গণপতিকে আলাদা করে বুঝতে হবে। যে কোনও আদর্শবোধ গণের (mass) মধ্যে নেমে এলে আদর্শের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। তাই দেখা যায় ভাল কাজ করতে একজোট হওয়া আর শেষপর্যন্ত থাকে না, কিন্তু মন্দ কিছু করার সময় বা ভাঙন ধরাতে নষ্ট করতে দলবাঁধার অভাব হয় না। ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা তার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে ধরতে পারে? গণকে চালনা করবেন গণপতি। তাই ব্যক্তির শক্তি যদি গলদমুক্ত না হয়, তার দ্বারা জনগণের উন্নতি বা মুক্তিও আশা করা যায় না। ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজগত জীবন দুয়ের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আত্মশুদ্ধি না হলে তো তা সম্ভব হবে না। সমাজসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেও আত্মবিদ হওয়া চাই। গান্ধীর নীতির মধ্যে আমরা দেখেছিলাম তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে উপবাস করে পূত পবিত্র হতে চাইতেন। এটা ছিল তাঁর তপস্যা। কেননা জনগণের ব্যর্থতাকে তাঁরই নেতৃত্বের ব্যর্থতা তাঁরই সততার ত্রুটি বলে মনে করতেন।

এ বিষয়ে ভারতের আদর্শ রাজর্ষির আদর্শ, যেমন রাজর্ষি জনক, গৌতম বুদ্ধ, অশোক, এইরকম জননায়ক অন্য দেশে দেখা যায়নি। যিনি বীতশোক হতে পারেন তিনিই গণনেতা হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তিনিই গণনায়ক, শ্রীঅরবিন্দ মানবসেবার আদর্শের

ভিত্তিতে এই দিকটাই বোঝাতে চেয়েছেন। সমষ্টিগত আত্মসত্তাকে (collective soul) জানতে হলে আপন আত্মার গভীরে ডুব দিয়ে তার রহস্যটি উন্মোচিত করতে পারলে গণচেতনার শুদ্ধি ঘটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয়। এই অবগাহনের ফলে যদি সেবা-বুদ্ধি জেগে ওঠে আর সেই গভীর প্রদেশ হতে কর্মের প্রেরণা উৎসারিত হয়, তখনই দেশ-সেবা মানব-সেবা সবই সার্থক হয়ে উঠবে। তাই যিনি নেতা হবেন, তাঁর দৃষ্টি যেমন বাহিরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হবে, তেমন গভীরেও তিনি হবেন জ্ঞানবান্, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সঙ্গেই তাঁর একাত্মতা, গভীর মিলন।

ভারতবর্ষের এই আদর্শের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বাত্মক হয়েও কর্ম করে চলেছেন। শুধু ঘটনা পরম্পরা ধরে বিচার করলে মনে হয় সবই যেন নিষ্ফল হয়ে গেল। তাঁর জীবনের শিক্ষাদীক্ষার ধারক ও বাহক কে আর হতে পারল? তাহলে কি পরিণামে শুধুই ব্যর্থতা? তাঁর নিজের বংশ যদুবংশ পর্যন্ত তিনি ধ্বংস করে গেলেন। কিন্তু কী যে তিনি দিয়ে গেলেন যা কিনা হাজার হাজার বছর ধরেও আজ পর্যন্ত ভারতজনকে ধরে রেখেছে, ভারতাত্মাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। ১৯০৫ সালের স্বদেশীবিপ্লবের যুগে বিপ্লবী তরুণদের সকলের হাতে থাকত গীতা, তারা ওই গীতার আদর্শে চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করে চলত, আজও সেই গীতা ভারতের প্রাণ। 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বর''....''হত্বাপি ন নিবধ্যতে''...যুদ্ধ কর...হত্যা করেও তোমাকে ঘাতকের পাপ স্পর্শ করবে না...।'' গীতার এই মহান্ অবোধ বাণী, এ-ই তো মহান আত্মার স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ দুদিক দিয়েই পূর্ণদৃষ্টিতে তা দেখতে ও বুঝতে নির্দেশ দেন। এই আদেশ যদি কেউ ঠিকমত ধরতে ও বুঝে চলতে পারে, তবে তার আত্মশুদ্ধি ও জগৎ-সেবা বা মানবের হিতকর্ম দুই-ই সার্থক ও সফল হবে।

এযুগে জাগ্রত জীবনের চৌহদ্দী বিরাট হয়ে পড়েছে। সমগ্র পৃথিবী এসে জড় হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের আঙিনায়, সর্বমানবের কথা, একজগৎ-ভাবনা এসব আমরা না ভেবেও পারি না। One World, United Nation, Comity of Nations, Philanthropy, Cosmopolitanism এইসব সমষ্টিবোধের চিন্তা মনীষীদের চিন্তাজগতে প্রসারতা এনে দিয়েছে, কিন্তু এ ভাবনা গভীরে একেবারে আত্ম উপলব্ধি পর্যন্ত না গেলে তো এর সমাধান মিলবে না। মানব-সেবাই বলি বা জগতের উন্নতি বলি, এতে বৃহত্তের ধারণা হওয়া চাই। সমষ্টি চেতনায় মহাযোগিনীর যোগসাধনা প্রকৃতিতে ধরতে না পারলে ও তার সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হতে না পারলে একত্বের প্রতিষ্ঠা হবে না, সমদৃষ্টি বা সমতার বোধও লব্ধ হবে না।

* * *

জ্ঞানযোগের মূল কথাই হল জানা। কি বা কাকে জানব? বাহিরের জগৎ তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করে জানতে হবে,—এ হল জড়বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। উপনিষৎ এ রকম জানাকে বলেছেন অপরাবিদ্যার জ্ঞান। প্রাচীনদের মতে অবীত বিদ্যা যা কিছু,

তা শাস্ত্র-পাঠের জ্ঞান হলেও সব কিছু অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়ে। আর যে বিদ্যায় অক্ষরের জ্ঞান হয় সেই বিদ্যাকে বলা হয়েছে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। অক্ষর আমাদের মধ্যে কূটস্থ অচল ও ধ্রুব, তিনিই বিশ্বাতীত। তাঁকে জানতে গিয়ে আমাকে বৃহৎ হতে হয়, ব্রহ্ম হয়ে জানতে হয়—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে অনন্তকে জানতে পারলে তবেই আত্মাকে জানা যায়, বিশ্বকেও জানা যায়। তাই অক্ষরতত্ত্ব অধিগত না করতে পারলে বিশ্বজ্ঞান কার্যকরী হয় না, আত্মজ্ঞানও লাভ করা যায় না। অহন্তার মুক্তি ও শুদ্ধি প্রসঙ্গে বাহিরের জগৎকে নিয়ে নিজেকে জানার অর্থাৎ বিশ্বজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের আলোচনা একইসঙ্গে করতে হয়। প্রথমে দেহপ্রাণমনের গণ্ডী অতিক্রম করে ঊর্ধ্বচেতনায় যেতে হয় সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার পরেও যে রয়েছে ঐ অহংগ্রন্থি, সেই অহন্তাকে মুক্ত শুদ্ধ করা আরও কঠিন। অহং তিনগুণে মিশে আছে, শুদ্ধ অহং জগতে নেই। শুধু এই 'আমার' আমি কেন, সব কিছুর মধ্যেই এমনকি জড়পরমাণুর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন অহংবোধ রয়েছে। তার আধার (structure) ও গুণ (quality) একটা কঠিন ছকে বাঁধা, যার জন্য একটা পরমাণু পরমাণুমাত্র, আর কিছু নয়, হতে পারে না। এই গ্রন্থি এই তার অহন্তা, আর এই তন্ত্রকেই বলে অভিনিবেশ। ঠিক এই কারণেই আমাদের দেখা-শোনা চলা-ফেরা সব কিছুই একটা গণ্ডীবাঁধা পথ ধরে যান্ত্রিক নিয়মে যেন স্বাভাবিক ভাবেই চলে। কাজেই এই অহং-বোধ সৃষ্টিতে অক্ষ (axis) রূপে দানা বাঁধার কাজ করেছে। মূল যে পরাহন্তা তিনি এক—"একোঽহম্ বহুস্যাম্"...বহু হতে চাইলেন, সৃষ্টি শুরু হল। তিনি সংবৃত নিগৃহিত হয়ে জড়রূপ নিশ্চেতন পর্যন্ত হয়ে গেলেন, আবার পরমাণুর ঐ অহংবোধ অবলম্বন করে দানা বেঁধে বেঁধে সৃষ্টিতে ক্রম-অভিব্যক্ত হতে হতে আবার এই দেহ প্রাণ মন নিয়ে মানুষের অহংবোধ। এক বহু হবার ইচ্ছার মূলে অহন্তাবোধের প্রয়োজন ; সৃষ্টির সেই মূল অহং হতেই তো নামতে নামতে আবার অহং এবং তা থেকে মন বুদ্ধি অহন্তার চিত্ত, আবার পরিণামিত হতে হতে ব্রহ্মই হয়ে যেতে চাইছি—("অহং ব্রহ্মাস্মি")। তাহলে ওই পরাহন্তাই সৃষ্টির অক্ষদণ্ড। জড় পরমাণু পর্যন্ত ব্রহ্মের অবতরণ বহুর বোধ, আবার এই জড় পরমাণু হতেই অভ্যুদয় বা উত্তরণ। তার ফলে জড়বস্তুই পরিণামিত হবে ব্রহ্মে—এই হল সৃষ্টিতে উত্তরণের বা ক্রম-বিকাশের রীতি।

বহু অহংএর সংঘাত হল জগৎ, আবার বহু অহং মিলে হয় এক বিরাট অহং বা সমষ্টি অহং। যেখানে আমরা খণ্ডিত হয়ে চলেছি, তার বিপরীতমুখী একটা গতিতে আমরা নিজেদের প্রসারিত করতে চাইছি। সবাই মিলে আপন হয়ে এক হয়ে যেতে চাই, এই হল জীবজগতে ভালবাসার গোড়ার কথা। দেহকোষেই এই ব্যাপারটি ঘটে চলেছে law of co-operation। শ্রীঅরবিন্দ এই ব্যাপারকেই চতুর্থ ভূমির তত্ত্ব বলছেন —চৈত্য ভালবাসা। কিন্তু আমাদের মন জাগার সঙ্গে সঙ্গে অহংএর পৃথকত্ব আধারে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে অহংবোধকে কঠিন করে, সব বৈষম্যের মূল সেখানেই। এই খণ্ডিত

অহংবোধের অর্থই হল জ্ঞানের সঙ্কোচ। তাই আনন্দেও সঙ্কোচের খাদ মিশে যায়, বিষেষ হানাহানি দেখা দেয় আর তার ফলে আনন্দ একরূপ ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু আমরা দেখলাম 'পরাহন্তা'র যত অহং একীভূত হয়ে থাকে, সেখানে সঙ্কোচের অভিশাপ নেই। সেই তন্ময় ব্রহ্মভাবনায় শক্তি আনন্দ কিছুরই ন্যূনতা নেই। তার ফলে সাধকদের প্রথম থেকেই ওই নির্বাধ অসঙ্কুচিত অবস্থার দিকে একটা ঝোঁক আসে যাতে একত্ব ও সমত্ব থাকে। অহন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সাধনা করতে গেলে মুক্তিরও ঐরকম অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এক হল ব্যক্তিত্বের নির্বাণ, সব কিছু খেই হারিয়ে গেল, এক অপরিসীম শূন্যতার অবাধ শান্তি। সদ্‌ব্রহ্মের উপলব্ধিতে সেই শান্তি লাভ করে জগদতীত অবস্থার সমাধিতে মগ্ন হয়ে তাতেই থেকে যেতে পারি। আবার ব্রহ্মের অহং, যেখানে পরিপূর্ণ 'অহম্'এর বোধ সেই বোধে জেগে থাকতে পারি, রামকৃষ্ণদেব যাকে বলতেন বটগাছের মত হওয়া এ সেইরকম, অহংএর সত্যকার রূপ বিরাট বিশ্বাত্মক অহম্—পূর্ণাহন্তা। সেখানে জাগ্রত জীবনের সবার সঙ্গে ঘর বেঁধে সেখানে থাকা যায়, সবাইকে নিয়ে এক হওয়া যায়।

কঠোপনিষদের আদেশ—"যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি...", বাককে তলিয়ে দাও মনের মধ্যে, চিন্তা কর, বেশী কথা বল না। বনস্পতির বীজের মত মনকে নিয়ে যাও আরও গভীরে, জ্ঞানাত্মার স্থিতির ভূমি লাভ কর। সেখানেও থেমে যেও না, জ্ঞানাত্মাকে গুটিয়ে আন মহানাত্মায়। যা গুটিয়ে আসে স্বভাবের নিয়মে তাই ছড়িয়ে পড়ে। (নি-যম্ ধাতু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এটা উভয়ার্থক—গুটিয়ে আনা, ছড়িয়ে দেওয়া) জ্ঞানাত্মায় "পাকা আমিকে" পেয়ে "সদাত্মা সর্বভূতাত্মা"র ব্যাপ্ত ও বৃহৎ হও "মহানাত্মা"র। এই যে মহিমা মহানাত্মা, তাঁকে ঘরে ঘিরে আছেন শান্ত আত্মা—প্রপঞ্চোপশম শান্ত শিব, লোকোত্তর। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে অহম্-এর পরিপূর্ণতাকে ধরতে বলেছেন ঐ মহানাত্মায়। আধুনিক দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন দর্শনকে সমন্বিত করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কোনও কিছুর প্রত্যাখ্যান নেই, সমগ্র জীবন নিয়ে যোগের অনুকূলে এই ভাবনা। মহানাত্মারই বহুরূপ যেন সম্মুখে, ছোট আমিটা গলে যায়, পাকা আমি বৃহৎ হয় বড় হয়, অহম্এর বিশুদ্ধ পূর্ণতা সেখানেই। দুদিক দিয়েই এই প্রতিষ্ঠাকে বুঝতে হবে, অহংকে শুদ্ধ করতে করতে অক্ষরে স্থিতি, আবার সব ছাপিয়ে লোকাতীত শান্ত, দুই ভাবেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা থেকে কর্ম করতে হবে, এই ছিল গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সাদ্ধ্যভাষিক আদেশ। তখনই বলা চলে হত্যা করেও কোনও পাপের বোধ সেখানে স্পর্শ করতে পারবে না, ভ্রান্তি দুর্দশা আপদ বিপদের ভিতর দিয়ে চলে গেলেও কোনও ক্ষতি হবে না।

দেহ প্রাণ মন ছাড়িয়ে অহং, সেই অহন্তা বিমুক্তির জন্য মূলাহন্তা (substratum ego)-কে ধরা চাই। সাংখ্যে এর নাম অস্মিতা। এ কিন্তু পুরুষের নয়, প্রকৃতিরই অহং—অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ। বোধের দিকে অবিদ্যার ঐ অহং থেকেই

যায়, ধ্যানের ভিতর দিয়ে তাকে ধরতে হয় চিনতে হয় তার স্বরূপ জানতে হয়, সমাপত্তিতে তাকে পেরিয়ে যেতে হবে।

ধ্যানের প্রশান্তবাহিতায় চিত্তের বীচিবিক্ষোভ চলে। তারপর বিক্ষোভ থামলে ধ্যেয় বিষয়ের অখণ্ড বোধ প্রতিভাত হয় কিন্তু তখনও সেটা বাহিরে। আরও গভীরে গেলে বস্তুপ্রাপ্তির আনন্দে বিষয়ের নানামুখী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে অন্তরে পাওয়ার অবস্থায় তৃপ্তি ও শান্তি মেলে ; এই হল আনন্দসমাপত্তি। এই অবস্থা পেরিয়ে অস্মিতা ; অস্মিতায় শান্তি লাভ হয়, কিন্তু তখনও আত্মদর্শন হয়নি। সাধক শুদ্ধ অহংএর বীর্যও লাভ করতে পারে, কিন্তু তাকেই আত্মদর্শন মনে করলে সেখানেই ধ্বংসের বীজ থেকে যায়, সে ভুল ধরার ক্ষমতাও থাকে না। বিদ্যার অহঙ্কার গ্রাস করলে তাকে ধরা বড় কঠিন। এখানে শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণের দর্শন বোঝা যায়। অস্মিতা তখন গলে যেতে থাকে আর পরাহন্তা স্বয়ং তাকে এসে গ্রাস করতে থাকেন। যোগের ভাষায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেতে হয়, অস্মিতায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা থাকে। অব্যক্ত অজ্ঞেয়কে অনন্ত মনে হতে পারে কিন্তু তা ও নয়, এই রকম করে প্রকৃতিকে একেবারে পেরিয়ে গিয়ে আত্মাকে খাঁটি করে পেতে হয়। অস্মিতাই শুদ্ধ সত্ত্ব, সেখানে পরাহন্তায় I এসে তাকে গ্রাস করলে তখনই পূর্ণাহন্তার প্রকাশ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ; তাঁকে ধরে থাকেন পরাহন্তা Supreme I, পুরুষোত্তমের অহম্, সোঽহম্।

নেতির চরমে সবই শূন্য, কৃষ্ণ কালো কালীও কালো ; কিন্তু সেখান থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হয়। অরূপ অপরূপ বিশ্বরূপ সবই ওই অনালোকের আলোয় উদ্ভাসিত। রূপো-ল্লাস নিয়ে মতভেদ বাড়াবাড়ি করাটা যেমন ঠিক নয়, তেমনি রূপ নেই প্রতিমা নেই, এ-ও ঠিক নয়। প্রেমের দশমী দশা সুফীর হাল ফানা এ সবেই Zen Budhism 'আমি'র মরণ, এগুলি সব বুদ্ধে মিলিয়ে নিতে হবে। পূর্ণযোগে সবই মিলে যাবে।

* * *

অহন্তার বিমুক্তি প্রসঙ্গে আর একটা কথা আসে। অহং যখন চলে যায় একেবারে, তখন কি হয়? অহন্তার বিলয়ে জীবভাবের প্রলয় ঘটে, মহাশূন্যের অবস্থা, জগৎ তখন মায়া। শ্রীঅরবিন্দ বলেন ব্যবহারিক জগৎ চালানোর জন্য অহং সৃষ্ট হয়েছে এবং অহং নিঃশেষে বিগলিত হলে মহাশূন্যের অবস্থা আসে এ সত্য, কিন্তু এ হল একদেশদর্শন। সাধনা চলে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে। ব্যতিরেকমুখে চলার অর্থ নেতি নেতি বলে সব কিছুর আবরণ বিক্ষেপ বাদ দিয়ে চলা। "ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব", এই মনোভাব ওই জ্ঞানের কথা, নেতি নেতি করে হৃদয় রিক্ত করা ; কিন্তু তাকে আবার পূর্ণ করাও চাই। রামকৃষ্ণদেব উপমা দিয়ে বলেছিলেন যে ছাদে উঠতে গিয়ে সিঁড়ি বাদ দিয়ে পেরিয়ে যেতেই হয়, কিন্তু শেষে ছাদে উঠে দেখা যায় ছাদও সেই চুণ সুরকি ইঁট দিয়ে তৈরী সিঁড়ির মতই। শূন্যের বুকে পূর্ণতা, রিক্ততাকে পূর্ণ করা চাই। নেতি বলে সব ছাপিয়ে মহাশূন্যে নিমজ্জিত হতে হয়, সেও যেমন সত্য, তেমনই সত্য সেই

মহাশূন্যের পরিপূর্ণতা—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জ্ঞান ভক্তি কর্ম সব দিক দিয়ে অহংকে নিঃশেষে ত্যাগ করা চাই। কেননা অহং ছিন্ন খণ্ডিত অল্প সে চেয়েছে ভূমা হতে ব্রহ্ম হতে।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ আমাদের হৃদয়কমলের মধ্যবর্তী আপনঘরটির কথা শুনিয়েছেন, এ হল জ্ঞানকে রসে অভিষিক্ত করে নেওয়া। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য অনন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু ঐ অনন্তের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষানুভূত হওয়া চাই, অনন্ত চারিদিক হতে আমার সত্তাকে আবিষ্ট করে নেবে, সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে যেন একটি মীন হয়ে ডুবে যাব বিচরণ করব।...

একটি একটি করে বাঁধন খসে থাকে। 'আমি' যেন কোথাও না থাকে, অনন্ত এসে সেই শূন্যতা পূরণ করে। এ শূন্যতা কিন্তু ভাবনামাত্র নয়, ধ্যানে পাওয়া নয়, স্বভাবে হওয়া চাই, ভাবকে করে তুলতে হয় স্বভাব। সত্তার মর্মমূলে তুমি, 'আমি' তো নেই। এ পর্যন্ত আমার প্রচেষ্টা তারপর হৃদয়কমলে তাঁকেই যখন অধিষ্ঠিত দেখব, তখন দেখব আমার সব প্রচেষ্টাই তাঁর। ওপর হতে নামছে আলোর প্রবাহ, তাতে ভেসে চলেছি..."অভিতো ব্রহ্ম নির্বাণম্"। তারও পরে দেখা যাবে, শুধু আলোর স্রোতে ভেসে চলাই নয়, একটা নিম্ন স্রোতধারার আকর্ষণও (under current) টেনে নিয়ে চলেছে। এই তো ভক্তের কৃষ্ণতত্ত্ব। খৃষ্টের অনুসরণকারী সাধকেরা বলেন conversion-এর কথা ; যেমন প্রচণ্ড বাধার একটা পাথরের আড়াল রয়েছে, অতি কষ্টে বহু শ্রম করে তাকে খাড়া করছি ; কিন্তু এমন সময় আসে যখন ঐ পাথরটা একটু ছোঁয়া লাগলেই উল্টোদিকে পড়ে যাবে, আর তখন পথ হবে সোজা অবাধ। বৌদ্ধেরা বলেন "তটস্থ ছিলাম...হলাম স্রোতাপন্ন," তখন গোত্রভূ, বুদ্ধের শূন্যতা টেনে নিয়ে যায়। আমার বুদ্ধ গোত্র, আমি যে তার আপনজন। তখন সব যে সুখ তাতো নয়, গভীর দুঃখও তিনি দেন, তাও যদি গেল, বিশ্বের অতল দুঃখ ঘিরে ধরল। দুঃখ যন্ত্রণা জ্বালার মধ্য দিয়েই সেই সর্বনাশা টান। ঋগ্বেদের ঋষি এরকম এক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছেন...বলছেন "আমি তো বলিনি যে বইবনা, জোয়ালে জুতে দেওয়া অশ্বের মত তুমিই টেনে নিয়ে চলেছ। তুমি আগে চলেছ, টেনে নিয়ে যাও। ছেড়ে যাবার উপায় কই"? ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত" তাঁর ইচ্ছার টানে যেখানে যেদিকে যেভাবেই হক চলেছি কর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে। এমনি করে হৃদয়ের গভীরে তাকে পাই আবার হারাই। ক্রমে ক্রমে ভাব স্থির হয়ে আসে।

গীতা বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধির কথা, তিনি শুধু বসে থাকেন না, চলেন বলেন। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এ যেন এক সমস্যা। "বেশী কেটে জলে যাওয়া", তাও আছে। মহা-শূন্যে প্রতিষ্ঠা চাই, তা মিথ্যা নয়। নির্বাণ চাই-ই। সেই ভূমি হতেই তো পূর্ণ যোগ শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ বারবার এ কথা বলে তা ধরিয়ে দিয়েছেন। ওই নির্বাণের পর আবার এখানে এসে চলা বলা সবই হবে, তাকে বলতে পারি জাগ্রত সমাধির অবস্থা। তাকেই বলা যাবে পূর্ণসিদ্ধি পূর্ণযোগ।

তার জন্য প্রথমেই চাই শান্ত ভাব, শূন্যতা নীরবতা (silence) প্রতিষ্ঠিত

হবে মনে প্রাণে দেহে। সব কলরব থামিয়ে নিঝুম হয়ে যাওয়া। সেই যে "ডিমে তা দেওয়ার মত ফ্যালফেলে চাউনি"। তখন হাতের কাজ খসে যায়, সব ভুল হয়ে যায়। এ অবস্থা আছে, বাদ দেবার উপায় নেই। এ সব ভাব আসে সংস্কার উৎপন্ন করে, আবার চলেও যায়, আধার ক্রমে অভ্যস্থ হতে থাকে। ভিতরটা একেবারেই শূন্য, নতুন দেহ-চেতনা প্রাণচেতনায় জ্যোতি ও রসের পরশ, অঙ্গসমূহ একেবারে স্থির, উর্ধ্বচেতনায় ভূমি লাভ হয়। শেষে সর্বগ্রাসী শূন্যতাও এত গভীর যে তার ভেতরে যেন আর কিছুই নাই (Absolute Silence)। সেই নৈঃশব্দ্য নৈস্পন্দ্য জমাট বেঁধে গভীর স্থির হয়ে গেছে একেবারে নিঃশেষে। আর তখনই তাঁর বাণী তাঁর আলোয় আধার নতুন করে জাগরণ হয়। তিনি যেভাবে জগৎ দেখছেন, সেই দৃষ্টি খুলে যায়, আধার আধার থেকে উৎসারিত হবে তাঁরই আলো। 'আমি' নেই অথচ ব্যক্তিত্ব আছে, মহাশূন্যে বিরাট চৈতন্য নিয়ে সেই ব্যক্তি, নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব (Impersonal personality)। শ্রীঅরবিন্দ এই অবস্থার কথাই বলেন, a ego নয় individualisation. এই হল নিত্যযুক্ত "পাকা আমি"র স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সম্পূর্ণ নীরবতার হতে বাণীর উৎসারণ আমরা দেখেছি।

এ অবস্থায় চৈত্যপুরুষের রসাস্বাদন আছে, যাকে বলে সম্ভোগদশা ; জ্ঞানে হয় প্রেমেও হয়..."স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং..."। দেহ হয়ে যায় একটি স্তবের শিখা, তোমারই নির্দেশে দেবহিত আত্মকে সম্ভোগ করে, শ্রবণ দর্শন সবই দিব্য, তাই জ্ঞান প্রেম কর্ম সব একাধারে সমন্বিত। তাঁর আদেশ এসেই সব করিয়ে নেয়, নিজের বলে আলাদা কিছু আর থাকে না। মহাশূন্যতা নির্বাণ আর তারই অতলে পরিপূর্ণ প্রেম—সর্বাত্মভাব, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা। আর সেই হৃদয় কমলের ঘরে তাঁর সঙ্গে রসনিবিড় মিলনে তাদাত্ম্য। এইরকম হলে ব্রহ্ম আত্মা এক হয়ে যায়।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

COMPLETE WORKS
OF
SRI AUROBINDO

Centenary Volumes

De Luxe *Rs. 1000.00*
Popular *Rs. 750.00*

SRI AUROBINDO ASHRAM PRESS

PHONE : 47-2869

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant ? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity ? Is the site selected ideal for the plant ? Is the production cost realistic ? How and where to obtain the best possible plant and equipment ? All this and many other project problems may confront you Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers ? Indian Consultants have no interest other than yours. It is they who know the Indian conditions best.

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS □ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION □ SITE SELECTION AND SURVEY □ BASIC AND PROCESS ENGINEERING □ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL □ DETAIL DESIGN ENGINEERING □ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT □ COMPLETE PLANT ERECTION □ START-UP AND COMMISSIONING □ INITIAL OPERATION □ TRAINING OF PERSONNEL □ POST-OPERATION CONSULTATION.

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16.

আপনার সঞ্চয়

—তা যত অল্প
বা বেশি হোক না কেন
তার থেকে
আপনার আয়

আরও বাড়িয়ে তুলুন

কয়েকটি পরিকল্পনা

৭½% সুদ পেতে হ'লে ৫ বছরের অধিক মেয়াদী ফিক্সড্ ডিপোজিটে লগ্নী করুন।

প্রতি মাসে ১০৲ সঞ্চয় ক'রে ৭ বছর পর ১০৯৫৲ রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট খুলে পেতে পারেন।

১০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পর ৪২৫৲ টাকা পাবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-৬
টেলিফোন : ২৩-১৭৮৪ (৩ লাইন)

Progressive/UIB-1

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

CALCUTTA UNIVERSITY

বর্তিকা

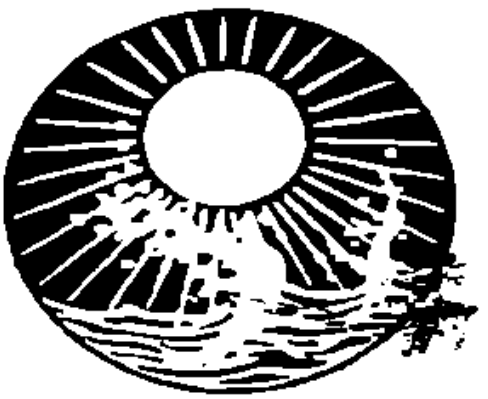

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাবিত্রী	...	...	৫
ঋষি যন্ত্রির অগ্নিযজ্ঞ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৮
চন্দ্রাভিযান	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১৩
শ্রীঅরবিন্দের চিত্রাকণা ও চুম্বকবাণী	...	...	১৭
বায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	...	২০
পথের কথা	শ্রীমা	...	৩৩
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	...	৩৮

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	,,	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	,,	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	,,	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nollni Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৩

মানুষী চেতনার ঊর্দ্ধে
সকল কথার ও-পারে
তুমি হে পরা চেতনা
অমিতীর সৎ-বস্তু
ভাগবত সত্য।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—দশম সর্গ

ক্ষুদ্রতর মানসের রাজ্য ও দেবতাসকল

(২)

পাংশুল রাজ্য যত, আলোর স্ফুরণে চকিত
শিখর তাদের শোভে জোনাকির আলোকে যেন ;
সেখানে সহজ আঁধারের সঙ্গে লীলাবিলাস করে এসে উষার অরুণ,
বাড়িয়ে তোলে ক্রমে দিনের আয়ু, ঘুচায়ে দেয় রাত্রির মেয়াদ ;
বিপুল রশ্মিস্নাত সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে
এল সে প্রথম আলোকের রাজ্যে অর্দ্ধোদিত সূর্য্যের সদ্য অধিকারে ;
তারই কিরণমালা হ'তে আমাদের পূর্ণ মানস-মণ্ডল জন্মগ্রহণ করেছে।
বিশ্বপুরুষের অনুশাসনে,
জ্ঞানহারা গভীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য
পরম নিপুণ এক আদি বুদ্ধিশক্তি
চিন্তার এবং সংশয়ের সমান দুই ডানার উপর কোনক্রমে ভর করে
নিরন্তর কর্ম্ম করে সে চলেছে সত্তার গুপ্ত দুই প্রান্তের মাঝখানে ;
জীবনের গতিকর্ম্মে নিশ্বাস চলে এক প্রচ্ছন্ন রহস্যের
প্রকৃতির অলৌকিক ঘটনাবলী নেপথ্যে পোষণ করে চলে যে বস্তু
তাই-ই গড়ে তুলেছে জড়ের পঙ্ক হতে প্রাণধারার অত্যাশ্চর্য্য রূপ যত ;
বিশ্ববস্তুর আকৃতি যত তারই হাতে কেটে তোলা,
মনের তাঁবু খাটিয়েছে সে অজ্ঞানময় অস্ফুট বিশাল প্রসারে,
পরম যাদুকর সে বিবিধ পরিমাপে, বিচিত্র উপায়ে
আনন্ত্যকে রচনা করেছে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত আকারের আশ্রয়ে,
আর ভ্রাম্যমাণ দ্রষ্টার এই যে চিন্তাবৃত্তি
তার জন্য আসন করে দিয়েছে নিশ্চেতনার রঙ্গমঞ্চে,
পৃথিবীর পরে এই পরাবুদ্ধির ইচ্ছাক্রমে নিরাকার বলধারা
জড়ের আচ্ছাদনে ঢেকেছে আপনাকে।
জড়বিন্দু আর আলোবিন্দুর আশ্রয়ে মূর্ত্তিকৃৎ দিব্যচক্ষু
সূক্ষ্মকে পরিবর্ত্তিত করেছে স্থূল জগৎ রূপে :
অদৃশ্য দেখা দিল দৃষ্ট আকার নিয়ে,
অস্পৃশ্য প্রকট হ'ল পিণ্ডাকারে,

ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের কুহক-যুক্ত হ'ল শিল্পীমানস-ধারণার সঙ্গে,
উভয়ে দিল তারা প্রতি বিষয়ের অর্থবহ নাম এক।
ভাবনা লুকায়ে রয় দেহগত কারুকলার মধ্যে।
আর অদ্ভুত পরমাণু-নিয়মে এক রহস্যবলে
সৃষ্ট হ'ল আকৃতি এক যার মধ্যে ইন্দ্রিয়েরা ভরে দেয়
তাদের প্রতীক আলেখ্য এই বিশ্বের।
আরও অলৌকিক কৃতি রয়েছে এক :
অন্তর্ধাবী জ্যোতি বেঁধে দিল দেহের শক্তিকে,
তরুলতার স্বপ্ন আর সৃষ্টিকে,
প্রাণীর জীবন্ত ইন্দ্রিয়কে আর মানুষের অন্তরে চিন্তাকে,
সনূর্দ্ধের এক কিরণলেখার দীপ্তির সঙ্গে :
তারই চাতুর্য্য সমর্থন করে জড়ের যে চিন্তার অধিকার,
কেটে ধরে অন্তঃসংজ্ঞ পথ সব স্থূল দেহগত মনের জন্য,
উপায় এক আবিষ্কার করে অজ্ঞান যাতে পায় জ্ঞান।
বাক্যের যত ক্ষুদ্র চতুষ্ক আর ঘনাকৃতি
তাদেরই সে ধরে দিয়েছে বাস্তব সত্যের স্থানে ক'রে তার মূর্ত প্রতিনিধি—
সূত্রাকার জপবর্ণমালা যেন এক বিশুষ্ক কঙ্কাল :
তবুও সে দৃষ্টিহীন শক্তিকে সাহায্য করে আপন কর্ম্মের অর্থগ্রহণে
গুহাহিত চেতনা এক জাগে অন্তরে তার,
স্বপ্ন সে দেখে এখন, মানুষ হয়েছে সে, জাগ্রত সে।
তবুও সবই রয়েছে সেই চলমান অজ্ঞান,
জ্ঞান এখনও আসেনি, দৃষ্টিমুষ্টিতে ধরেনি
এই বিপুল উদ্ভাবনাকে বিশ্বরূপে দেখি যারে ;
ন্যায়শাস্ত্রের কঠোর যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ এক,
তার অনম্য বিধি যত চাপিয়ে দিয়েছে অন্তরাত্মার উপর :
পার্শ্বচর সে উদ্ভাবক বুদ্ধির,
সত্যকে কেটে ধরে সহজে গ্রহণযোগ্য খণ্ডে খণ্ডে,
প্রত্যেকে লাভ করে যাতে চিন্তা-খাদ্যের তার আপন যথাযথ অংশ ;
পুনরায় আপন চাতুর্য্যবলে সত্যের নিহত দেহকে দেয় নবরূপ,
যন্ত্রমূর্ত্তি এক—নির্ভুল কর্ম্মোপযোগী মিথ্যাময়—
সরিয়ে দেয় চিন্ময়ের সূক্ষ্ম বিশ্বদৃষ্টি, নিজে আসন গ্রহণ করে তার :
পরিমার্জিত যন্ত্র এক দেবতার কাজ করে :
সত্যের দেহ কেহ দেখেনি, অন্তরাত্মা তার মৃত যেন ;
কারও নাই অন্তরের চক্ষু অখণ্ড সত্যকে দেখে যে,
চাকচিক্যময় প্রতিনিধিকে তুলে ধরা হয় মহিমান্বিত করে।

তারপর নিভৃত শিখর হ'তে ধেয়ে নেমে আসে তরঙ্গ এক,
জেগে ওঠে বিদ্রোহী আলোকের সমুজ্জ্বল এক বিশৃঙ্খলা,
ঊর্দ্ধে সে দৃষ্টিপাত করে দেখে প্রদীপ্ত শিখর সব,
অন্তরে দৃষ্টিপাত করে জাগাল সেখানে সুপ্ত দেবতাকে ;
কল্পনা ডেকে আনে তার দীপ্তবাহিনীকে,
চলে যারা দুঃসাহসে অনাবিষ্কৃত রাজ্যে :
সেখানে লুকিয়ে রয় যত বিস্ময়, আজো জানে নাই কেউ তাদের :
কল্পনাই তুলে ধরে তার অলৌকিক মোহন শীর্ষ,
গুপ্ত মন্ত্রণা করে সে অনুপ্রেরণার স্বপ্নদল সনে,
চিন্তার আকাশ নীহারিকার বিলসনে ভরে দিতে ;
রহস্যবেদীর ঘেরপ্রান্তে জ্বলে ভ্রান্তি এক।
প্রজ্ঞার নিভৃত সূর্যের ধাত্রী হ'ল তন্দ্রিমা,
জ্ঞানকে স্তন্য পান করায় কল্পকথা তার আলোময় দুগ্ধ দিয়ে ;
শিশু তবে ছায়াচ্ছন্ন স্তন হতে উত্তীর্ণ হ'ল গিয়ে জ্যোতির্ময় জনে।
মহাশক্তির এই হ'ল কর্মধারা ক্রমবর্দ্ধমান জগতের 'পরে ;
তার নিপুণ কৌশল সরিয়ে রাখে দৃষ্টি হতে পূর্ণমণ্ডলের দীপ্ত দহন,
অন্তরাত্মার শৈশব লালন-পালন করে, খাদ্যরূপে দেয় তারে রচিত কাহিনী,
মধুময় অমৃতরস যেন পোষণ করে তার অপরিণত দেহকে
—অধিকতর পুষ্টিকর সে-রস বিচারের কর্ষণজাত শুষ্ক তৃণ-শস্প হতে ;
তার অগণিত তথ্যাবলীর রাশিকৃত খাদ্যভার,
প্রাকৃতজনের ভোজ্য, যাকে ধরে আজ আমরা রয়েছি বেঁচেবর্ত্তে ;
নেমে আসে এইভাবে প্রবাহের মত প্রথম আলোকের রাজ্য হতে
সূক্ষ্মের চিন্তারাজি স্থূল জড়ের জগতে,
স্বর্ণশৃঙ্গ যূথরাজি তার দল বেঁধে প্রবেশ করে গিয়ে পৃথিবীর হৃদয়-গহ্বরে,
প্রভাত-কিরণ তার আলোকিত করে ধরে আমাদের গোধূলির অর্দ্ধদৃষ্টি,
তরুণ রূপায়ণ তার যত অনুপ্রাণিত করে পৃথিবীর মনোবৃত্তিকে ;
তাই সে প্রযত্ন করে চলে, স্বপ্ন দেখে, করে নবসৃষ্টি,
অনুভব করে সুন্দরের স্পর্শ, জ্ঞানলাভ করে জগতের আর পরম আত্মার ;
সোনার শিশু এখন করে চিন্তা আর চোখ তার দেখে।

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

৫ম মণ্ডল—১০ম সূক্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১। অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যাদ্রিগো।
প্র নো রায়া পরীণসা রৎসি বাজায় পন্থাম্ ॥১॥

অগ্নে—হে অগ্নি
ওজিষ্ঠম্—পরম ওজস্বী, বলবত্তম (সায়ণ)
আ ভর—নিয়ে এস
দ্যুম্নম্—দ্যুতি
অস্মভ্যম্—আমাদের কাছে
অদ্রিগো—অপ্রতিহত-গতি (সায়ণ), অবারিত রশ্মি (সায়ণ), সান্ত সত্তার জ্যোতি
প্র—সম্মুখে
নঃ—আমাদের
রায়া—(তোমার) সম্পদের বা ঐশ্বর্য্যের বা প্রাচুর্য্যের (opulence) সহায়ে
পরীণসা—সর্ব্বব্যাপক
রৎসি—কেটে ধর
বাজায়—পূর্ণতার জন্য, পরিপূর্ণতা (plenitude) অভিমুখে
পন্থাম্—পথ

হে অগ্নি, আমাদের সান্ত সত্তার জ্যোতি তুমি, আমাদের কাছে নিয়ে এস পরম ওজস্বী দ্যুতি। তোমার সর্ব্বব্যাপী প্রাচুর্য্যের সহায়ে পরিপূর্ণতার অভিমুখে পথ কেটে ধর আমাদের জন্য ॥১ ॥

২। ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা।
ত্বে অসুর্যমাক্রহং ত্বাণা মিত্রো ন যজ্ঞিয়ঃ ॥২॥

ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের কাছে
অগ্নে—হে অগ্নি
অদ্ভুত—হে অদ্ভুত, হে আশ্চর্য্যময়
ক্রত্বা—ইচ্ছাশক্তি নিয়ে

দক্ষস্য—সত্য-বিবেকের
মংহনা—মহত্ত্ব দিয়ে, মহত্ত্ব সহায়ে, বৃদ্ধির সহায়ে
যে—তোমার মধ্যে, তোমাকে আশ্রয় করে
অসুর্যম্—পরম বীর্য্য
আ অরুহৎ—আরোহণ করেছে
ক্রাণা—কর্ম্মকৃৎ
মিত্রঃ—মিত্র
ন—মত
যজ্ঞিয়ঃ—যজ্ঞসাধক

অদ্ভুত তুমি, হে অগ্নি, তোমার ইচ্ছাশক্তির বলে আমাদের মধ্যে তুমি হয়ে উঠেছ মহান বিবেকশক্তি।

যজ্ঞক্রিয়ায় সর্ব্বদম্মিলনী মিত্রদেব তোমার মধ্যে কর্ম্মসাধন করে চলেছেন, উত্তীর্ণ হয়েছেন গিয়ে ভাগবত ঈশ্বরত্বে ॥২॥

৩। ত্বং নো অগ্ন এষাং গয়ং পুষ্টিং চ বর্ধয়।
যে স্তোমেভিঃ প্র সূরয়ো নরো মঘান্যানশুঃ ॥৩॥

ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
এষাম্—এদের
গয়ম্—অর্জন, ধন (সায়ণ), acquisition
পুষ্টিম্—পুষ্টি
চ—এবং
বর্ধয়—বৃদ্ধি কর
যে—যারা
স্তোমেভিঃ—তাদের স্তুতির সহায়ে
প্র+আনশুঃ—প্রাপ্ত হয়েছিল, লাভ করেছিল
সূরয়ঃ—দিব্যদৃষ্টিময়, জ্যোতির্ম্ময়
নরঃ—মানুষ
মঘানি—পূর্ণতা (plenitude)

হে অগ্নি, আমাদের জন্য তাদের অর্জন, তাদের পোষণ বৃদ্ধি কর যারা দৃষ্টিমান মানুষ, যারা তাদের স্তুতিমন্ত্রের সহায়ে পূর্ণতা সব লাভ করেছে ॥৩॥

৪। যে অগ্নে চন্দ্র তে গিরঃ শুম্ভন্ত্যপ্নরাধসঃ।
শুম্ভেভিঃ শুম্ভিণো নরো দিবশ্চিদোষায়ং বৃহৎ সুকীর্তির্বোধতি ত্বনা ॥৪॥

যে—যারা
অগ্নে—হে অগ্নি
চন্দ্র—আহ্লাদকর
তে—তোমার উদ্দেশে
গিরঃ—স্তোত্রবাক্য
শুম্ভন্তি—শোভাময় বা মনোহর করে ধরে
অপ্ন-রাধসঃ—যারা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রাণশক্তিসিদ্ধ
শুম্ভেভিঃ—আত্মবলের সহায়ে
শুম্ভিণঃ—বলবন্ত যারা
নরঃ—বীর মানুষেরা
দিবঃ—স্বর্গলোকে
চিৎ—ফলতঃ, এমন কি
যেষাম্—যাদের
বৃহৎ—বৃহৎ স্থিতি
সু-কীর্তিঃ—পরম মহিমা
বোধতি—জাগ্রত হয়
ত্বনা—আপনা আপনি।

হে মহাবল, হে আনন্দময়, বেগবান প্রাণশক্তিদের সুখকর সমৃদ্ধি এরাই ধারণ করে, এরাই বাঙ্ময় চিন্তাকে তুলে ধরে সুখকর জ্যোতির দিকে—এরাই হ'ল বীর্য্যে পূর্ণ বীর সব, তাদেরই জন্য স্বর্গের সকল বৃহৎ—এদেরই জন্য পূর্ণ ক্রিয়াধারা আপনা আপনি জাগ্রত হয়ে ওঠে ॥৪॥

৫। তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো ভ্রাজন্তো যন্তি ধৃষ্ণুয়া।
পরিজ্মানো ন বিদ্যুতঃ স্বানো রথো ন বাজয়ুঃ ॥৫॥

তব—তোমার
ত্যে—তে—সেই
অগ্নে—হে অগ্নি
অর্চয়ঃ—শিখারাজি
ভ্রাজন্তঃ—দীপ্যমান, প্রদীপ্ত
যন্তি—চলেছে

ঘৃক্ষয়া—প্রখর
পরিজ্মান:—সর্বব্যাপক
ন—মত
বিদ্যুত:—বিদ্যুতের
স্বান:—শব্দায়মান
রথ:—রথের
ন—মত
বাজয়ু:—পূর্ণতাকামী

হে অগ্নি, তোমার সেই সব শিখা খরবেগে উদ্ভাসিত করে চলেছে চারিদিক ঘিরে বিদ্যুতের মত যেন, রথের মত গর্জন করে যেন, পরিপূর্ণতার অভিমুখে ॥৫॥

৬। নূ নো অগ্ন উতয়ে সবাধসশ্চ রাতয়ে
অস্মাকাসশ্চ সূরয়ো বিশ্বা আশাস্তরীষণি ॥৬॥

নূ—এখন
ন:—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
উতয়ে—আত্মপ্রসারের জন্য
সবাধস:—বাধাপরিবৃতদের
চ—এবং
রাতয়ে—আত্মসম্পদের জন্য
অস্মাকাস:—আমাদের
চ—এবং
সূরয়:—দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নেরা, জ্যোতির্ময়েরা
বিশ্বা:—যাবতীয়
আশা:—দিক্‌প্রান্ত
তরীষণি—উত্তরণ করে যেন

এখন তবে, হে অগ্নি, বাধায় পরিবৃত আমাদের আত্মপ্রসারের জন্য, আত্মসম্পদের জন্য এস তুমি, আর আমাদের দ্রষ্টারা যেন সকল দিগ্বলয় উত্তরণ করে চলে যাব ॥৬॥

৭। ত্বং নো অগ্নে অঙ্গিরঃ স্তুতঃ সবান আ ভর।
হোতর্বিভ্বাসহং রয়িং স্তোতৃভ্যঃ সবসে চ ন উত্তবি পৃৎসু নো বৃধে ॥৭॥

ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
অঙ্গিরঃ—হে অঙ্গিরা
স্তুতঃ—স্তুত হয়ে
সবানঃ—সুরমান হয়ে
আ ভর—এখানে নিয়ে এস
হোতঃ—হে হোতা, হে আত্মদানকর্তা
বিভ্বাসহম্—প্রভূত শক্তিশালী, সর্ব্বব্যাপী শক্তিশালী
রয়িম্—আনন্দ-সম্পদ
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
সবসে—সুরকর্ম্মের জন্য
চ—এবং
নঃ—আমাদের
উত—আরও
এধি—এস
পৃৎসু—যুদ্ধসকলে
নঃ—আমাদের
বৃধে—বৃদ্ধির জন্য

হে তপঃশক্তি, হে তপোময়! যখন তোমাকে স্থাপন করা হয়েছে এবং এই স্থাপনক্রিয়া চলেছে তখন যা কিছু তোমাকে মন্ত্রে স্থাপন করেছে তার জন্য এবং পুনরায় তোমাকে স্থাপনের জন্য, হে আহুতিদাতা, নিয়ে এস সর্ব্বব্যাপক আনন্দসম্পদ আর আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য এস আমাদের সকল সংগ্রামে ॥৭॥

চন্দ্রাভিযান

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র একটা গোটা প্রবন্ধই লিখে গিয়েছেন চাঁদের উপর—কমলাকান্তের "চন্দ্রালোকে"; এবং সে প্রসঙ্গে চন্দ্রাহত বা চন্দ্রগ্রস্তদের (moonstruck—lunatics) কথাও ফলাও করে বলেছেন, অনেকখানি সহৃদয়তা অনুকম্পা দেখিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের "In the Moonlight" কিম্বা "The Moon of the two Hemispheres" আমাদের সকলেরই পরিচিত। শ্রীঅরবিন্দ Sunlit path-এর প্রশংসা ও মর্যাদা দিয়েছেন অপরিসীম পরিমাণে; তবে সূর্যযানের সঙ্গে চন্দ্রযানও আছে, তা বিশেষ সমাদরের পথ। সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি ভারত-বিশ্রুত, তবে চন্দ্রবংশও তার খুব বেশি পিছনে নয়। ফলতঃ সূর্য্য চন্দ্রকে প্রায় সমান চোখে দেখে এসেছে মানুষ চিরদিন সকল দেশে; দুটি হ'ল দুটি পরম সত্যের পরমগতির প্রতীক বা অধিদেবতা। সূর্য্য যদি হয় জ্যোতি চন্দ্র তবে আনন্দ; সূর্য্য যদি হয় তপঃশক্তি চন্দ্র তবে প্রেম—চন্দ্রের আর এক নাম ইন্দু অর্থাৎ মধুময়ী হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীমা বলছেন চন্দ্র—চন্দ্রকলা—হয় আধ্যাত্মিক চেতনা—পূর্ণচন্দ্র আধ্যাত্মিক চেতনার পূর্ণতা।

চন্দ্রের প্রভাবে বিশেষত্ব বা অনন্যতা রয়েছে এই যে তা এনে দেয় মাদকতা, উন্মাদকতা—মনকে প্রাণকে উদাস উথাল উচ্ছল করে দেয়, নিয়ে যায় মধুর মাধুর্য্যের চরমে—honeymoon অর্থই তাই। এই Honey Moon—মধুময় চন্দ্রিমার মনোলোভা চিত্র এঁকে দিয়েছেন পাশ্চাত্য মহাকবি—

> And then the moon, like to a silver bow
> New-bent in heaven, shall behold the night
> Of our solemnities.

তিনিই সমসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন এই ত্রয়ীকে the lover, the lunatic and the poet। তাই সোমরস পানে, ঋষিরা বলে গিয়েছেন, যে ফল হয় জ্যোৎস্নাপানেও তাই হয়। সেই জন্যই বুঝি চাঁদের নাম হয়েছে সোম, সোমদেবতা। আমরা জানি চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর জলরাশি ফুলে ফেঁপে ওঠে, সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন চলিয়ে দেয়। মানুষের দেহ ত' নব্বই ভাগই হ'ল জল, পণ্ডিতেরা বলেন; তাই মানুষের দেহাধার পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নায় স্ফীত-আকৃষ্ট হবে আশ্চর্য্য কি; আর সেই তরঙ্গ প্রাণে হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবে তাও স্বাভাবিক, ফলে মনেরও বৈকল্য বা বিকৃতিও ঘটতে পারে—অন্য কথায় চাঁদের স্পর্শ হ'ল মানুষের আধারে স্বভাবাতিরিক্ত অলৌকিক স্পর্শ।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত যা বললাম তা হ'ল মানুষের সনাতন অর্থাৎ পুরাতন পরিত্যক্ত ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমরা সে সব পাল্টে উল্টে দিয়েছি। চাঁদের আর সে মায়া, সে মোহ নাই, তার রূপে আমরা আর মুগ্ধ নই। তার মুখের উপর থেকে তার জ্যোৎস্নার অবগুণ্ঠন আমরা

সরিয়ে দিয়েছি, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি ; আবিষ্কার করেছি তার স্বকীয় স্বরূপ। এখন তা হ'ল উষর ধূসর কঠোর এমন কি বিকট প্রস্তরস্তূপ—একটা মৃত অতীত যুগের কংকাল-অবশেষ। প্রাণ নাই সেখানে, প্রাণের সম্ভাবনাও নাই, জলবায়ুহীন এমন কি কোন রকম বাষ্প, বিষাক্ত বাষ্পও সে উদ্গীরণ করে না।

পরীক্ষা করবার জন্য সশরীরে আমরা উঠে গিয়েছি সেখানে ; পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়ে এমন কি একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে উল্টে-পাল্টে পরখ করেছি, এখন আমরা নি:-সন্দেহ যে পৃথিবীর বালুর অপেক্ষাও নির্জীব, অধিকতর জড় সে। বালুর থেকে অবশেষে জলকণা বা জলীয় বাষ্প নিষ্কাষিত করা যায় কিন্তু চন্দ্রকণায় নৈব নৈব। সুতরাং চাঁদের আলোর মধ্যে রোমান্টিক ভাব বা অনুভবের কোন ভিত্তি নাই। এ শুধু মানুষের নিছক মনের ভ্রান্তি, আকাশ-কুসুম বা শশবিষাণ। আজ আমরা জানতে পেরেছি চাঁদ হ'ল সৃষ্টির আদিতে ছিল যে একান্ত জড়বস্তু, যে ঘোর তমিস্রা ঘিরে ছিল সমস্ত সৃষ্টিকে সেই আদি তামসিকতার খণ্ড। সর্বাধুনিক বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত এই সত্য প্রমাণ করেছে—অকাট্য প্রমাণ, হাতে কলমে, সরেজমিনে।

তাই কি ? আমরা দেখি, বরাবরই দেখে এসেছি, পরম স্থির সিদ্ধান্তের পরেও কথা ওঠে প্রশ্ন ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, কিন্তু অপরূপ ভঙ্গিতে, অদ্ভুত উপায়ে ; কাহিনীটি বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং রোমান্টিক।

আকাশচারীরা যখন চাঁদ থেকে নেমে আসেন চাঁদের খণ্ড কিছু নিয়ে পরীক্ষার জন্য তখন বৈজ্ঞানিকেরা, পদার্থবিদ্ যারা যেমন একদিকে উপস্থিত থাকেন এই চন্দ্রখণ্ডগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য, তেমনি কিছু ডাক্তারও উপস্থিত থাকেন দেখবার জন্য আকাশ-চারীদের শারীরিক যন্ত্রপাতি সব অক্ষত আছে কিনা বা সে সকলের গতি-ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম ঘটেছে কিনা। কার্যতঃ প্রথমটা দেখা গেল খুব বেশি কিছু ইতর-বিশেষ হয় নি, দেহের মধ্যে এই মহাকাশ-ভ্রমণের ফলে। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের আবেষ্টনের মধ্যে থেকেও শরীর যাতে বিকল না হয় সে জন্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল, ব্যবস্থা বেশ পাকাপোক্ত রকমেই হয়েছিল প্রমাণে দেখা গেল। এই হ'ল বলেছি গোড়াকার পর্যবেক্ষণের পরীক্ষণের ফল। কিন্তু ক্রমে একটা "কিন্তু" এসে দেখা দিল। আকাশচারীদের শরীর বিকল হয় নাই বটে কিন্তু মনটায় তাদের কি রকম যেন নড়চড় হয়ে গিয়েছে, চিড় খেয়ে গিয়েছে। ঠিক আগের মত তারা সাধারণ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে না ; তাদের চিন্তার ধারা, তাদের সাধারণ জীবনের ধারাও কেমন যেন অন্য রকম ছন্দ এবং সুর গ্রহণ করতে সুরু করেছে। তাই পেছাপেছি যখন আকাশচারীদের ফিরবার পরে পরীক্ষা ব্যাপারে সাধারণ ডাক্তারদের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তারকেও ডাকা হ'ল যাদের নাম সাইকিয়াট্রিস্ট ; এদের কাজ মনের রোগ বা বৈকল্য নিরূপণ করা। দেখা গেল সত্যসত্যই এই সব আকাশচারীদের—সকলের না হোক অনেকেরই এবং সাধারণভাবে, মনের ধারায় কি একটা ফাটল দেখা গিয়েছে, তারা হয়েছে একটু ছিট্‌গ্রস্ত। প্রশ্নের উত্তর তারা ঠিক সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে দেয় না। একটা ভিন্ন সুর ও ছন্দ ফুটে উঠতে চায়, সাধারণ চেতনার ধারায় কি একটা ছন্দপাত হয়ে গিয়েছে।

আকাশচারীরা নিজেরাই তাদের এই আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। মহাকাশে উঠেই তাঁদের প্রথম লক্ষ্যের বিষয় হয়েছে পৃথিবী কত ক্ষুদ্র—এই যে ধরাকে সরা আমরা মনে করি তা সরার অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর, তা একটা বালুকণা বা নগণ্য বিন্দুমাত্র। চন্দ্র থেকে দেখা যায় কি একটা অসীম অনন্ত স্তব্ধ প্রসার, একটা নিরবচ্ছিন্ন অপার অন্ধকার তার মাঝে কোথাও জ্বলছে টিপ টিপ করে এক বিন্দু, ঐ হ'ল তাদের পৃথিবী, ঐ বিন্দুরই অঙ্কে আবার মানুষ তার ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কি গর্বিত স্ফীত। এই অভিজ্ঞতা তাদের চেতনায় এনে দিয়েছে বিষম ধাক্কা। অসীমের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ, শারীরিক স্পর্শ তাদের শরীরকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, মন তাদের হারিয়ে ফেলেছে নিত্যনৈমিত্তিক মাপজোখ, চেতনায় নাই যেন আর দিক্-দর্শন-যন্ত্রটি। "ক্ষুধিত পাষাণ"-এর প্রেতায়াটির মত তাদের অভিভূত করেছে একটা যেন মায়িক চেতনা যাতে বলছে "দম্ ঘুটা"।

আকাশে উঠলে, হয় ত' পৃথিবীর আকর্ষণ পার হয়ে গেলেই, আকাশচারীদের মধ্যে অনেকের জেগেছে একটা অতিলৌকিক পারলৌকিক অনুভব বা জিজ্ঞাসা। স্থূলভাবে দেখা গিয়েছে তারা হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম-বাদী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী। একবার ত' খ্রীষ্টমাসে তারা সরবে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করেছেন শুধু আমোদ হিসাবে নয়, বিলাসছলে নয়, সত্য-সত্যই একটা শ্রদ্ধা এবং ভক্তের আস্থা নিয়ে, যদিও তাঁরা সকলেই ছিলেন পাকা বৈজ্ঞানিক। আর বাস্তবিকই গভর্ণমেন্ট স্বয়ং দেখে শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন; এমন কি হুকুমও পাশ করা হয়েছিল যে সরকারী কর্ম্মচারীদের সরকারী কর্ম্মের মধ্যে ও রকম ধর্ম্মধ্বজী হওয়া চলবে না, সরকার হ'ল সেকুলার (secular), ধর্ম্মনিরপেক্ষ ইহ-সর্ব্বস্ব ব্যাপার—আমাদের দেশেও যেমন বলা হয়। কিন্তু হলে কি হ'বে, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, এ ক্ষেত্রে কথাটি উল্টে আমরা বলতে পারি ধর্ম্ম না শুনে চোরার কাহিনী।

দেখা গিয়েছে আকাশচারীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁরা আর তেমন সংসারী হ'তে পারেন নি। কয়েকজন একেবারেই খ্রীষ্টীয় পাদ্রী বনে গিয়েছেন বা ওই ধরনের কাজে বা জীবনে ব্যাপৃত হয়েছেন। অনেকে আবার নিজের পরিবার সম্বন্ধে আত্মীয়-বন্ধুজন সম্পর্কে অন্যমনস্ক, বীতরাগ, উদাসীন হয়ে গিয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু। তাই মনে হয় পৃথিবীর আকর্ষণ-সীমানা যে মুহূর্ত্তে তাঁদের শরীর অতিক্রম করে গিয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে তাদের মন-প্রাণ তাদের চেতনাও যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর বন্ধন থেকে।

চাঁদ বুঝি এই রকমেই প্রতিশোধ নিয়েছে। মানুষ তার মানুষী গর্ব্বে ঔদ্ধত্যে বলে উঠেছিল, "চাঁদ! ও ত' জড় মাটি, মাটির চেয়েও অধম। চাঁদের কালো, ওটা ত' চোখের ধাঁধা, মনের উপর কাজল-প্রলেপ।" কিন্তু ঘুরে আজ চাঁদ মুখ তুলে উচ্চকণ্ঠে বলছে: "না ত, আমি আছি, আছি—অয়মহং ভোঃ। আমি সেই চাঁদই আছি, মানুষকে যে মোহিত করেছে চিরকাল, আজও তেমনি মনোহরণ করি তার।" মানুষের এই যে ঘোর বৈজ্ঞানিক রাত্রি তাকেও সেই প্রাচীন চাঁদই উদ্ভাসিত করে চলেছে, তার উত্তর ও উত্তম আলোকে—বৈদিক ঋষিদের মত আজও আমরা তাদের মন্ত্র সরবে ঘোষণা করতে পারি—

চন্দ্রমা নক্তং এতি
আমাদের রাত্রিতে এই যে উদয় হয়েছেন চন্দ্রমা।

একটা কৌতূহলের বিষয় লক্ষ্য করবার—চন্দ্র অভিযান সম্বন্ধে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আমেরিকা চাঁদে সশরীরে মানুষকে পাঠিয়েছে, পাঠাতে চায়—কিন্তু রাশিয়া সম্পূর্ণ নারাজ। তারা বলে মানুষকে পাঠানোর কোন দরকার নাই—বৃথা মানুষের এবং অর্থের খরচ। মানুষের বদলে যন্ত্র দিয়েই সব করা চলে। মানুষ যা করতে পারে যন্ত্র তার চেয়ে বেশি সুষ্ঠুতর ভাবে করতে পারে, হাতে কলমে সে দেখিয়ে চলেছে থাকে। আমি একটা গুপ্ত হেতুর সন্ধান দিতে চাই—রাশিয়া চন্দ্রে মানুষকে পাঠাতে চায় না, তার ভয়, মানুষ চন্দ্রগ্রস্ত হয়ে যাবে, মানুষ আর মানুষ থাকবে না, বা অন্য জগতের জীব হয়ে যেতে পারে—রাশিয়া চায় মানুষ থাকবে তার যন্ত্রপাতির ঘেরের মধ্যে—মানুষ বড় জোর হবে robot, যন্ত্রপুতুল। রাশিয়ার যন্ত্র—মানুষ নয়, যন্ত্র—মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে—যেমন আমেরিকান আকাশচারীরা করেছে—যন্ত্র সন্দেহাতীত চির-বিশ্বস্ত। মানুষের উপর নির্ভর করা যায় না, যন্ত্রকে আশ্রয় করে নিশ্চিন্তে চলতে পারা যায়। অবশ্য প্রকৃতির—পৃথিবীর—অগ্রগতিকে ঠিক ঠেকিয়ে রাখা যায় না কখনও—রাশিয়াও জানবে নূতন করে, ধরবে সাগ্রহে নূতন চেতনাকে এক দিন।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

২৯৩—অতিবিচারী সাধু ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখতে পাবে যে তারা যে-সব কাজ খুব অন্যায় বলে তীব্র মন্তব্য করে, তারা নিজেরাই তা ক'রে থাকে।

২৯৪—"যথার্থ রকমের কপটতা খুব কম লোকই করে।" এ কথা ঠিক বটে কিন্তু কূটনীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা আছে অনেক বেশি। আত্মপ্রবঞ্চনা তিনরকম হয়—চেতন, অবচেতন ও অর্ধচেতন। সব চেয়ে মারাত্মক হয় যেগুলো অর্ধচেতন।

প্রশ্ন : মা, আমার বোধ হয় যে চেতন আত্মপ্রবঞ্চনা সব চেয়ে মন্দ, তাই নয় কি?

মা : চেতন আত্মপ্রবঞ্চনা খুব কম হয়, কারণ তাতে চেতনার এমন প্রসারতা থাকা চাই যাতে পুরো চেতন থেকে তা মন্দ ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগী হয়ে মারাত্মক রকমের মিথ্যা-বাদিতা করতে পারে। আর সে জিনিস শোধরাতে পারাও সহজ, কারণ চেতনা সজাগ থাকলে সে সহজেই আপন ভুল বুঝে তাকে শুধরে নেয়। কিন্তু অন্যগুলি শোধরাতে অনেক সময় লাগে, কারণ আপন প্রবঞ্চনাকে ধরতে অনেক বিলম্ব হয়। ২১-১-১৯৭০

২৯৫—লোকের পুণ্যকর্ম দেখে প্রতারিত হয়োনা, এবং লোকের প্রকাশ্য বা গোপন পাপকাজ দেখেও বিরক্ত হয়োনা। মানুষের অগ্রগতির পথের সুদীর্ঘ মধ্যবর্তী অবস্থাতে ঐরকম উত্থানপতন হয়েই থাকে।

২৯৬—জগতের কুটিলতা দেখে বিমুখ হয়োনা ; জগৎ হলো আহত বিষাক্ত সাপের মতো, তার সেই বিষের খোলসটা ছেড়ে সুস্থ পূর্ণতা পাবার জন্য ছটফট করছে। অপেক্ষা ক'রে দেখ, সে দিব্যপথযাত্রী ; তার কুটিলতার ভিতর থেকে বিজয়ীর দীপ্তি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন ভগবান।

মা : শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মানুষের এটা মধ্যবর্তী অবস্থা, এর সমস্ত মন্দের ভিতর থেকে আলোকসত্তা বেরিয়ে ভগবানকে প্রকাশ করবে। যারা এ অবস্থাতে অসুখী তারা জানুক যে তাদের আশা বৃথা হবেনা। পরিবর্তনের কাজ চলেছে। তোমাদের অভীপ্সার সঙ্গে যদি থাকে নিবেদন ও প্রয়াস, তাহলে কাজ আরো ত্বরান্বিত হবে।

২২-১-১৯৭০

২৯৭—বাইরের চেহারার মুখোস দেখে বিরূপ হও কেন? তার সেই বাহ্য কুৎসিত কদাকার ও বিকটের আড়াল থেকে কৃষ্ণ তোমার বোকামি ও বিতৃষ্ণা ও ভয় দেখে হাসেন।

২৯৮—যখন কারো প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে যাও, তখন নিজের হৃদয়ের দিকে ফিরে চেয়ো, তাহলে আপন মূর্খামি দেখে তোমার হাসি পাবে।

প্রশ্ন : কদাকার ও বিকট দেখা কি আমাদের মনের দোষে, অথবা তা বাস্তবিকই তাই হয়? তাহলে তো সুন্দর দেখার বেলাতেও সেই কথা হবে।

মা : ঠিক কথা যে বাস্তবের জগতে বাইরের চেহারা দেখে আমাদের খুবই ঠকতে হয়; সুন্দর চেহারার মধ্যে সব সময় সুন্দর আত্মা থাকে না, আর কুৎসিতের মধ্যেও প্রদীপ্ত প্রতিভা বা জ্যোতির্ময় আত্মা থাকতে পারে। কিন্তু কারো আভ্যন্তর অনুভবশক্তি থাকলে ওতে ঠকতে হয়না, কারণ সে সুন্দরের আড়ালে অসুন্দরকে ও অসুন্দরের আড়ালে সুন্দরকে ঠিকই দেখতে পায়। তবে এখন ক্রমশ ভিতরের সৌন্দর্য বাইরেও প্রকাশ পাচ্ছে, তাই সেটা এখন সবাই সহজেই দেখতে পায়। ২৩-১-১৯৭০

২৯৯—বৃথা তর্ককলহ করতে যেওনা; তবে নিজের মতামত খোলাখুলি ভাবে আলাপপ্রলাপ করবে। প্রতিবাদ করলে বিপক্ষের তরফ থেকেও অনেক কিছু শিখতে পারবে। যদি সে নির্বোধও হয়, তথাপি তার কথা কান দিয়ে বা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে না শুনে আত্মার আলোতে দেখলে তার থেকেও জ্ঞান পাবে।

৩০০—সব কিছুকেই মধুর ক'রে নেবে; এই হলো দিব্যজীবনের নিয়ম।

৩০১—ব্যক্তিগত কলহ থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু সর্বজনীন সংগ্রাম থেকে নয়; আর তাতেও বিপক্ষের তরফের জোরটাকে লক্ষ্য করবে।

৩০২—যখন এমন কোনো মতামত শুনবে যা অপ্রিয় মনে হয়, তবু তার মধ্যেও কি সত্য আছে তা খুঁজে দেখো।

মা : তুমি যদি আন্তরিক ভাবে সত্যেরই মধ্যে থাকতে চাও, তাহলে জানবে যে সব কিছুর ভিতর থেকেই তুমি শিক্ষা নিতে পারো আর প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যেতে পারো। নির্বোধিতার ভিতর থেকেও আলো মিলবে যদি ঠিকভাবে দেখতে জানো। ২৪-১-১৯৭০

৩০৩—মধ্যযুগের সন্ন্যাসীরা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করতো, তারা মনে করতো যে ভগবান সন্ন্যাসীদের প্রলুব্ধ করবার জন্য স্ত্রীজাতি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ভগবানের ও তাঁর সৃষ্ট স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে এর চেয়ে আরো উচ্চ ধারণা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

৩০৪—কোনো স্ত্রীলোক যদি তোমাকে প্রলুব্ধ করে, সেটা তার দোষে না তোমার দোষে? নির্বোধের মতো যেন আত্মপ্রতারণা কোরোনা।

৩০৫—স্ত্রীলোকের প্রলোভন এড়াবার দুটি উপায় আছে। এক হলো স্ত্রীলোক মাত্রেরই সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করা, আর নতুবা জগতের মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসা।

প্রশ্ন : সাধারণ জীবনে এখনকার মেয়েদের কি আদর্শ হওয়া উচিত?

মা : সাধারণ জীবনে মেয়েরা মানুষের সবরকম আদর্শই নিতে পারে, তাতে কিছু যায় আসেনা। আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে মেয়ে পুরুষ দুইই সমান, ভগবৎ উপলব্ধি লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে। প্রত্যেকে আপন আপন সম্ভাব্যতা অনুযায়ী আপন আপন পথে উপলব্ধি পাবে।*

২৫-১-১৯৭০

—শ্রীমা

---

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩

প্রশ্ন : "শিক্ষা" থেকে—আপনি বলেছেন "মনের দ্বারা উচ্চ জ্ঞান আসেনা"—তাহলে সত্তার কোন অংশে তা আসতে পারে?

উত্তর : অতিমানস স্তরের যে জ্ঞান তার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু সে জ্ঞানকে ভিতরে নামিয়ে আনতে হলে?

উত্তর : সত্তার কোনো অংশ যখনই সে জ্ঞানকে আকর্ষণ করতে পারবে (আগে তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়) তখনই তা আসবে।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, তা কি তখন মনের মধ্যে আসেনা?

উত্তর : হাঁ, মনেরই উচ্চতর অংশে বা চৈত্যের মধ্যে। চৈত্য থেকেও জ্ঞান হতে পারে,—কিন্তু তা অন্যরকম, আর তা মনের গড়া জিনিস নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশেষ নিশ্চয়তা জাগে যার জোরে তুমি ঠিক সময়ে ঠিকভাবে ঠিক কাজটি ক'রে থাকো, মনের দ্বারা কিছু না ভেবে বা বুদ্ধির বিচার না ক'রে। যথা, একটা কাজ নিশ্চয় করা চাই জেনে তুমি করলে, সেখানে বিচারক-মনের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। মন কেবল নীরব থেকে তা দেখলে এবং শুনলে।

প্রশ্ন : মা, আপনি এখানে বলেছেন—"জ্ঞান হলো মনের চেয়ে অনেক উপর অংশের জিনিস, এমন কি বিশুদ্ধ আইডিয়া বা ভাবেরও উপরে।" বিশুদ্ধ ভাব মানে কি?

উত্তর : সে কথা কিছুকাল আগেই বলেছিলাম। ভাব হলো তাই যার থেকে মনে ভাবনার সৃষ্টি হয়। একটা ভাব থেকে অনেকরকম চিন্তা জন্মায় আর অনেক রকমে তার প্রকাশ হয়; অথচ ভাব ভাবই থাকে।

প্রশ্ন : কখনো কখনো যখন একটা কিছুর দিকে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে থাকি তখন সে মুহূর্তে আর সব জিনিসই ভুলে যাই, তখন কোনো শব্দ হলে খুব বিরক্ত লাগে। একে কিসের অবস্থা বলে?

উত্তর : এই তো একাগ্রতা, একেবারে আসল জিনিস। আপনা হতেই তা হয় নাকি?

প্রশ্ন : হাঁ, অনেক সময় তাই হয়।
উত্তর : এতো খুব ভালো কথা।

প্রশ্ন : তা হবে, কিন্তু না, তখন যে কি ভেবেছি তা পরে ধরতে পারি না।
উত্তর : আ! তাহলে হঠাৎ সে ভাব ছিন্ন হলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়?

প্রশ্ন : হাঁ মা।
উত্তর : তার কারণ, যে চেতনার মধ্যে তখন তুমি যাও তা তোমার সাধারণ চেতনার থেকে স্বতন্ত্র, দুই চেতনার মধ্যে ভালো যোগসূত্র নেই। ওতে সময় লাগে, একটা সেতু রচনা করতে হয়। নতুবা এটা থেকে ওটাতে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলে যাও বলে তা ভুলে যাও। তখনকার অনুভূতি পড়ে থাকে পিছনে। কিন্তু এ জিনিষ যদি নিয়মিতভাবে করা যায়, অর্থাৎ একটা বিশেষ সময় ঠিক ক'রে নিয়ে নির্জনে বসে দশ পনের মিনিট ধরে যদি বাহ্য জীবনের সঙ্গে ভিতরের যোগ রাখা যায়, তাহলে ভিতরের কথাটা তখন স্মরণ থাকে। আর এই একাগ্রতাশক্তি যদি তোমার পুরোমাত্রাতে থাকে তাহলে এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান হয় না—অবশ্য পাটিগণিতের সমস্যা নয় (হাস্য)। জীবন সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, যার মীমাংসা চাই। এই শক্তিকে কোনো সমস্যাই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

কোনো একটা লক্ষ্যবিন্দু ধরে তার দিকে একাগ্র হয়ে থাকো, তাহলে থাকতে থাকতে সেই বিন্দুতেই নিজে চলে যাও, তাকে যে তুমি দেখছ সে জ্ঞান আর তখন থাকে না। আর স্থির অবিচল হয়ে যদি সেই অবস্থাতেই থাকো, তাহলে তখন যেন একটা দরজা খুলে যায়, তার মধ্যে ঢুকে হঠাৎ সব কিছু দেখতে পাও।

কখন থেকে তোমার ঐ ভাব হয়েছে? সম্প্রতি, না বরাবরই আছে?

প্রশ্ন : তা বলতে পারিনা। জানিনা।
উত্তর : জানো না? হয়তো নিজের অজানিতেই এমন জিনিস হচ্ছিল?

প্রশ্ন : তাও আমি জানিনা।
উত্তর : কিন্তু নিজের চেষ্টায় তা করোনা? আপনা হতেই অমন এসে যায়?

প্রশ্ন : হাঁ, তাই।
উত্তর : ও। সেইজন্যই হয়তো তোমার স্মরণ থাকে না।

অন্যজনের প্রশ্ন : মা, জ্ঞানের রাজ্যে ঢুকতে হলে কি মধ্যবর্তী অবস্থা পেরোতেই হয় ?

উত্তর : মধ্যবর্তী ? যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত প্রচেষ্টা নাও তাহলে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বরাবর যেতেই হয় : অর্থাৎ একটা স্তরে জেগে উঠে পরে সেখানে যেন ঘুমিয়ে পড়ে আরো অন্য স্তরে উঠে গেলে, এই ভাবে। এতে সব কথা স্মরণ থাকে, কারণ চেতন ইচ্ছাতে সাক্ষীর মতো সব কিছু কাজ দেখা যায়—সত্তাকে নীরব রেখে দেখা যায় কোথায় সে চুকছে ও সেখানে কি হচ্ছে, আর সেখান থেকে আরো উঁচুতে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় ; এতে সত্তার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ রাখা যায়, আর কিছু না ভুলে অনুভূতি মেলে, এমন কি ইচ্ছার ধারাও।

কিন্তু এমন সব অশিক্ষিত মানুষও আছে যারা হঠাৎ কেমন উপায়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করে, উচ্চ মানসে বা চৈত্যে বা অন্য কোন অংশে। এর অনেক কারণ থাকতে পারে ; হয়তো পূর্বজন্মের ফলে, কিংবা এই জন্মেরই চেতনা খুলে যাবার ফলে,—অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু এ জিনিসকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে ঐদিক দিয়ে উন্নতির জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা করতে হয়, আর সত্তার বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়, যাতে সাধারণত কাজ হতে পারে। আমি এমন লোক দেখেছি যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, অথচ তাদের আশ্চর্য রকম দৃষ্টিশক্তি। সম্মোহনের অবস্থাতে নিয়ে গেলে তারা এমন সব আশ্চর্য রাজ্যের চমৎকার বর্ণনা দেয় যেন তা প্রত্যক্ষ দেখছে, কিন্তু সে অবস্থা থেকে ফিরে এলে আবার আগের মতো নির্বোধ অজ্ঞ সহজ মানুষ। অথচ অমনি তাদের আশ্চর্য শক্তি। অর্থাৎ এমন সব সত্তা আছে যারা অতিসাধারণ হলেও আধ্যাত্মিক বা এমন কি জ্ঞানেরও দিক থেকে অনেকটা অগ্রসর হতে পারে। আবার এমনও আছে যারা উপলব্ধি পেয়ে নিত্য ভগবৎ সান্নিধ্যে থাকে, তবু জীবনে কোনো দর্শনলাভ ঘটেনি, আর সেজন্য ক্ষুব্ধ। যার যেমন প্রকৃতি ও যেমন নিয়তি, আর যার পক্ষে যে কাজ করা দরকার, কারণ সকলে সব কাজ করতে পারে না। সুতরাং বৈচিত্র্য ও বাছাই হবেই।

প্রশ্ন : মা, দেহ যখন অসুস্থ হয় তখন কি প্রাণ ও মনও অসুস্থ হয় ?

উত্তর : না হতেও পারে। আমি আগেও বলেছি, অসুস্থতা ঘটে সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসঙ্গতির ফলে। এমন হতে পারে যে সত্তার অন্যান্য অংশ যখন অনেকটা এগিয়েছে তখন দেহ রইল পিছনে পড়ে, এতেও সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে অসুখ হতে পারে, যদিও তখন প্রাণ ও মনের হয়তো উচ্চতর অবস্থা। এমন লোকও আছে যারা বছরের পর বছর দুরারোগ্য অসুখে ভুগছে, অথচ মনের দিক দিয়ে খুব অগ্রসর, মন তাদের আশ্চর্য রকমে স্বচ্ছ। একজন উঁচু দরের ফরাসী কবি ছিলেন Sully Prudhomme। তিনি মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছিলেন আর সেই অবস্থাতেই চমৎকার কবিতা রচনা করতেন। তিনি ছিলেন মিতভাষী, বিনম্র, সকলের সঙ্গে অমায়িক আচরণ করতেন। অথচ দেহ

তখন তাঁর ভেঙে পড়ছে। সুতরাং এটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। আবার এমন লোকও আছে যারা কিছুমাত্র অসুস্থ হলেই একেবারে আপাদমস্তক অস্থির হয়ে ওঠে—একেবারে অপদার্থের মতো দিশেহারা হয়ে যায়। এ বিষয়ে প্রত্যেকের বেলাই আলাদা আলাদা রকম।

প্রশ্ন : শোনা যায় যে মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আছে। মন অসুস্থ হলে তখন কি হয়?

উত্তর : দেহে মনে সম্পর্ক তো আছেই, শুধু তাই নয়, পরস্পরে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, তাই অনেক সময় মনই দেহকে অসুস্থ করে। অসুখ তাই রোগের একটা প্রধান কারণ।

প্রশ্ন : আর দেহ সুস্থ না থাকলে তখন কি হয়?

উত্তর : তা নির্ভর করে ব্যক্তির উপর, আগেই বলেছি। এমন লোক আছে যাদের দেহ অসুস্থ হলেই মন বিগড়ে যায়। আবার এমন আছে যাদের দেহ খুব পীড়িত হলেও মন পরিষ্কার থাকে। কিন্তু দেহ সুস্থ থাকলে মন বিগড়ে যাওয়া খুব কমই হয়, যদিও সেটা অসম্ভব নয়, কারণ আবার মনের অবস্থার উপর দেহ অনেকটাই নির্ভর করে। মন হলো দেহের মনিব (ঐ বইতে তাই লিখেছি)। আমি বলেছি যে দেহ হলো মনের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু মনকে তোমরা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানোনা, বরং উল্টো কাজ ক'রে ভুল রকমে তার ব্যবহার ক'রে থাকো। মনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশক্তি রয়েছে দেহের উপর, তাই তার ভুল ক্রিয়াতে তোমরা অসুস্থ হও। একটু কিছু হলেই মন অমনি নানারকম বিপদ সম্ভাবনার কথা ভাবতে থাকে, এর থেকে এমন হতে পারে বা তেমন হতে পারে, কে জানে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে। এই সব অনিষ্টক্রিয়া না করে মনকে দিয়ে যদি মঙ্গল আশার কাজে লাগাও—যেমন দেহকে আশ্বাস দিয়ে বলো যে ওটা বিশেষ কিছু নয়, সাময়িক ব্যাপার মাত্র, এই ভাব যদি দেহকে নেওয়াতে পারো তাহলে সাময়িক অসুস্থতা সহজেই দূর হয়ে যেতে পারে, এমন কি কয়েক মুহূর্তেও সেরে যায়। এমন কাজ করতে পারলে তাতে আশ্চর্য রকমের ফল মেলে।

এমন কি দুর্ঘটনার মধ্যেও এর সুযোগ থাকে। মনে করো তুমি পা পিছলে পড়ে গেলে। ঐ পিছলানো এবং পতনের মধ্যে একটা ভগ্নাংশ মুহূর্তের সময় থাকে। সেই-টুকু সময়ের কাজে ওতে তোমার বিশেষ কিছু ক্ষতি না হতে পারে, আবার মারাত্মক বিপদও ঘটতে পারে। কেবল চাই চেতনার সর্বদা সজাগ থাকা আর চৈতন্যের সঙ্গে নিত্য সংস্পর্শ রাখা, কারণ ওরূপ আকস্মিক ব্যাপারে তেমন সংস্পর্শের সময় মেলেনা। ঐ সময়-টুকুর মধ্যে যদি মন ও চৈত্য দৃঢ় থাকে তাহলে ওতে বিশেষ অনিষ্ট না হতে পারে। কিন্তু ও সময়ে যদি মন তার নিরাশাবাদী অভ্যাস থেকে বলে : "ওঃ! ভয়ানক যে পড়ে গেলাম!" তাহলে ঐ ভগ্নাংশ-মুহূর্তের মধ্যেই বিপদ ঘটে যায়। তাই জীবনের প্রতি মুহূর্তে সজাগ

থাকা দরকার। কারণ ঐ ভগ্নাংশ মুহূর্তটুকুর উপর অনেকটাই নির্ভর করে, ওর ক্রিয়াতে তুমি বিপদকেও এড়াতে পারো, রোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারো। ঐ মুহূর্ত-টুকু অবহেলা করবার নয়, তখন অচেতন থাকলেই সুযোগ হারাবে।

প্রশ্ন : কিন্তু তখনকার পরে কি অমন কাজ আর করা যায় না? (হাসা)

উত্তর : না। কিন্তু তার পরেও আরো একটা মুহূর্ত আসে।...মনে করো তুমি পড়ে গেছ, আঘাতও পেয়েছ। তথাপি একটা মুহূর্ত থাকে যখন তুমি ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে মনের মোড় ফেরাতে পারো, অর্থাৎ তাতে ওর অনিষ্টক্রিয়া কেটে যেতে পারে, কিংবা ওর থেকে নিরাময়ক অবস্থাও ঘটতে পারে। তোমরা লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা, এমন মানুষ আছে যাদের প্রায় কোনো দুর্ঘটনাই বাদ যায় না! দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র ঘটলে সেটা তাদের হবেই, আর তা প্রায়ই সামান্য রকম হয় না। লোকে বলে : "আহা, বেচারার কি দুর্ভাগ্য, ওর কপালটাই মন্দ"। কিন্তু তা ভুল কথা। সমস্তই নির্ভর করে চেতনার ক্রিয়ার উপর। আমি এর অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম, কিন্তু তাদের নাম করতে হয়, সুতরাং বলব না। কিন্তু এখানে অমন সর্বদাই দেখা যায়। এমন লোক আছে যাদের নিশ্চয় মারা যাবার কথা, কিন্তু বেঁচে গেল; আবার এমনও আছে যাদের সামান্য জিনিস মারাত্মক হয়ে উঠল।

তবে তা মনের সাধারণ চিন্তার উপর নির্ভর করে না। তাদের চিন্তার কোনো দোষ থাকে না, অন্যেদের মতো মনের চিন্তাধারা ভালোই, কিন্তু কেবল ঐ বিশেষ মুহূর্তের তার-তম্য—অর্থাৎ ঠিক সময়টিতে ঠিক সাড়া জাগা। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

সমস্ত নির্ভর করে স্বভাবের উপর। কারো কারো চেতনা সদাজাগ্রত, ভিতরে ভিতরে তারা না ঘুমিয়ে সর্বদা সজাগ। যে মুহূর্তে দরকার সেই মুহূর্তে ভগবানের সাহায্য চায়, ভগবৎ শক্তিকে ডাকে। সে মুহূর্তে ডাকতে পারলেই বিপদটা কেটে যায়, বিশেষ কিছু হয় না। হয়তো মৃত্যুও ঘটতে পারতো তবু সে অক্ষত রইল। অপরপক্ষে কারো আবার সামান্য একটা আঁচড় লেগেও তা মারাত্মক হতে পারে—তাদের চেতনার মধ্যে একটা ভয় থাকে, মন্দ সম্ভাবনার কথা আপনা হতেই জেগে ওঠে; কোনো কিছু না, হয়তো পা মচ্‌কেছে, তাতেই হাড় ভাঙল। তা না হতেও পারতো।

এমন লোক দেখেছি, বই বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে বইটা ভেঙে পড়ল। তাতে মারাত্মক জখম হতে পারতো, কিন্তু পড়ে গিয়েও সে অক্ষত রইল। কেমন ক'রে তা হয়? আশ্চর্যের কথা, কিন্তু তা হয়ে থাকে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দিব্য শুয়ে রইল। কিছুই তার হলোনা। বাস্তব ঘটনাই বললাম, তার নামটাও বলতে পারি।

তাহলে এটা কিসের উপর নির্ভর করে? ঐ বিশেষ মুহূর্তের জাগ্রত চেতনার উপর।

এটা ঠিক মনের ব্যাপার নয়, সত্তার চেতনার অবস্থার উপর নির্ভর করে, যা ঠিক সময়ে সাড়া দেয়। ওর ক্ষমতা অসীম। যদিও ভগ্নাংশ-মুহূর্তের ক্রিয়া, কিন্তু তা সর্বদা সজাগ

সচেতন থাকা চাই। কারণ কখন কি হবে তা বলা যায় না, নয় কি? দরকারের সময় জাগবার সুযোগ থাকেনা, তাই আগের থেকে সজাগ থাকতে হয়।

একজনের কথা জানি, নিশ্চিত তার মারা যাবার কথা, কিন্তু তার চেতনা ত্বরিত কাজ করার ফলে কিছুই তার হলো না। সে ভুল ক'রে বিষ খেয়েছিল, বিষাক্ত ওষুধ এক দাগের স্থলে একেবারে বারো দাগ খেয়ে ফেলেছিল। ওতে তার হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারতো (অনেক দিন আগেকার কথা বলছি), কিন্তু এখনও সে বেঁচে আছে। তার চেতনা তখন ঠিক ভাবে ক্রিয়া করেছিল। এ সব ঘটনার কথা বললে যেন মিরেকল্ মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়, কেবল জাগ্রত চেতনার কাজ।

প্রশ্ন : আমরা কেমন ক'রে কত ভারী কপিকল ভেঙে পড়লেও তার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম? (একটা প্রকাণ্ড কপিকল দিয়ে গাছের গুঁড়ি তোলা হচ্ছিল, সেটা ভেঙে গাছ সমেত চারদিকে ছিট্‌কে পড়েছিল)।

উত্তর : সে কথা তোমাদেরই জানা উচিত।

প্রশ্ন : কতকটা জানি।

উত্তর : অমন আংশিকভাবে অস্পষ্টভাবে আন্দাজ করা ঠিক জানা নয়। কিসের জোরে তোমরা রক্ষা পেলে তা বলতে পারবে না?

প্রশ্ন : ওটা কৃপার কাজ।

উত্তর : কিন্তু কেমনভাবে কিসে কাজ হলো তা বললে সকলে বুঝবে যে কারো মধ্যে তেমন সজাগ চেতনা ছিল, বিশ্বাস ছিল...এমন কিছু ছিল যা আপনা হতে অজ্ঞাতভাবে কাজ করেছে।

এর মাত্রাভেদ আছে। মানব বুদ্ধি এমন, যে উল্‌টো জিনিসের সঙ্গে তুলনা না ক'রে কিছু বুঝতে পারে না। আমি শত শত লোকের কাছ থেকে চিঠি পাই যে তারা ঘোর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে : কিন্তু কেউই এ কথা লেখে না যে বিপদ কিছু হয়নি বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে!

দলবদ্ধ মানুষদের মধ্যে যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়, তখন তাদের প্রত্যেকের তাতে অংশ থাকে, আর ফলাফল নির্ভর করে তাদের মধ্যে কতজনের চেতনা ছিল আশাবাদী আর কতজনের নিরাশাবাদী—এরই তারতম্যের উপর। এ কথা আগে কোথাও লিখেছি কিনা জানিনা, হয়তো লিখেছি, কিন্তু বলি শোনো।...বিপদ না ঘটলে অথবা তার হাত থেকে রক্ষা না পেলে লোকে কৃপার কাজ বুঝতে পারে না। অথচ কোনো বিপদ না ঘটে যদি তোমার যাত্রা নিরাপদ হয় তখন তা হয় আরো বড়ো রকম কৃপার কাজ। সেখানে এমন সঙ্গতি করা হয়েছিল যে কোনো কিছুই অনিষ্ট হলোনা। কিন্তু লোকে

ভাবে, এ তো স্বাভাবিক। রোগ থেকে শীঘ্র সেরে উঠলে তোমরা কৃতজ্ঞ হও, কিন্তু বিনা রোগে সুস্থ থাকলে তা হওনা, অথচ সেটাই বড়ো রকম রিয়েক্‌ল্। আর দলবদ্ধ মানুষদের দুর্ঘটনা এড়াবার বেলাতে তাদের মধ্যে চেতনার আবহাওয়া কোন দিকে জোরালো তারই উপর তা নির্ভর করে।

একজন সুনিপুণ এরোপ্লেনচালক ছিল, যুদ্ধের সময় সে জয়ের পরে জয়লাভ করেছে, নিজের কখনো কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু জীবনের কোনো ব্যাপার থেকে সে হঠাৎ বুঝলে যে তার ভাগ্য এবার বিগড়েছে, হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে। সে তাই যুদ্ধের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যরকম জরুরী প্লেন চালাতে থাকল। একবার দরকার হলো ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্লেন নিয়ে যেতে হবে (তার চেতনার মধ্যে হয়তো কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল কিনা তা বলতে পারি না)। কথা ছিল ফ্রান্স থেকে মাদাগাস্কার যাবে আর ফিরে আসবে। আমার ভাই ছিল তখনকার কংগো রাজ্যের গভর্ণর, তার শীঘ্র সেখানে পৌঁছবার প্রয়োজন হওয়াতে সে ঐ চালকের প্লেনে যেতে চাইলে। সেই প্লেনটি ছিল পেশাদারী পরীক্ষার প্লেন (নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে কিনা দেখবার জন্য), তাই অনেকেই আমার ভাইকে নিষেধ করলে "এই বিপজ্জনক পরীক্ষার প্লেনের যাত্রাতে তুমি যেওনা। তাই সে নিষেধ শুনলে না। মধ্যপথে হঠাৎ সেই প্লেন বিগড়ে যাওয়াতে সাহারা মরুভূমিতে নামতে হলো। যথেষ্ট আশংকার ব্যাপার। কিন্তু এমন বিঘ্ন ঘটা সত্ত্বেও আশ্চর্যভাবে সে প্লেন সেখানে মেরামত হয়ে গিয়ে আবার আকাশে উঠে কংগো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। আমার ভাইকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে প্লেন আবার দক্ষিণে যাত্রা করলে। কিন্তু এবার অর্ধপথ যেতে না যেতে প্লেনটি ভেঙে চুরমার হলো, সেই চালক তাতে মারা গেল। ...এই দুর্ঘটনা হতোই। কিন্তু আমার ভাইএর আপন নিয়তি সম্বন্ধে এমন দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তার কিছু হবে না, তার চেতনার জোর ছিল, তাই ব্যাপারটা হলো ঐরকম। দুজন লোকের চেতনার বিভিন্ন আবহাওয়ার বিশ্লেষের ফলে প্লেন একবার বিগড়ে গিয়ে সেবার নামতে হলেও ক্ষতি কিছু হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বারে আমার ভাই তখন তাতে না থাকায় একা চালকের সেই "দুর্ভাগ্য" পুরোনাত্রায় কাজ ক'রে তার মৃত্যু ঘটালে।

আরো এমনি এক ঘটনা একবার এক জাহাজে ঘটেছিল। দুটি সর্বপরিচিত মানুষ প্লেনে গিয়েছিল ইন্দোচীনে। সেই প্লেনের দুর্ঘটনাতে অন্য সকলে মারা যায়, কেবল ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী বেঁচে যায়। কিন্তু এরা বোধহয় ছিল দুর্ভাগ্যের "বাহন" স্বরূপ। এরা সেখান থেকে জাহাজে উঠে ফ্রান্সে ফিরছিল। কিন্তু বেড়্‌সীতে জলতলে গুপ্ত পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজটিও ডুবে গেল। তাতেও সকলে মারা গেল, কেবল এরা দুজন বেঁচে রইল। আমি তখন বলতে চেয়েছিলাম—"খবরদার, এদের সঙ্গে কেউ কোথাও যাত্রা কোরোনা"। এমন সব মানুষ আছে যারা ঐভাবে অন্যদের বিপদ আনে কিন্তু নিজেরা বেঁচে যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এসব নিদিষ্ট হয় না। কিন্তু কার কেমন চেতনার

আবহাওয়া সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাই কারোদের সঙ্গে যাত্রা করতে হলে দেখতে হয় তারা কেমন, একটু আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি থাকা দরকার। যদি দেখ যে একরূপ কালো মেঘ কাউকে ঘিরে আছে, তাহলে সে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত হওয়া ভালো, কারণ দুর্ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে—সে ব্যক্তির নিজের তাতে ক্ষতি না হোক। তাই বাহ্য দৃষ্টি ছাড়াও একটা ভিতরের দৃষ্টি থাকা ভালো।

(একজনের দিকে চেয়ে) একে দেখে মনে হচ্ছে যেন জীবন বিপন্ন বোধ করছে।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৬

প্রশ্ন : ছেলেদের মধ্যে ধ্বংসপ্রবৃত্তি আপনি কাকে বলেছেন?

উত্তর : সকলের তা নয়। অনেকের আছে, যারা খুবই হুঁশিয়ার।

ছেলেদের দেহগত চেতনা বড়োদের মতো কঠিন জমাট বেঁধে থেকে ওঠেনা, কিন্তু যতই তারা বাড়তে থাকে ততই তাদের চেতনা স্থূলভাবে পাকতে থাকে, যদিনা অন্যরূপ কোনো ব্যবস্থাতে ইচ্ছাকৃত ক্রিয়া অনুযায়ী তারা বেড়ে ওঠে। যেমন, অধিকাংশ শিশুই তাদের কল্পনাকে বা স্বপ্নকে বা ভিতরের জিনিসকে জানতে ও বুঝতে পারেনা। কিন্তু তারা জগৎকে বড়োদের মতো সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ দেখেনা। ভিতরে ভিতরে তারা খুবই অনুভূতিপ্রবণ থাকে, কারণ তারা আপন চৈত্য অংশের খুব কাছাকাছি থাকে তাই সেখানে নানা শক্তির প্রভাব অনুভব করে—যা বড়ো হলে আর থাকেনা। ঘুমের সময়ে শিশুরা প্রায়ই খুব ভয় পায় আবার খুব আনন্দও পায়। তারা এমন সব জিনিসকে ভয় করে যা বড়ো হলে থাকে না, কারণ তাদের দৃষ্টি কেবল স্থূল নয়, তারা নানারকম শক্তির ক্রিয়া টের পায় ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা বড়োদের স্থূল চেতনাতে আর নোটে থাকেই না। সেই সব শক্তি আবহাওয়ার মধ্যে নিত্যই রয়েছে—যত নিষ্ঠুরতার, বদ ইচ্ছার, অপকারের শক্তি। যখেষ্ট চেতন হলে এবং ভিতরের অবস্থা পুষ্ট হলে এই সব শক্তিদের লক্ষ্য করে তাদের বাধা ক্রিয়া নিবারণ করা যায়। কিন্তু অল্প বয়সে আধা স্বপ্নের মতো অবস্থায় এদের প্রভাব থেকে শিশুরা এমন কাজ ক'রে ফেলে যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে কখনই করত না। বোধকরি এটাই তার কারণ।

আর অচেতনের ক্রিয়াতেও তা হয়ে থাকে। তারা যে কিছু অনিষ্ট করছে এটা না জেনেই শিশুরা অনেক কিছু অপকর্ম করে; অচেতনের মধ্যে আবৃত থেকে তারা জানতে পারেনা যে তাদের কাজের কি কুফল হলো। এমন প্রায়ই হয়ে থাকে। সুতরাং শিশুকে সমুচিত শিক্ষা দিলে ও তার শুভ বুদ্ধি জাগিয়ে তুললে, তাদের বুঝিয়ে দিলে যে কিসে অমোঘ ক্ষতি হয় (দৃষ্টান্ত দেখিয়েও বোঝানো যেতে পারে), এরূপ চেষ্টা করলে তখন তারা সেরূপ কাজ করা থেকে নিবৃত্ত হয়।

এটা শিক্ষাদানের প্রশ্ন। বড়োদের অনেক অর্ধচেতন নিষ্ঠুরতার কাজ—যার দৃষ্টান্ত

মিলবে না এমন খুব কম বাপ-মাই আছে, তার থেকেই ওদের চেতনাতে তার ছাপ পড়ে। নিজেরই ভিতর থেকে নাইবুদ্ধি খুব কম শিশুরই আছে, অন্ততপক্ষে এখানে একটিও নেই।

প্রশ্ন : "শিক্ষা" প্রবন্ধ থেকে—"ভূমিষ্ঠ হবার আগে প্রত্যাশিত শিশুর প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করে গর্ভিনী মায়ের উপর, সে সময়ে যেমন তার মনের ইচ্ছা ও আস্পৃহা থাকবে, আর যেমন তার পরিবেশ হবে। এ স্থলে মায়ের শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে তার চিন্তাগুলি সর্বদাই সুন্দর ও পবিত্র ও মহৎ ভাবের হয়, আর যাহা পরিবেশও যেন সরল ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আর ঐসঙ্গে যদি সে সর্বদা কামনা করে তার সর্বোচ্চ আদর্শ অনুযায়ী সুসন্তান জন্ম দেবার জন্য, তাহলে সেরূপ আত্মার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে আসার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়।"

না, মহৎ আত্মারা জগতে যখন জন্ম নিতে চান, তখন কি তাঁরা তৎপূর্বে আপন আপন বাপ-মাকে বাছাই ক'রে নেন?

উত্তর : ও! তা নির্ভর করে তাদের চেতনার উপর, চৈত্যসত্তার গঠনের উপর। যার সত্তার চৈত্য অংশ পূর্ণতা পেয়ে মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা পুনর্জন্ম নিতে সক্ষম হয় সে নিজের জন্মস্থান বেছে নিতেও পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি আগেও বলেছি। এরা আমাদের মতো চোখে তো দেখেনা, সুতরাং ইচ্ছামত দেহ বেছে নেবার সময় বাস্তব অচেতনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করতে হয়, দৈহিক বাস্তবের নিয়মের সঙ্গে আপসে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হয়। সুতরাং তাদের চৈত্যের পক্ষে স্থান বেছে নেওয়া যদিও গুরুত্বপূর্ণ তথাপি আগের থেকে যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট নির্বাচন হয় না। যেমন, কোন দেশে কোন পরিস্থিতির মধ্যে কোন বংশে কেমন বাপ-মায়ের মধ্যে জন্ম নেবে তা ঠিক করতে যথেষ্ট আত্মশক্তির দরকার, যাতে বাধাবিঘ্ন থাকলে তাকে কাটিয়ে যেতে পারে। সুতরাং এখানে স্থান নির্বাচনই সবটা কথা নয়। আর যদি বাপ-মায়েরাও চেতনভাবে সহায়তা করে, তথাপি রয়েছে তাদের অবচেতনা ও নিম্নচেতনা, যা থেকে থেকে প্রকাশ পায় এবং কাজের ক্ষতি করে—তখন স্থিরতার দরকার হয়। সুতরাং স্থান বাছলেও তারপরে প্রস্তুতির দরকার—দীর্ঘ প্রস্তুতি। জন্মের সময় অর্ধঅজ্ঞান অবস্থাতে কোনো দেহে প্রবেশ ক'রে তার সব কিছু প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে।

প্রশ্ন : কতক ছেলেমেয়ে দুর্বৃত্ত প্রকৃতির হয়। তাদের বাপ-মা কি ভালো আস্পৃহা করেনি?

উত্তর : হয়তো তাদের বাপ-মায়ের অবচেতনের মধ্যে কিছু দুর্বৃত্তি থাকে। কথায় বলে যে বড়োরা তাদের নিজেদের দুর্বৃত্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরোপ করে। তাদের ভিতরে ভিতরে একটা ছায়া থাকে, সেটাকে তারা ঐভাবে বাইরে বের করে, যদিও নিজেরা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়না। কিন্তু সন্তানের বেলাতে সেটা "অজিত" হয়। বিশেষ

নির্ভর করে সন্তান প্রজননের সময়কার তাদের চেতনার অবস্থার উপর। যদি ভিতরে হীনভাব থাকে তাহলে সন্তানের মধ্যে তা নিশ্চয় বর্তাবে। তাই সে-সব শিশু হবে বিকলাঙ্গ অপুষ্ট, অপূর্ণ, হীনবুদ্ধি (বিশেষত বুদ্ধির দিক দিয়ে ছিদ্রযুক্ত ও অপরিণত), অর্ধচেতন, অর্ধগঠন—এগুলি সবই হয় বাপ-মায়ের সেই সময়কার চেতনার অবস্থাবিশেষের দোষে। যেমন, মৃত্যুকালে তার পূর্বমুহূর্তের চেতনার অবস্থার উপর তার ভবিষ্যৎ পরবর্তী জীবন খুবই নির্ভর করে, তেমনি বাপমায়ের জন্মদানের সময়ের চেতনার অবস্থার উপর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন খুবই নির্ভর করে, তার উপরে তখনকার একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে যায়। যদিও সামান্য জিনিস—সেই মুহূর্তের মনের ভালো আস্পৃহা অথবা নিম্নাবস্থা—কিন্তু সামান্য জিনিস হলেও তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; এর ফলে সন্তান হতে পারে অপরিণত বা দুর্ভ। কিন্তু লোকে তা জানে না। পরে সন্তান যখন বদ স্বভাবের হয় তখন বাপ-মা তাকে তাড়না করে। কিন্তু তাদের নিজেদেরই আক্ষেপ ক'রে বলা উচিত, "কী হীন অবস্থাতে এমন সন্তানের জন্ম দিয়েছি যে তাতেই এমন হলো।" সত্য কথাই তাই।

প্রশ্ন : এমনও কখনো হয় যে মা হয়তো ছেলেকে ভালো শিক্ষাই দিয়েছে কিন্তু আশপাশের লোকে তাকে নষ্ট করেছে। সেখানে মা কি করতে পারে?

উত্তর : হাঁ, এটা ঠিক কথা। সব চেয়ে খারাপ জিনিস হলো চাকরের হাতে ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া। কারণ চাকরদের চেতনা অতি হীন ও তামসিক হয়ে থাকে, তারা ইচ্ছা না করলেও তার প্রভাব ছেলেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আবার বয়স বাড়লে ছেলে যখন স্কুলে যায় তখন সেখানেও এমন সব ছেলের সঙ্গে মেশে যারা মোটে ভালো নয়, এ ব্যাপার এড়ানোও খুব কঠিন। তথাপি ভালো চেতনা ও শুভ ইচ্ছার সঙ্গে জীবন শুরু হলে পরে বদ সংসর্গে গিয়ে পড়লেও সেটা সে বুঝতে পারে। তখন সে আপনা হতে ও-সংস্রব বর্জন করে, যদি তার নিজের মধ্যে শুভেচ্ছা থাকে।

প্রশ্ন : কিন্তু যদি তার শুভেচ্ছার চেয়ে অন্যদের অশুভেচ্ছার জোর বেশি হয়?

উত্তর : হাঁ, তাও হতে পারে। তাহলে আমাদের ঐ কথায় ফিরে আসতে হয় যে ভগবৎ সমর্পিত হয়ে আমরা যথাসাধ্য করবো, আস্পৃহার জোর ও ভিতরে আলো থাকলে বদের প্রভাব কেটে যাবে। কিন্তু ভূমিতে পা দিলে তখন আর পুরো বিশুদ্ধ ও প্রভাবমুক্ত থাকা যায় না। নিত্য এখানে খাদ্য খেতে হয় শ্বাস নিতে হয়, তখন দরকার হয় বদ প্রভাবকে যতখানি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ হওয়া যায়।

প্রশ্ন : উত্তেজনার জিনিস কিছু দেখলেই শিশুরা সেই দিকে ঝোঁকে কেন?

উত্তর : তারা তামসিক প্রকৃতির, ভিতরে যথেষ্ট তমস আছে। যতই তা হয় ততই তারা ভয়ানক রকম ব্যাপারগুলোকে পছন্দ করে। যেমন, দেহসত্তা যাদের তামসিক তারা

আর মশলা দেওয়া খাবার না খেলে তাদের পেট ভরে না, যদিও অতিরিক্ত ঝালমশলা বিষতুল্য, স্নায়ুগুলিকে বিষাক্ত করে। ওতে পুষ্টি মেলে না। কিন্তু তারা তামসিক প্রকৃতির বলে দেহের ক্ষতিবিষয়ে চেতনা থাকে না। আর মনের বেলাতেও তাই, প্রাণের বেলাতেও তাই। যারা তামসিক তাদের দরকার নিত্য উত্তেজনা, নাটকীয়তা, মারপিট, আত্মহত্যা ইত্যাদি, নতুবা তাদের ফুর্তি জাগেনা...মানুষকে নিষ্ঠুর ও দুঃশীল করার পক্ষে তমসের মতো এমন আর কিছু নেই। চালা হবার জন্য উত্তেজনাই তাদের দরকার হয়। কিন্তু কে তামসিক ও কে বিপ্রিত, অথবা কে প্রয়াস করে ওর থেকে মুক্ত হতে, এর মধ্যে বাছাই করতে জানতে হবে। তোমার জানা চাই যে তোমার প্রকৃতির মধ্যে কতখানি কি আছে, কোন জিনিস আসা দরকার। কারো কারো জীবনে দরকার হয় বারে বারে চাবুক খাওয়া, নতুবা তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আবার কারো পক্ষে দরকার হয় শান্তি, নীরবতা, পল্লীগ্রামসুলভ নির্জনতা, তাতেই তারা ভালো থাকে, কিন্তু যেমনি অগ্রগতি বা উপলব্ধির জন্য বা বিপত্তি কাটাবার জন্য আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রয়োজন হয় অমনি সব নষ্ট হয়ে যায়। এ সব জিনিস জটিল রকমের, নয় কি?

এই যে তিনটি গুণ (সত্ত্ব রজঃ ও তম) এর মধ্যে কার কতটা আছে তার তারতম্য নিরূপণ করা দরকার, জানতে হবে কোনটার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তারপরে একটা সময় আসবে যখন তিনটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটবে, তখন আর জীবনের সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে খানায় পড়তে হবে না। তখন থেকে সব কিছু নিরাপদ হবে।

প্রশ্ন : না, এখানে কথা ছিল যে এখানকার স্কুলে এবং ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ অনুযায়ী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানকার শিক্ষা যা হয় তা বাইরের মতো মামুলী ব্যবস্থা অনুযায়ী।

উত্তর : হাঁ, সে কথা ঠিক গো ছেলে। আমি কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা করছিলাম যাতে অন্যরকম হয়। কিন্তু বড়ো হয়ে উঠে তোমরাই যখন প্রফেসর হবে তখন তোমরা নতুনদের ঠিক পন্থায় সঠিক শিক্ষা দিতে পারবে। আপাতত একে এখন ছাত্রদের জন্য স্কুল না বলে প্রফেসরদের জন্য স্কুলই বলা যায়। অর্থাৎ যা সবাই জানে তাই আগে তোমরা শিখে নাও ; বিশেষ কিছু নয়, সাধারণ মানুষের যে সব জ্ঞান দরকার তাই আগে আয়ত্ত করো, তারই ভিত্তিতে আর এখানের পরিবেশের প্রভাবে প্রকৃত উন্নত জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখো—তখন বাহির থেকে যে সব শিক্ষার্থী আসবে তাদের সেই অনুযায়ী শিক্ষা দেবে। এই হবে তোমাদের কাজ।

আমি জানি এখানে ক্বচিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ নিয়মেই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যরকম করতে হলে এখানকার জন্য আলাদা বই রচনা করতে হয়, কি শিক্ষা তাতে থাকবে তা এখানেই নির্বাচন করতে হয়, কেমন পদ্ধতিতে শেখানো হবে তাও স্থির করতে হয়। আমি অনেককেই বলেছি তাই করতে। কিন্তু যাঁরা রাস্তা ছেড়ে নতুন রাস্তা ধরা এর পরের

বছরে ছাড়া সম্ভব নয় এই কথাই বলা হয়। এর মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। বই ছাড়া শিক্ষা দেওয়া চলে না, সুতরাং যে বই হাতে আছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু যে বইকে ভালো বলা হয় তাও খুব ভালো নয়। আমার মনে হয় যারা খুব শৈশবকাল থেকেই এখানে আছে আর অবচেতনের মধ্যে সব কিছু অনুভব করেছে—যদিও বাইরের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাবেনা কিন্তু ভিতরের বোধশক্তি তাদের জেগেছে, তাদের দ্বারা বিশেষ কাজ হয়, আর নতুন যারা আসছে তাদের পক্ষে এদের স্তরে উঠতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু কেবল বইএর শিক্ষা ছাড়া এ শিক্ষা কিছু বেশি নয় কি? তফাৎটা হয় এইরকম: নিত্য মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নেওয়া, আর দূষিত বিষাক্ত বায়ুতে শ্বাস নেওয়ার মধ্যে যেমন তফাৎ হয় সেইরকম। চেতনার দিক থেকেও সেই কথা, আর তাই হলো বড়ো কথা। বাহ্য চেতনাতে এ তফাৎ ধরা যায় না। তোমরা চাও বা না চাও, আলোকিত চেতনার মধ্যে, প্রোজ্জ্বল আশ্পৃহার মধ্যে, প্রকৃত জ্ঞান ও মূলগত বিশুদ্ধতার মধ্যে তোমরা নিত্য নিমগ্ন হয়ে আছো। এমন কি যারা বাহ্যচেতনাতে থাকে তারাও নিতান্ত ঘুমিয়ে থাকেনা। ঘুমের মধ্যেও এখানে যথেষ্ট কাজ হয়। তার একটা ফল আছে যা স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকে যারা বাইরের থেকে এসেছে (যারা শিশুদের নিয়ে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত), তারা আশ্চর্য হয়ে বলেছে: "এখানে যেমন ছেলেমেয়েদের দেখি তেমন আর কোথাও দেখিনি!" কিন্তু আমরা এই রকমেই অভ্যস্ত, তাই নয় কি? কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে চেতনার একটা বিশেষ জাগরণ, একরূপ আভ্যন্তরীণ সাড়া, একটা প্রস্ফুটন, একটা মুক্তি, যা অন্য কোথাও দেখা যাবে না। কোনো কোনো শিশু যারা আনন্দে লালিত হয়ে এখানে আসে—রীতিমত পালিশ করা, রুক্ষ করা, আচরণে খুব নম্র অমায়িক, কিন্তু ভিতরের সাড়া তাদের কিছুই নেই। এখানে আমরা হয়তো অসাধারণ রকম শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত (!) দেখাতে পারব না, বরং দেখা যাবে একটু "প্রশ্রয় পাওয়া"। কিন্তু এরা সব কী প্রাণবন্ত! এদের মধ্যে চেতনার স্পন্দন থাকে। সেটাই সব চেয়ে বড়ো কথা। কিন্তু এ সব জিনিস মুখে বলবার নয়—আজ এই প্রসঙ্গ উঠল বলে আমাকে বলতে হলো। তোমরা তো অনেক বছর এখানে রয়েছ, কিন্তু এই প্রথম আমার কাছে এ কথা শুনলে। আচ্ছা।

তোমাদের প্রশ্ন এবার শেষ হয়েছে?

প্রশ্ন: আমি অন্য বিষয়ে বলছি। মা, প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারিতে আপনি কিছু বাণী দেন। তাতে কি তাৎপর্য থাকে?

উত্তর: হাঁ, প্রতি বছরেই তাই হয়...গত যুদ্ধের সময় যা বাণী হয়েছিল তা যেন আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। এখন আর যুদ্ধ নেই, ভবিষ্যদ্বাণীর দরকার নেই! কিন্তু তবু আসছে বছরের অগ্রগতির কথাই ওতে থাকে। কাল সকালে পাবে এই প্রার্থনার বাণী ("ভগবান, এ বছরের জন্য এই তোমার আদেশ—কোনো বিষয়ে কখনো আস্ফালন করোনা,

তোমার কাজই তোমার কথা বলবে")। এটি গভীর ভাবে অনুধাবন করবে। কারণ এটি এক বিশেষ সত্য, এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এখন আমরা বাইরের সাধারণের দৃষ্টিতে পড়েছি, বিস্তর যাত্রী এখানে আসে, আমরা কি করছি তারা জানতে চায়, তাদের ঘুরিয়ে সব কিছু দেখানো হয় এবং আমরা কি করছি ও কি করবো তা বলা হয়। সুতরাং এ কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার—"আমরা কি করছি তাই নিয়ে বড়াই করব না।" এই হলো কথা।

যতই কর কেন বলো, তবু বলার চেয়ে করা ভালো। এর আরো একটা গভীরতর তাৎপর্য আছে, সে কথা অন্য বারে বলা হবে।

ছেলেমেয়েরা, তোমাদের আমি শুভ ইচ্ছা জানাই।

—শ্রীমা

পথের কথা

২৫ অক্টোবর ১৯৭২

(ভক্ত মাকে একটি ফুল দিলে তিনি আবার সেটি তাকে ফিরিয়ে দিলেন)

ভক্ত : ওটি হলো "অবচেতনের ভিতরকার সত্তাশক্তি"।

মা : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) অবচেতনের মধ্যে আছে সবরকম বৈচিত্র্যের সমাবেশ।

ভক্ত : হাঁ।

মা : আর তা সব সময় ভেসে বা ঠেলে উঠতে থাকে (অনুরূপ ভঙ্গী)—তখন বোধ হয় যে তুমি নিতান্ত অবোধ, অচেতন, মুহ্যমান (পুনরায় ভঙ্গী)। আর সবই কিন্তু ঐভাবে একত্রে ঠেলে ওঠে (ঠেলে ওঠার ভঙ্গী)।

অথচ চেতনা রয়েছে মাথাকে ঘিরে (মাথার দিকে দেখিয়ে), অতি প্রশান্ত, অসাধারণ রকমের প্রশান্ত...(হাত দুটি খুলে ছড়িয়ে বললেন) : "ওগো প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক"। আর এই ভাবটি নিত্য চাপ দিতে থাকে নিচের থেকে যা ঠেলে আসে তার উপর। সারা জগতের যত সংগ্রাম যেন চলেছে আমারই চেতনার মধ্যে।...এখন এমন অবস্থা যে ভগবানকে এক মুহূর্তের জন্য ভুললেও সর্বনাশ হবে।

তোমার বেলাতে কেমন অবস্থা?

ভক্ত : আমার তো মনে হয় যে এই অবচেতনকে শোধরাবার কাজের কোনো শেষ নেই।

মা : হাঁ, কেবল একজনের পক্ষে তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর অবচেতনেরও তাই অবস্থা, তার বেলাতেও কোনো শেষ নেই। কিন্তু তা হলেও তা করা চাই...

থেমে যাওয়া মানে কাজ খানিয়ে দেওয়া। বরাবর চালিয়ে যেতে হবে, তাতে অনেক সময় লাগবে...ঠিক বলতে পারি না...ওর কোনো শেষ নেই।

কিন্তু থেমে গেলেই সব বন্ধ হয়ে গেল। আর চেতনার মধ্যে সর্বদা রয়েছে (মাথার দিকে নির্দেশ) সংযোগ ও সক্রিয়তার কেন্দ্র।

সুতরাং এর একটিমাত্র উপায় আমি জানি—নীরব, নীরব, নীরব থাকা। (উপর দিকে হাত তুলে) এই ব্যক্তির জিনিসটা কিছুনা, কিছুনা, কিছুনা—কেবল ভগবৎ-রশ্মি এর ফাঁকের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে। এই হলো একমাত্র মীমাংসা। সারা সংগ্রামটা কেবল ভগবানকেই করতে দাও।

(নীরব হলেন)

ভক্ত : গতবারে আপনি বললেন যে শত শত বছর বা হয়তো হাজার বছর লাগবে, তবে গিয়ে মানুষের চেতনা ভগবানের দিকে ফিরবে। কিন্তু...

মা : কিন্তু তা হয়তো নয়।

ভক্ত : এবার বোধকরি নিশ্চয় একটা বিশেষ রকমের কিছু আসবে।

মা : হাঁ।...দেখ, আমার বোধ হয় যে ব্যক্তি হলো একাগ্রতা স্থাপনের একটা প্রতিশ্রুতি। মানুষ তাই আপন পরিধির মধ্যে এমন একটা কিছু চায়ই যাতে সে নিজেকে একাগ্র করতে পারে। আর দেহ কেবল সেই চেষ্টা করে যাতে তার সত্তার ভিতর দিয়ে ভগবৎ শক্তির আনাগোনার কোনো বিঘ্ন না ঘটে ; বাধা প্রতিরোধকে সে এড়াতে চায়, আর সেই সঙ্গে দেখতে পায় যে একাগ্রতাকে ধরে রাখবার জন্য সে যেন একটা প্রতিশ্রুতি বা বিগ্রহস্বরূপ।

৪ নভেম্বর ১৯৭২

মা : এই যে সমুদয় অবচেতনা (নিচের থেকে ঠেলে ওঠার ভঙ্গী)...

(নীরব থেকে)

এটা কেবল অনুভব নয়, জ্ঞানও নয়, এ হলো (আকাশে হাত বাড়ালেন)...একে বিশ্বাস বলা চলে না, এ হলো ভিতরের বোধের মধ্যে একটা নিশ্চয়তা-বোধ ; যে-এক দিব্যানন্দ রয়েছে আমাদের জন্য প্রস্তুত, কেবল অবচেতনের যত কিছু বাধা ঠেলে উঠে তাকে আমাদের গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। অতএব বলতে হয় যে এটা যুদ্ধক্ষেত্র, কিন্তু এ যুদ্ধ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে। এর বর্ণনা করা অসম্ভব।

তাই আমি যদি একটুও নড়াচড়া না ক'রে স্থিরভাবে এ চেতনার মধ্যে অবস্থান করি, তাহলে সময় যে কোথা দিয়ে যেন নিমেষের মধ্যে পার হয়ে যায়...একটা জ্যোতির্ময় শান্তির মধ্যে ডুবে গিয়ে। ওর ভিতর থেকে তখন যদি সামান্য কিছুও আমাকে টেনে বের করে, মনে হয় যে নরকে ঢুকেছি। এই হয়।

আর তখন এমন নিদারুণ অস্বস্তি হয় যাতে এক মিনিট কিংবা কয়েক মিনিটও সে অবস্থায় থাকা যায়না। তখন...তখন কেবল ভগবানকে ডাকা...আর বোধ করতে থাকা যে ভগবানের কোলে আশ্রয় নিলাম।

আর তখন সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়।

৮ নভেম্বর ১৯৭২

মা : অতিমানস চেতনা আমি পেয়েছিলাম—মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। সে কী যে আশ্চর্য জিনিস গো ছেলে। আমি এই বুঝলাম যে, এখন যদি এই জিনিসের আস্বাদ আমরা পাই, তাহলে ও ছাড়া আমরা আর বাঁচতেই চাইব না ; অথচ আমরা এখন

রয়েছি...(পিষে ধরার ভঙ্গী) একটা নির্দিষ্ট পরিবর্তনক্রিয়ার অবস্থাতে। এই পরিবর্তনক্রিয়া একরকম নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও ঘটতে পারে (তা ছাড়া কি বলব জানি না) কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। সাধারণত ওতে চেষ্টা প্রয়োগ করতে হয়।

কিন্তু সে চেতনা যে কী পরমাশ্চর্য রকমের! আরো আশ্চর্যের কথা, তা যেন পূর্ণ স্থির প্রশান্তির মধ্যে পূর্ণ সক্রিয়তা! অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্রই তা ছিল।

(নীরব থেকে)

তুমি এ সম্বন্ধে কি বলছ?

ভক্ত : সে কি একটা সামগ্রিক রকমের চেতনা?

মা : তা এক অসাধারণ জিনিস। সকল বৈপরীত্য একত্র করা সম্ভব। একই সঙ্গে পূর্ণ সক্রিয়তা, যা সামগ্রিক ও প্রবল, অথচ তৎসঙ্গে পূর্ণ প্রশান্তি।

কিন্তু এ কেবল কথায় বলা হল মাত্র।

(নীরব হলেন)

ভক্ত : কিন্তু সে কি বাস্তব রকমের চেতনা?

মা : তার ক্রিয়াটি নিশ্চয় বাস্তব কিন্তু সে ধরনের নয়, তাই না?

(নীরব হলেন)

ভক্ত : সহজে কেমন ক'রে তার সংস্পর্শ মেলে? কেমন ক'রে তাতে পৌঁছনো যায়?

মা : আমি তা জানি না, কারণ আমার সমগ্র চেতনা, আর দেহচেতনা পর্যন্ত রয়েছে নিবেদিত (নিবেদনের ভঙ্গী)...আমি যাকে ভগবান বলে জেনেছি তার দিকেই রয়েছি, আর সেটা বিনা "চেষ্টাতে", বুঝতে পারলে?

ভক্ত : হাঁ, যাঁ।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭২

মা : তোমার কিছু জানবার আছে?

ভক্ত : শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রূপান্তরের কোন অবস্থাতে তিনি পৌঁছেছিলেন? আর তখন তিনি যে কাজ করছিলেন আর আপনি এখন যে কাজ করছেন, এ দুইএর মধ্যে কি পার্থক্য?

মা : তিনি তাঁর দেহে প্রচুর অতিমানস শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন আর যেমনি দেহত্যাগ করলেন...তখন তিনি বিছানাতে শুয়ে আর আমি রয়েছি তাঁর শয্যাপার্শ্বে। সেই সময়ে আমি বাস্তব ভাবে ও সুস্পষ্ট রকমে এটা অনুভব করতে থাকলাম যে সেই অতিমানস শক্তি

তাঁর দেহ থেকে আমার দেহতে সবেগে প্রবেশ করছে, এমন কি তার আসার সময়কার বেগবান ঘর্ষণও অনুভব করলাম। সে এক অসাধারণ রকমের অনুভূতি। বহুক্ষণ, বহুক্ষণ ধরে তাই চলতে থাকল (দেহে অনুপ্রবেশের ভঙ্গী), আর আমি সেই শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়েই থাকলাম।

সে এক বাস্তব রকমের অভিনব অনুভব। এই পর্যন্তই আমি জানি।

ভক্ত : কিন্তু আমি এ কথা জানতে চাইছিলাম যে ভিতরের দিকে ক্রিয়াতে, যেমন অবচেতনের বিশুদ্ধীকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কতদূর কি কাজ হয়েছিল? অর্থাৎ তিনি তখন যতটা কাজ করেছিলেন আর এখন আপনি যতটা করেছেন, এর মধ্যে তফাৎ কতখানি? যেমন, অবচেতনের বিকল্প ক্রিয়া এখন কিছু করেছে কিনা।

মা : ও। নিশ্চয় নিশ্চয়, তা হয়েছে বৈকি!

কিন্তু এ হলো মনের দিক থেকে দেখা। এখন আর আমি ঐভাবে দেখিনা।

ভক্ত : সে কথা ঠিক মা।

(মা নীরব হলেন)

ভক্ত : প্রভেদ হয়েছে বোধ হয় দিব্যশক্তির সামগ্রিক তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধির দিক থেকে, তাই নয় কি?

মা : প্রভেদ হয়েছে কাজের শক্তিবৃদ্ধির দিক দিয়ে। নিজেই তিনি তাঁর দেহী অবস্থাতে কাজের শক্তি দিয়ে যতখানি করতেন, এখন তার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করছেন। এই কারণেই তিনি দেহত্যাগ করলেন, এইরকম ভাবে কাজ করবার প্রয়োজন ছিল। এখনকার তাঁর কাজ আরো বেশি নিরেট। সে কাজ আদৌ মানসিক পর্যায়ের নয়, সে হলো অন্য স্তরের জিনিস। ঈথরীয় বা ফাঁকা বায়বীয় নয়...একেবারে সুস্পষ্ট নিরেট। এমন কি তাকে পুরোপুরি বাস্তব বলা চলে।

ভক্ত : কিন্তু ঐ যে অন্য স্তরের জিনিসের কথা বললেন, কোনরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা সে স্তরে যেতে পারা যায়? দুটি সম্ভব রকমের গতি আছে : এক হলো সম্পূর্ণ ভিতরের দিকে আত্মার অভিমুখে, আর দ্বিতীয় হলো ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলে দিয়ে ব্যাপকতর বিস্তারের দিকে, অর্থাৎ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে...

মা : হাঁ, দুইই চাই।

ভক্ত : দু'রকমই চাই?

মা : হাঁ। (মা সমাধিস্থ হলেন)

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২

মা : নতুন বছর আসছে...

ভক্ত : নতুন বছরের সম্পর্কে নতুন কিছু বোধ করেন?

মা : (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) সব কিছুই চরম অবস্থাতে এসেছে, তাই আবহাওয়া যেন হয়েছে চমকপ্রদ—প্রায় ধারণাতীত, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এও বোধ হয় যে, কোনো মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে—ঠিক "মৃত্যু" নয়, কিন্তু দেহলোপ। এই দুটি ভাব মিলিয়ে একটা চেতনা তৈরি হয় (মাথা নেড়ে)...আগেকার পুরোনো সব কিছুকেই মনে হয় নিতান্ত ছেলেমি, চেতনাবিরুদ্ধ...যার ভিতরে যা রয়েছে এখানে...অতি ভোরালো, অত্যাশ্চর্য।

আর দেহের তরফের সেই একটাই প্রার্থনা—আগোগোড়া কেবল একই কথা :

আমাকে উপযুক্ত করো তোমাকে জানতে,
আমাকে উপযুক্ত করো তোমার সেবাতে,
আমাকে উপযুক্ত করো তুমি হওয়াতে।

ভিতরে ভিতরে আমি একটা ক্রমবর্ধমান তেজ অনুভব করি...যা নতুন ধরনের জিনিস...নীরবতায় ও নিবিষ্টতায়।

অসম্ভব তো কোনো কিছুই নয় (মা উপরের দিকে হাত বাড়ালেন)।

(নীরব থেকে)

তাহ'লে আর তোমার কিছু প্রশ্ন নেই...তুমি চাও নীরবতা, চেতনার নীরবতা?

ভক্ত : কিন্তু আমি জানিনা আমি ঠিকভাবের কাজ করছি কিনা।

মা : (নীরব থেকে) কিন্তু যখন তুমি ভগবানেরই সংস্রব চাও, তখন ও ছাড়া আর কি করবে?

ভক্ত : আর—আমি নিজেকে সঁপে দিলাম মা তোমারই পায়ে।

(মা একটু হেসে সমাধিস্থ হলেন)*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩০)

দেহ প্রাণ মন ও অহং, এসব থেকে বন্ধনমুক্তির প্রসঙ্গে দেখলাম, আমাদের সত্তা আত্মাকে বন্দী করে রেখেছে দেহের বন্ধন, হৃদয়ের গ্রন্থি, মনের সঙ্কীর্ণতা ও সর্বোপরি অহংএর চক্রান্ত —এই গাঁটগুলি খুলে গেলে কি হয়? চেতনা প্রসারিত হতে থাকে, ব্যাপ্ত হয় অনন্তে— আমরা বলে থাকি চৈতন্য হয়, জ্ঞানলাভ হয়। চেতনার মুক্তি ঘটে, চেতনা বৃহৎ হয়; আর যিনি এই "ব্যাপ্তিরূপেণ সংস্থিতা" তিনি খণ্ডচৈতন্য হতে বিশ্বচেতনার অভ্যুদয় ঘটান। সে এক বৃহৎ বিস্ফারণ অনন্তের বুকে সংঘটিত হয়। সমগ্র বিশ্বকে এক বলে ভাবনা সর্বভূতাত্মা হওয়া তখনই সম্ভবপর হতে পারে, তার পূর্বে নয়। জ্ঞানযোগের প্রথম লক্ষ্য যেমন মুক্তি—সব কিছুর মিথ্যা বন্ধন হতে অপ্রাকৃত চেতনায় বিস্ফারণ, তেমনি তার পরের লক্ষ্য সিদ্ধি; তা নাহলে যে মুক্তিও সম্যক্ সিদ্ধ হয় না, শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে আমরা সেটা জেনেছি। পুরুষ মুক্ত হলেন, তুরীয় নির্বিশেষ প্রপঞ্চোপশম শান্ত শিবত্বে তাঁর সত্তার নিমজ্জন ঘটল, তারপর যখন আবার তাঁর চেতনায় প্রপঞ্চের উদয় হল, জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর স্থান নির্ধারিত হল। কেননা জীবন যদি থাকে, তা হতে জগৎকে বিশ্বকে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারি না। তাই এই অপরা প্রকৃতির মুক্তি শুধু নয়, তাকে যেমন পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, তেমন এই প্রকৃতিতে পরাপ্রকৃতির আবেশে ও পরা প্রকৃতির উন্মেষে অপরা প্রকৃতির রূপান্তর সাধিত হবে দৈবী প্রকৃতিতে। তখনই বলা যাবে অদ্বৈত সিদ্ধির পূর্ণতা। তাই বলা হয়েছে পুরুষের উপলব্ধিকে নামিয়ে আনতে হবে প্রকৃতিতে, তবেই রূপান্তর যোগ সিদ্ধ হবে।

উপনিষৎ যে মহাবাক্য শুনিয়েছেন, তা চেতনার ওই বৃহতে বিস্ফারণ ও পরিবর্তন অর্থাৎ ব্যাপ্তি ও বৃহত্ত্বের দ্যোতক—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি"..."সোঽহমস্মি" ...এই আত্মাই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, ঐ যে পুরুষ আমিই সেই...ইত্যাদি। আবার এখান থেকেই অহঙ্কারের সংস্কার উৎপন্ন হয়, এই ভূমি থেকেই অহংএর বোধ নেমে এসেছে; তা আমাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তার সঙ্গে অসহযোগ করে বৃহৎ হতে চাই। বেদান্তের প্রসিদ্ধ নেতিবাদ আশ্রয় করে বিশ্বাতীতকে নিয়ে বৃহৎ হওয়ার সাধনা আছে, দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার এগুলি সবই নেতি নেতি করে বাদ দিতে হয়; আমি বা আমার আত্মা তো এসব নই, এরপর যা থাকে তা বিশ্বকে ছাপিয়ে বিশ্বাতীতে প্রপঞ্চোপশমে চলে যায়, আত্মার যা স্বরূপ। তখনকার অনুভূতি সমাধির ওপার দিয়ে লোকোত্তর চেতনার আলোয় একাকার। তাতে জগৎ ভাসে আলো হয়ে যায় সব...তার সঙ্গে একাকার হয়ে

আলো হয়ে যাই : আবার আলোও থাকে না, আকাশবৎ শূন্যতা, এক মহাশূন্যে পরিনির্বাণ হয়ে গেল সব, তাও আছে। "নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে গেল"...এই সব বোধের লক্ষণ। প্রকৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে এই যে গভীরে তলিয়ে যাওয়ার পথ, এ-ই বিনাশের পথ। মূলাধারের শিকড় গভীরে পাতাল পর্যন্ত নেবেছে, তাকে ঐ পথেই উপড়ে ফেলতে হবে, নাহলে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের বিজ্ঞান সম্ভব হয় না। চেতনার উত্তরায়ণের চরম বিস্মৃতে এই বিনাশের অনুভব। এই বিনাশের দ্বারা মৃত্যু হতে উত্তীর্ণ হতে হবে, মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিয়েই অজ্ঞানের গ্রন্থি বিকীর্ণ করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও জানতে হবে, বিনাশ পরম সত্যের একদিক মাত্র, তার আর একটি বিভাগ সম্ভূতি। বিনাশ (non-being) দ্বারা মৃত্যুতরণ, কিন্তু অমৃতের সম্ভোগ সম্ভূতিতে। বৈষ্ণবত মরণের আড়াল হতে অমৃতদ্যুতিকে ছিনিয়ে এনে এই মর্ত্য জীবনের আলোয় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা—বীর সাধকের এই মৃত্যুজয়ী অভিযানই যোগসিদ্ধির পরম রহস্য।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'নি'তে সর্বক্ষণ থাকা যাবে না, সমাধির পরে আছে ব্যুত্থান। আলো বা আকাশ হয়েও জাগ্রত জীবনে সর্বক্ষণ থাকা সম্ভবপর নয়। তাহলে ওই লোকোত্তরকেই নামিয়ে এনে সেই সংস্কার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করি যদি। জগতের মায়ার খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে পাবার জন্য। সেই পাওয়ার প্রগাঢ় সুষুপ্তিকে আবার জাগ্রতে ফিরিয়ে আনতে হবে তো! জাগ্রতে বহুর মেলায় সেই পরম একেকে অনুস্যূত দেখতে না পারা পর্যন্ত ছুটি মিলবে না। সাধারণত মুক্ত পুরুষেরা এতটা করতে চান না, ব্যুত্থানে প্রারব্ধ ক্ষয় করতে তটস্থ থেকে কর্ম করেন এবং দেহত্যাগের পর "জ্যোতিতে জ্যোতি মিলাও"—বৃহৎ জ্যোতিতে পরিনির্বাণ, এই তাদের ভাব।

আবার ভক্তের দৃষ্টি একটু অন্যরকম। তারা বলেন, যিনি লোকোত্তর তিনিই বিশ্ব-প্রপঞ্চে বিলসিত। তাহলে বিশ্বপ্রপঞ্চের মালিককে আমার মত করে পেতে পারি। ভক্তিতে এই রূপের উপাসনা জীবাত্মার মুক্তির পথ। বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তভ জীবন অবস্থা; নির্বাণজ্যোতি ওই বিষ্ণু, তাঁরই হৃদয়ে জীবাত্মারা (colony of soul), বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তভরূপে দ্যুতিমান, এ-ই হল প্রজ্ঞা। তিনি যেমন বিশ্বাতীত, তেমনই বিশ্বরূপ, তাই এই বিশ্বের সার্থকতা। তাঁকে আস্বাদ (সম্ভোগ) করতে চাই, "চিনি খেতে চাই চিনি হতে চাই না", এই ভাব নিয়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে একটু ভেদ রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "অব্ হাম্ তোম্ বিলাস...", এ জীবনের দিব্য অপ্রাকৃত রূপায়ণ। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই বিলাসের অপূর্ব বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। দেহ প্রাণ মন এ সবই আছে কিন্তু তারা শুদ্ধ অহং পাকা আমিতে পর্যবসিত, তখন এ জীবনের সবই তাঁর সেবা, সব কিছু তাঁর তুষ্টির নিমিত্ত। সাধ্যের পরিসীমায় জীবের রাধাভাব আর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, এই পর্যন্ত মানবীয় সম্বন্ধ রেখেও তাঁরই সঙ্গে অপ্রাকৃত বিলাস। তাঁকে বিরহমিলনের দোলায় পাওয়া আবার হারানো, মধুর সেই প্রেমবৈচিত্ত্য।

কিন্তু অহংকে বিস্ফারিত বৃহৎ না করলে সর্বাত্মভাবের পুষ্টি হয় না, ব্রহ্মকেও পূর্ণ ভাবে জানা ও পাওয়া হয় না, তাই বিশ্বচেতনাই ব্রহ্মলাভের ভিত্তিস্বরূপ এবং অহংএর পরি-পূর্ণ মুক্তি না ঘটলে সিদ্ধি পূর্ণ হবে না। যে চেতনা উজিয়ে গেল, তাঁতে নিলে বিশে নির্গলিত নিঃশেষ করে দিন আপনাকে, আর সেই চেতনা ভাটিয়ে এলে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। অন্তরাবৃত্ত হয়ে চোখ বুজে অন্তরের গভীরে যাকে পেয়েছিলাম, বাইরে চোখ মেলেও তাঁকেই দেখছি, তা যদি না পাই, তাহলে পাওয়া পূর্ণ হল না। এই যে আবার ফিরে আসা, তার ফল হল 'আমার' গণ্ডীকে আমি একেবারে ছাড়িয়ে গেছি, নচেৎ সংসারে থেকে আর কিছু করা সম্ভবপর হয় না। "আমটি খেয়ে বুখটি বুছে কেলা" নয়, সবাইকে ভাগ দেওয়া চাই। তাই ওই অহংএর ব্যাপ্তি ও রূপান্তর যে সব কিছুর মূলে, অধ্যাত্মজীবনে তার পূর্ণ রূপায়ণ হওয়া চাই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তিনিই সব কিছু হয়েছেন, এই মহাবাক্য তখন জীবনে সার্থক করে তুললে সর্বাত্মভাব সিদ্ধ হবে। আত্মচৈতন্যকে বিস্ফারিত করতে হয় ব্রহ্মচৈতন্যে এবং সেই চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করতে হয় বিশ্বচৈতন্যে, এই হল রীতি। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—আত্মবোধের অনুভব, তা হতে পৌঁছলাম "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," এই বৃহতের বিস্ফারণে। তা হতে সিদ্ধ হয় "সর্বমাত্মৈব", এই অনুভব সম্যগ্‌জ্ঞান, তখন আত্মা ব্রহ্ম আর জগৎ এক হয়ে যায়।

তাহলে জ্ঞানের তিনটি অবস্থা ও তা থেকে তিনটি ধারা দেখতে পাচ্ছি। মূলে বা কেন্দ্রে রয়েছে আত্মভাবের অনুভব। সমস্ত অনুভবের মধ্যে একমাত্র আত্মানুভবই অপরোক্ষ। এই নিজেকে জানা, আমার যা কিছু গভীর নিবিড় নেদিষ্ঠরূপে পাওয়া, সে তো আমারই চেতনাতে। এর কি শেষ আছে? ছোট আমিতে অহংচেতনা সঙ্কীর্ণ, তাই সে পায় অল্পকে, আর আত্মচৈতন্য বৃহৎ বলে সে পায় ভূমাকে। এই জন্য বলা হয়েছে, অহংচেতনার আত্ম-চৈতন্যে রূপান্তরই গোড়ার কথা, তা থেকে ব্রহ্ম ও জগৎ, চেতনার সর্বাত্মভাব, যথাক্রমে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ও জগদ্‌জ্ঞান এই তিন দিক দিয়ে চেতনার সমীকরণ সিদ্ধ হবে সম্যক সম্বোধিতে। জগতের সব কিছু জানা তখনই সম্ভব, মিথ্যাজ্ঞান সব নষ্ট হয়ে যাবে আর তাতেই ঘটবে ব্যক্তির মুক্তি। তখন এক পক্ষপাতশূন্য ভালবাসা সমভাবে সবার 'পরে ছড়িয়ে পড়ে, সে এক পরম প্রকাশ। অনন্ত আকাশে যে হৃদয়ের প্রকাশ সেই হৃদয়ের সেই ভালবাসার আলোই ছড়িয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরে পৃথিবীকে, পৃথিবীর বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তু পর্যন্ত। একটি ধূলিকণা, তৃণ কীট পতঙ্গ থেকে বৃহৎ সৌর পরিমণ্ডল কোথাও তা ব্যাহত হয় না, অনিবার্য বিপুল সেই উদার শান্ত প্রসাদ।

তাই প্রথম অনুভবকে বলতে পারি আত্মাকে সমস্ত কিছুর অধিষ্ঠানরূপে ওই আকাশের মত সহজ দ্রষ্টা ভাবনা করা। আত্মচৈতন্যই সাক্ষী ও দ্রষ্টা, তাতে জগৎ ভাসছে। আকাশ প্রশান্ত শ্রোতস্বল ও প্রসন্ন কিন্তু আলোর সঙ্গে আঁধার ঝড় বর্ষণ বিদ্যুৎ মেঘ সবই তার বুকের 'পরে, তবুও সে অবিক্ষুব্ধ। এ অনুভব আনা বড় সহজ নয়। সেজন্য সাধনার প্রথম অবস্থায় তিতিক্ষার 'পরে জোর দেওয়া হয়। সব কিছু মৈত্রের ঝড়ঝাপটা আমার

পরে আসবেই, কিন্তু টলব না। এই অটলতার ফলই হল দেহপ্রাণমনব্যাপী এক প্রশান্তি। এই প্রশান্তিই অস্তিতা আর সেই অস্তিত্ব ব্যাপ্তিধর্মা, না হলে জগতের প্রলয় ঘটে যেত। তা যখন আছে তখন আমার অস্তিতা যুগপৎ রয়েছে কেন্দ্রে সংহত এবং পরিধিতে বিশ্বব্যাপ্ত এবং আত্মদীপই আলোকিত করছে বিশ্বকে। ব্রহ্ম জগৎ ও আমি এই তিনটি মৌলতত্ত্ব। এই তিনটির বিপরীত মুখে প্রাকৃত জীবন শুরু করা হয়। ধরা যাক, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নেই, আমি আর আমার জগৎ আছি। তা নিয়ে সাধারণ জীবন বেশ কেটে যায়, কিন্তু জগৎ বা পরিবেশ দেশ দশজন, এ থেকে আলাদা হয়ে তো সেখানে বাঁচা যায় না। কিন্তু এ ভাবেও দেশকে জানতে চাইলে, সমাজকে জানতে চাইলে বা পৃথিবীকে জানতে চাইলে অহং-এর প্রসার অনিবার্য। আর তখনই বাইরের জগৎ ও অহং-এর অতিরিক্ত আরও একটা কিছুর অস্তিত্বের আভাস স্পষ্ট হতে থাকে, আরও যেন কিছু একটা চাই। নাহলে নিজেকেও বুঝি না আর পরিবেশ বা জগৎ ভূতের মত যেন ঘাড়ে চেপে নির্বোধের মত আমাকে চালিয়ে নিচ্ছে দেখি, তা থেকে মুক্তি পাই, সে সাধ্য আমার নেই। আমি প্রকৃতির হাতের খেলনা, আমার আমি পরাভূত, চিত্ত গ্লানিতে ভরা, মনের মধ্যে সর্বদাই ভয়।

এই গ্লানি হতে মুক্তি চাইলে চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করা প্রয়োজন। চেতনার স্রোত প্রবৃত্তির খাতে বয়ে চলেছে, তাকে বাঁধ দিতে হয় তবে শক্তি বাড়ে। তখন তাকে একাগ্র ও অন্তর্মুখ করে নিলে চেতনার গভীর স্তরগুলির সন্ধান মেলে আর আত্মবোধ জাগ্রত হতে থাকে। সেই বোধ প্রাকৃত চেতনার বৃত্তিগুলি পরিশুদ্ধ করে, যার ফল সত্যদৃষ্টি। তাতে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার তখন মার্জিত হয়, চিত্তের মল অপসারিত হয়ে বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান প্রকাশ করে। সেই দৃষ্টিতে জগৎকেও সহজরূপে দেখতে পাওয়া যায় যে জগতে বিকার নয় বিভূতি, সেই পরম একেরই বহুরূপে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ। আর তখনই বিশ্বময় নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে নিজের মত করেই অপরকে ভালবাসা যায়। বিবেকানন্দ জীবের মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখতে শিখিয়ে জীবে সেবার কথা বলেছেন,—সেই "মদাত্মা সর্ব-ভূতাত্মা"। কাজেকাজেই সর্বোত্তম যে তত্ত্ব তাকে ব্রহ্মই বলি আর ঈশ্বরই বলি, তাঁকে তো জীবন থেকে ছেঁটে ফেলা যায় না। এই অবস্থায় এই বিশ্বময় আত্মবোধ জাগ্রত হলে তবেই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সম্ভবপর হবে, না হলে হাজার চেষ্টাতেও হানাহানি ক্ষয় ক্ষতি লড়াই এ সব থামানো যায় না, আর তা না থামলে জগৎ সংসার সমাজ কিছুই রক্ষা করা যায় না। তাই বলা যায়, জীবে সেবার ভিতর দিয়ে দিব্যভাব জাগ্রত হলে, সে ভাবেও আত্মজ্ঞান আত্মতত্ত্ব অধিগত করার প্রেরণা মেলে।

তাহলে, যে আমি সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ হয়ে আছে, তাকেই ছেঁটে ফেলতে হবে। প্রাণে মনে দেহে কত সঙ্কীর্ণতা, কত আড়াল, কাউকে বুঝতেই চাইনে, এতে জগৎসেবাও হয়না, মানুষকে ভালবাসাও যায়না। এই প্রাকৃত আমিকে সংশোধিত হতেই হবে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বাতীতে গিয়ে আত্মস্বরূপকে জানতে ও পেতে হবে। যেমন

নিজেকে, তেমন বিষয়রূপে বিশ্বে সব কিছু যা ভাসে সমস্তকে ছাপিয়ে ছেড়ে যেতে হয়, তা না পারলে বৃহতের প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হবে না—"সব ছোড়ে সব পাওয়ে"। অহন্তার সঙ্কোচ হতে মুক্ত হলে আত্মচৈতন্য বৃহৎ হবে এবং সেই বৃহৎ চৈতন্য জগৎকেও আবৃত করবে—"অহং ব্রহ্মাস্মি," এই তো আমাদের পরম পুরুষার্থ। তাহলে দেখছি, যে আত্মচৈতন্য বৃহৎ হতে গিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়—অতিষ্ঠা, সেই আবার ফিরে আসে বিশ্বজগৎ হয়ে; তাকে তখন বলতে পারি প্রতিষ্ঠা। এইভাবে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার ভূমি লব্ধ হয়। এই উড়িয়ে যাওয়া আর ভাসিয়ে আসা, আরোহণ ও অবরোহণের দ্বারা অধ্যাত্মসাধনার পরিক্রমা পূর্ণ হয়।

তারপর এই সর্বাত্মভাব যখন খোলা চোখেই দেখতে পাব, দেহ প্রাণ মন সক্রিয় হয়ে উঠবে, তখন এই অনুভবের বীর্য প্রকৃতিতেও রূপান্তর ঘটাবে। কেননা যেখানে গিয়ে অধিষ্ঠান আত্মচৈতন্যকে পেয়েছিলাম সে অনুভব ছিল বিবিক্ত। বিশ্বের অধিষ্ঠান ও বিশ্বের স্পন্দন মূলে যে একই চৈতন্য এখন এই দর্শন আমার আত্মদর্শনকেও পরিপূর্ণ করেছে। চৈতন্য আর শক্তি পৃথক নয়, বস্তুপই রূপে রূপে রূপায়িত, তাই ভূতে ভূতে কোনও বৈষম্য ব্যবধান নেই। বিশ্বচৈতন্য প্রকাশিত চৈতন্যেই স্পন্দিত। আমার সর্বভূত শুধু আছে নয়, হচ্ছেও। বলা যাচলা আমার এ আমি তখন আর আগেকার অহং নয়, কেননা অহং নিজেকে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় না। আবার এ আমি সাক্ষীচৈতা কূটস্থ আত্মসত্তা শুধু নয়, এ আমি অন্তরপুরুষ অন্তর্যামী সূত্রাত্মা। ব্রহ্মে যুগপৎ দুটিই বিধৃত, তেমনি আত্মা ও জগৎ ব্রহ্ম হয়ে কালাতীত ও কালের প্রবাহে অধিষ্ঠিত ও স্পন্দিত। যুগপৎ এই অনুভবে ব্রহ্মচৈতন্য ও আত্মচৈতন্যের সমীকরণ হবে।

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ তখন তাঁকে বলি শূন্য অসৎ, আবার যখন সমগ্র জগদ্ব্যাপ্ত প্রকাশ তখন তাঁকে বলি সগুণ। কাজেই আত্মা ও ব্রহ্মের সমীকরণ যদি শুধু নির্গুণ ব্রহ্মেই হয়, তাহলে তো জগৎ তা থেকে বাদ পড়ে যায়। আবার যেদিকে সর্ব সব জেগে আছে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলে যদি সেই সগুণ ব্রহ্মকে শুধু বুঝে নির্গুণ ব্রহ্মকে একেবারে বাদ দিয়ে বসি তাহলে ব্রহ্ম ও জগতের সমীকরণ হতে আত্মা ও ব্রহ্মের সমীকরণ বাদ পড়ে যায়। তাই ওই সবের সঙ্গে আত্মায়ও এক হয়ে যেতে হবে। জগতে থেকেও আত্মা ব্রহ্ম এবং জগৎ তিনটি তত্ত্বের সমীকরণ করে এক হয়ে যেতে হবে। এই এক করা বড় সহজ নয়। তাই বলা হয়েছিল যে সংসার বা দেশকে ভালবাসি তখন কি জগৎ ও আমার আত্মা এক বলে অনুভব করি না? শ্রীঅরবিন্দ তাই দেখালেন যে অহংএর বন্ধন থেকে মুক্ত হলে দেহ প্রাণ মনের সঙ্কীর্ণতা থাকে না কিন্তু জগতে মিলতে গিয়ে পুঞ্জীভূত যে সব বন্ধন দেখতে পাই। তখন যদি সে বাসনার মোটে মিলতে না চাই, সেটা হল বৈরাগ্যবাদের কথা। তখন জগৎ তুচ্ছ বোধ হয়। সিদ্ধদের মধ্যে অনেকে জগৎকে যেমন বাদ দিয়ে চলেন, তেমনি জীবের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মকে ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দিয়েও বেশ চলতে পারে। এই দুদিকেই অপূর্ণতা রয়েছে, দুয়ের সংশোধনে জ্ঞান পূর্ণ হয়। কিন্তু যদি পূর্ণ জ্ঞান

সমাক্ সম্বোধি চাই, তাহলে জগৎ ছাপিয়ে ওই শূন্যকে নির্গুণকে যেমন জানতে হবে, তেমনই বিশ্বজগতে সবার মধ্যে সেই অন্তর্যামীকে তাঁর সগুণকেও জানতে হবে। শূন্য ও পূর্ণ উভয় মিলে পূর্ণকাম। "ঈশ্বরকে কেউ দেখেনি, তবে বোধে বোধ হয়", এ সিদ্ধান্ত নেতিবাদের পক্ষে; আবার তাঁর "কল্যাণতম রূপ" দর্শন করা, "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে", এ-ও আছে। রূপের ধ্যানে রূপাই ঈশ্বর। অস্তি ভাতি প্রিয় বিশ্বরূপ তো তিনিই, দেহ প্রাণ মন সবই তাঁতে, তাঁরই এ-সব—ইতিবাদের কথা। তাই অরূপে রূপে বিশ্বরূপে তাঁকে মেলাতে পারলে সমাক্ দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা পাওয়া, চোখে দেখা, কানে শোনা মনে প্রাণে অনুভব, এ সবই তো আছে। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, যেমন তাঁর সঙ্গে সমতা চৈতন্যে তেমন তাঁর প্রকৃতিতেও সমতা হয়, তাঁরও হাত পা মুখ সবই আছে। সব ইন্দ্রিয় ও শক্তি তো তাঁরই। সহস্রশীর্ষা পুরুষ তিনি, সকলের শীর্ষ পাণি পদ চক্ষু ইন্দ্রিয় সব তো তাঁরই মধ্যে। তেমন আবার এ সব ছাপিয়েও তাঁর মহিমা অনন্তে বিস্তৃত—"অত্যতিষ্ঠ দশাঙ্গুলম্"। এই ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি সর্বতোভাবে তাঁরই ভেতরে রেখেছেন মাত্র তাঁর দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানে, সমগ্র জগৎ তাঁর একটি অংশমাত্র। এই রকম করে দুদিক দিয়েই যে অখণ্ড জ্ঞানের সংবর্তন অনুভব, তাই বিশ্বচেতনার জ্ঞান, সর্বাত্মভাব। শূন্য ও পূর্ণের বোধ একই সঙ্গে বোধে আসা চাই। বিশ্ব ছাপিয়ে তিনিই অতীন্দ্রিয় বোধে, আবার তিনিই বিশ্বরূপ পুরুরূপ, মন দিয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধেও তিনি—এই হলে বিশ্বাত্মভাবের কথা বলতে পারি।

তাহলে দেহ-প্রাণ-মনের বন্ধনমুক্তি হলে সাধনা কিরকম হবে? বন্ধন কাটাতে আদেশ দিয়ে এই প্রসঙ্গে তার পূরণ করে দিয়েছেন। "অতিতো ব্রহ্ম নির্ধাপন্" সব দিক দিয়ে ব্রহ্মজ্যোতি আলোর প্লাবন নেমেছে, সেই আলোই সত্তা। তা দিয়ে এই সর্বকেও আলোকিত কর, এই বিমুখী গতি একই সঙ্গে চলুক। সারাদিন তোমারই কর্ম করে সন্ধ্যায় যেমন বিরামের সময় শুধুই তুমি, তোমার কাছে গিয়ে বসব, তোমাতে ডুবে যাব। তেমনি একটা সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে সব কিছু বিষয় হতে চেতনাকে গুটিয়ে নিতে হবে, তখন শুধুই সত্তামাত্র নিয়ে থাকা, আত্মা বা ব্রহ্মের অনুভবে একাকার—তীব্র সে অনুভূতি! সারাদিন তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম, এরই স্মরণ মনন চলেছে সব কর্মের ভেতর দিয়ে, আবার ঘুমের মধ্যেও এই ভাব ধরা থাকলে হয় যোগনিদ্রা, তারই গাঢ়তায় সমস্ত জীবনই যোগ। গভীর সুষুপ্তির পর যে শান্তির বোধ এই ভাবে তাকে বুঝে দেখতে পারি। আমাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী উপাসনা, মুসলমানদের নমাজ, খৃষ্টানদের প্রার্থনা, সবই ওই নিজেকে সব দিক দিয়ে গুটিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হবার সময়, বলতে পারি এ-ই তো দেবমুহূর্তের সাধনা। এসবের পরিণামে যে অবস্থা আসে, "সর্বথা বর্ততে", তাতে সাধক উপনীত হন। এই যে গুটিয়ে যাওয়া আর ছড়িয়ে দেওয়া, চেতনার সংহরণ ও ব্যাপ্তি একই সঙ্গে চলতে পারে তখন। "ত্রিষু চতুর্থং..." তিন ভূমিতেই সর্বক্ষণ তো তোমাতেই থাকি! কর্মজীবনকে মায়ুবিকার বলে যাঁরা মনে করেন, মনোতত্ত্ববিদ ফ্রয়েড্ কিন্তু তাঁদের সঙ্গে

একমত হতে পারেন নি, অবশ্য করে মানুষকে ভাল করে তোলা যদি মায়ুবিকার বলেই গণ্য হয়, তাহলে তিনিও মায়ুবিকার চান। আসলে যে ওটা বিকার নয়, একটা জাগ্রত উপস্থিতি (Presence) অনুভূত হয়, সেটা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। সেটা হল জেগে ঘুমিয়ে থাকা আর ঘুমিয়ে জেগে থাকার মত। ভালবাসা দিয়েও এটা বোঝা সহজ হয়, পূর্বরাগে যেমন প্রেমিক বা প্রেমিকার উপস্থিতি চেতনায় সদা জাগ্রত থাকে। এ কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গভীরে অনুধাবন করলে তবে বোধগম্য হবে। সূর্যের আলোয় যেমন সব দৃশ্যমান হয়, তেমনি ব্রহ্মেই সব প্রকাশ, আর সেই ব্রহ্মই আত্মচৈতন্য, আত্মা ভূমা। অহং খাঁটি হলে বিশুদ্ধ হলে এই ভাবের সাধনা শুরু করতে হয়, এই ধ্যানচিত্ত নিয়েই সর্বক্ষণ বাস করা।

তখন জগৎ সম্পর্কে দর্শন চেতনা কেমন হয়! এই আত্মচৈতন্যের আলোয় সবই ভাসে, সুখদুঃখ ভালমন্দ সব কিছুই! তাতে বিরাগও নেই অনুরাগও নেই, জগতে কত কি ঘটে যায়, তাতে বিচলিত হইনে, উদাসীন তটস্থ ভাব! আয়নায় যেমন ছায়া পড়ে, তেমনি চলমান সব কিছুর ছায়া আমার মধ্যে ছবির মত পড়ছে কিন্তু চিত্তে কোনও বিকার হচ্ছে না। এই গুণাতীত অবস্থা খুব বড় কথা, এ অবস্থায় বাইরের কোনও বিষয় বিক্ষোভের কারণ হতে আর পারে না। অনেক সময় জগৎ সম্পর্কেও কোনও খেয়াল থাকে না, চোখ মেলে যেন তাকানোই যায় না বাইরের দিকে, এমন ভাবে তিনি ভর করে থাকেন (Possessed by God)। সংসার করাও ভার মনে হয়, জগৎ অনেক দূরে সরে গেছে, এক স্বপ্নের অবস্থা। এ ধরণের ভাব কখন কোনটা আসে তা ঠিক করে বলা যায় না। কখনও বিবিক্ত উদাসীন, কখনও তটস্থ! আবার জগতের অস্তিবোধ হয় না, এ সব বিভ্রমও আছে। প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ এসে পড়ে, তাও হয়। এ সবের পরে আসে পক্ষপাতশূন্য এক বোধ, আবার তাতে আনন্দও পাই, হা হা করে হাসি; এইরকম বিচিত্র অনুভূতিতে সত্তার বুকে ভাবসব খেলে যায়। তারপর আবার ভালও লাগে, উদাসীন ভাবে শুধু দেখা নয়, খেলার মধ্যেও নেমে পড়ি! সবার মধ্যে যখন তাঁকে দেখি, সে যে কি গভীর মধুর অনুভব! তাঁকে অন্তর্যামীরূপে দেখে ও অন্তরে পেলে তবেই ভাব স্বভাব হয়। আচরণ স্বাভাবিক হয়ে আসে। রামকৃষ্ণদেবের দর্শনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, "এ কি! এ যে ন্যাংটা লেগেছে।"

বৌদ্ধধর্মে প্রশ্ন আসে চৈতন্য চলেছে কোথায়? তখন এক মার্গ বা পথ আবিষ্কৃত হয়, আর্যমার্গ। সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে তাঁরা জগতে ফিরে এসে আবার সকলকে সেই পথে নিয়ে চলেন। জাগ্রত চেতনার এই দায় বিশ্বাত্মভাবের মূল কথা, পুরুষকে জানলেই শুধু হল না, প্রকৃতিকেও জানা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির স্পন্দনে স্পন্দিত ছন্দে ছন্দিত হয়ে চলা সর্বাত্মভাব। সাধক তখন বিশ্বপথিক। বহু কোষের সমবায়ে যেমন এক দেহ, তেমন বহু জীবের সমবায়ে এক বিরাট বিশ্বরূপ পরম আত্মভাবের চিন্ময়নবিগ্রহ।

আত্মচৈতন্যের সর্বাত্মভাবের পরিণামে যে তিনটি ধাপ দেখলাম, তাদের অতিমানসের

ত্রিপুটি বলেও বর্ণিত হয়েছে। আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন, সর্বভূতে আত্মার দর্শন এবং সর্বভূতকে আত্মরূপে দর্শন। তিনটিই অদ্বৈতানুভব এবং জগৎ এখানে মিথ্যা নয়, সত্য এ-দর্শন নিত্যজাগ্রত ভূমির বা সহজ সমাধির দর্শন, নাহলে সর্বভূতের কথাও আসত না। এই পরিপূর্ণ অদ্বৈতের ভাবনা নিয়ে বিশ্বাত্মভাবের সাধনা চলতে পারে। তখন দেখা যাবে দেহ প্রাণ মন এরা তো আলাদা-আলাদা নয়, সবই চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ। সবার ভাবনা বেদনা যেমন আমারই ভাবনা বেদনা, তেমন এই দেহের যন্ত্রও যে বিশ্বদেহের সঙ্গে একই নিয়মে চলমান, তাই বিশ্বের সুখদুঃখের দোলা এই দেহতেও অনুক্ষণ অনুরণিত, তারই স্পন্দে স্পন্দিত। বাহিরে সব যেন আলাদা আলাদা কিন্তু জলের অতলে সব যে একই সমুদ্র-হৃদয়ের আন্দোলন। ছোট আমির সঙ্গে ছোট আমির বিরোধ কিন্তু যে আমি বৃহৎ সর্বগত তার কারও সঙ্গে বিরোধ নেই, সবার সঙ্গে এক। সর্বাধার সর্বগত চিন্ময় চিদ্ঘন হয়ে নিখিলের অন্তরঙ্গ আস্বাদন—এই অদ্বৈতের উপলব্ধি বিশ্বাত্মভাবেরই চরম কথা।*

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

আপনার সঞ্চয়

—তা যত অল্প
বা বেশি হোক না কেন
তার থেকে
আপনার আয়

আরও বাড়িয়ে তুলুন

UIB

কয়েকটি
পরিকল্পনা

৭½%
সুদ দেওয়া হবে
৫ বছরের অধিক মেয়াদী
ফিক্সড্
ডিপোজিটে
লগ্নী করুন।

প্রতি মাসে ১০৲
সঞ্চয় ক'রে ৭ বছর
পর ১০৯৫৲
রেকারিং ডিপোজিট
এ্যাকাউন্ট
খুলে দেতে পারেন।

১০০৲ টাকার
ক্যাশ সার্টিফিকেট
কিনলে
২০ বছর পরে
৪২৫৲ টাকা
পাবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১৩
টেলিফোন ঃ ২৩-১৭৮৪ (৩ লাইন)

Progressive/UIB-13/70

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

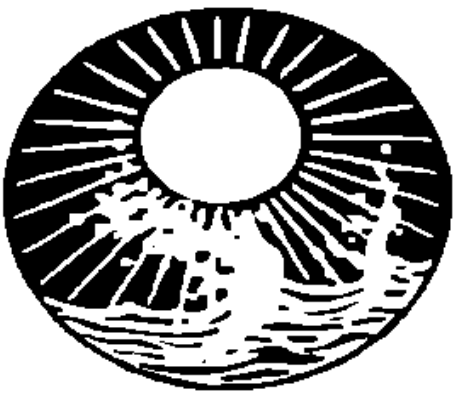

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ঋগ্বেদ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৫
সাবিত্রী	...	...	১০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	...	১২
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...	...	১৯
মায়ের সঙ্গে কথা—	শ্রীমা	...	২২
পথের কথা	শ্রীমা	...	৩২
শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতাব্দীপূর্তি উৎসবে ভাষণ	গৌরী ধর্মপাল	...	৩৪
হিরণ্ময় পরিক্রমা	হিমাংশু নিয়োগী	...	৪৩
কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু	...	৪৮
নিশিকান্তর অনুবাদ-কবিতা	...	...	৫৩
নিশিকান্তর একখানি পত্র	...	...	৬৮
কবি নিশিকান্ত	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৭০
টুকরি (কাব্য-সংগ্রহ)	নিশিকান্ত	...	৭৬
নিশিকান্ত ও কাব্যে নবধারা	সমীরকান্ত গুপ্ত	...	৮৪
কবিদা'র জীবনের কিয়দংশ	স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়	...	৮৯

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	,,	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	,,	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	,,	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: **Sri Aurobindo Pathamandir**
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: **Amiyo Ranjan Ganguli**
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

Freedom does not
come from outer
circumstances but
from inner liberation.
Find your soul,
unite with it, let
it govern your life
and you will be free
always

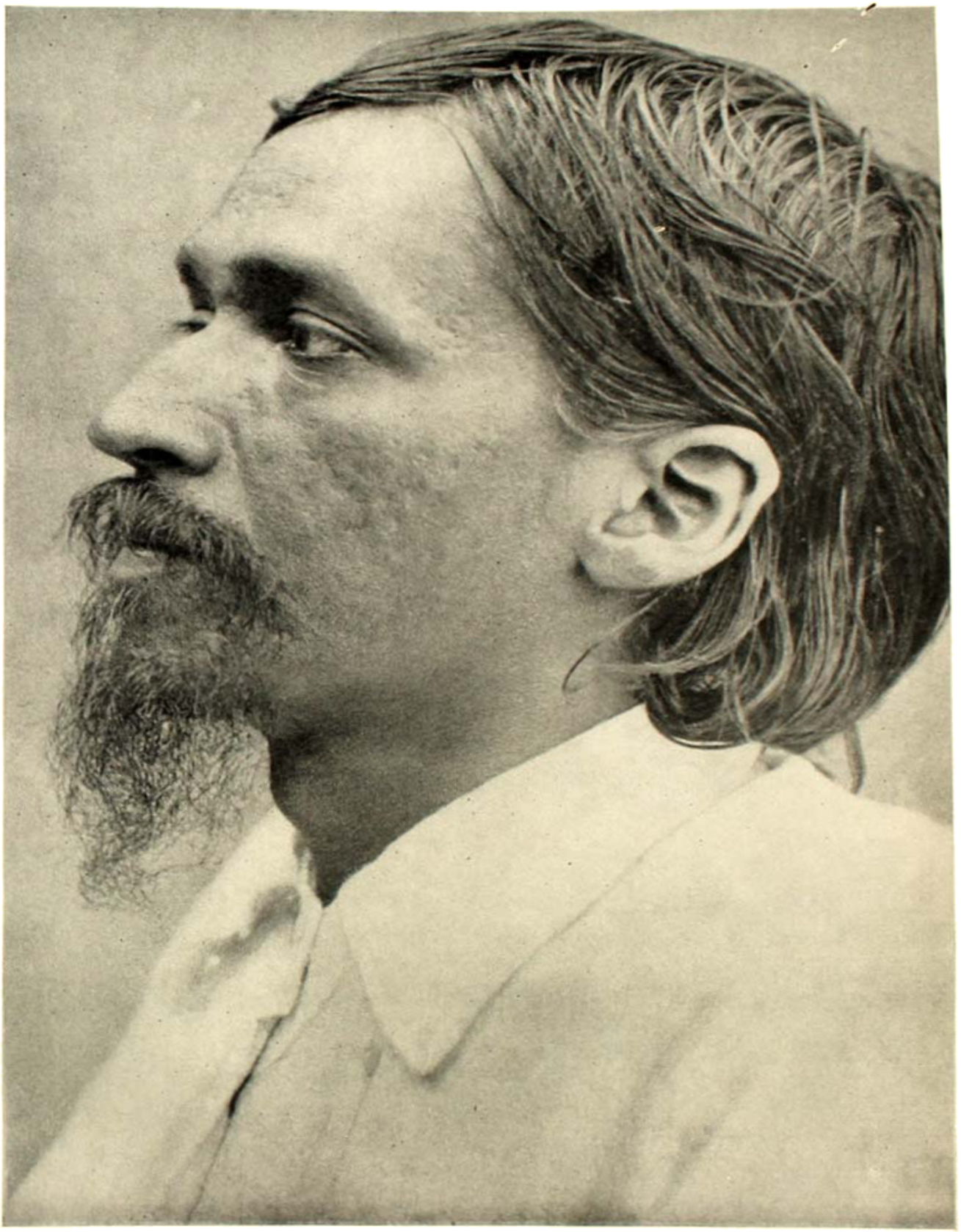

শ্রীঅরবিন্দ, আলিপুর জেল,

ঋগ্বেদ

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—একাদশ সূক্ত

১। জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বিভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ॥১॥

জনস্য—জনগণের, মানুষ সকলের
গোপাঃ—রক্ষক
অজনিষ্ট—জন্মিল
জাগৃবিঃ—জাগ্রত, "সদাপ্রবুদ্ধ" (সায়ণ)
অগ্নিঃ—অগ্নি
সুদক্ষঃ—সম্যক বিবেকবান বা বিবেকশীল
সুবিতায়—সুষ্ঠু গমনের জন্য, শুভযাত্রার জন্য
নব্যসে—নবতর
ঘৃত-প্রতীকঃ—প্রোজ্জ্বলদর্শী, দীপ্তানন
বৃহতা—বৃহৎ (আশ্রয়)
দিবিস্পৃশা—স্বর্গস্পর্শী
দ্যুমৎ—দীপ্তিমান
বিভাতি—উদ্ভাসিত হয়েছে
ভরতেভ্যঃ—ভরত নামক ঋত্বিকদের জন্য বা দানকর্তাদের জন্য
শুচিঃ—শুভ্র

মানুষের রক্ষক সদাজাগ্রত পূর্ণবিবেকবান অগ্নি জন্মগ্রহণ করল তার নবতর সুপথযাত্রায়। প্রজ্বলিত আনন তার বৃহৎ-সত্তা স্বর্গকে স্পর্শ করেছে, জ্যোতির্ময় সে, শুভ্র সে, ভরতকুলের জন্য (আহুতি নিয়ে আসে যারা তাদের জন্য) সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ॥১॥

২। যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমীধিরে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ ।২॥

যজ্ঞস্য—যজ্ঞের
কেতুম্—প্রজ্ঞান

প্রথমম্—প্রথম, আদি
পুরঃ হিতম্—পুরোধাকে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
নরঃ—মানুষেরা
ত্রি-সধস্থে—স্থানত্রয়ে
সম্—সম্যক
ঈধিরে—প্রজ্বলিত করেছে
ইন্দ্রেণ—ইন্দ্রের সঙ্গে
সরথম্—একরথে
সঃ—সে
বর্হিষি—কুশাসনে
নি+সীদৎ—আসনগ্রহণ করে যেন
হোতা—আহ্বায়ক
যজথায়—যজ্ঞের উদ্দেশ্যে
সুক্রতুঃ—দৃঢ়সঙ্কল্পী

যজ্ঞে প্রজ্ঞানরূপী যিনি, পুরোভাগে স্থিত যিনি, সেই অগ্নিকে মানুষেরা লোকত্রয়ে সম্যক প্রজ্বলিত করে, ইন্দ্রের সঙ্গে, দেবতাদের সঙ্গে একরথে এসে যজ্ঞাসন গ্রহণ করেছে সে, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প নিয়ে সে হয়েছে আহ্বায়ক হোতা ॥২॥

৩। অসংঘৃষ্টো জায়সে মাত্রোঃ শুচির্মন্দ্রঃ কবিরুদতিষ্ঠো বিবস্বতঃ।
ঘৃতেন ত্বাবর্দ্ধয়ন্নগ্ন আহুত শ্রয়ন্তে কেতুরভবদ্দিবি শ্রিতঃ ॥৩॥
অসংঘৃষ্টঃ—অক্লিষ্ট, বিনাক্লেশে
জায়সে—তুমি জন্মগ্রহণ করেছ
মাত্রোঃ—মাতৃদ্বয় হ'তে
শুচিঃ—শুভ্ররূপে
মন্দ্রঃ—আনন্দময়
কবিঃ—সাক্ষাৎদ্রষ্টা (মেধাবী—সায়ণ)
উৎ+অতিষ্ঠঃ—উদয় হয়েছ তুমি
বিবস্বতঃ—সূর্য্য হতে
ঘৃতেন—গাঢ় স্বচ্ছতা দিয়ে
ত্বা—তোমাকে
অবর্দ্ধয়ন্—বর্দ্ধিত করেছে
অগ্নে—হে অগ্নি
আহুত—তোমাকে (যাকে) আহুতি অর্পণ করা হয়েছে

ধূমঃ—ধূমরাজি
তে—তোমার
কেতুঃ—প্রজ্ঞান
অভবৎ—হয়ে উঠেছে
দিবি—দ্যুলোকে
শ্রিত—আশ্রয়লাভ করে

মাতা যুগলের হতে তুমি শুচিশুভ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি আনন্দময়, সাক্ষাৎদ্রষ্টা তুমি, সূর্য্য হতে তুমি উৎসারিত হয়েছ, হে অগ্নি, স্বচ্ছতার ধারাবর্ষণে তারা তোমাকে বর্দ্ধিত করেছে, তোমাতে আহুতি অর্পিত হয়েছে, তাই তোমার ধূমরাজি প্রজ্ঞান হয়ে উঠেছে, স্বর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ॥৩॥

৪। অগ্নির্নো যজ্ঞমুপ বেতু সাধুয়াগ্নিং নরো বি ভরন্তে গৃহে গৃহে।
অগ্নির্দূতো অভবদ্ধব্যবাহনোঽগ্নিং বৃণানা বৃণতে কবিক্রতুম্ ॥৪॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
নঃ—আমাদের
যজ্ঞম্—যজ্ঞ
উপ+বেতু—এসে যেন উপস্থিত হয়
সাধুয়া—সর্ব্বার্থসাধক (সায়ণ), সাধনশক্তিসহ
অগ্নিম্—অগ্নিকে
নরঃ—মানুষেরা
বি+ভরন্তে—বহন করে চলে
গৃহে-গৃহে—গৃহে গৃহে
অগ্নিঃ—অগ্নি
দূতঃ—দূত
অভবৎ—হয়ে উঠেছে
হব্যবাহনঃ—আহুতি-বাহক
অগ্নিম্—অগ্নিকে
বৃণানাঃ—বরণ করে যারা
বৃণতে—তারা বরণ করে
কবিক্রতুম্—দ্রষ্টা ইচ্ছাশক্তিকে

অগ্নি আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকে যেন তার সাধনশক্তি নিয়ে, মানুষেরা অগ্নিকে

নিয়ে গৃহে গৃহে বিতরণ করে ; অগ্নি হয়ে উঠেছে আহুতিবাহক ঘৃত, অগ্নিকে যারা বরণ করে তারা বরণ করে এই দ্রষ্টা ইচ্ছাশক্তিকে ॥৪॥

৫। তুভ্যেদমগ্নে মধুমত্তমং বচস্তভ্যং মনীষা ইয়মস্ত শং হৃদে।
যাং গির: সিন্ধুমিবাবনীর্মহীরা পৃণন্তি শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥৫॥

তুভ্য—তোমাকেই, তোমারই উদ্দেশ্যে
ইদম্—এই
অগ্নে—হে অগ্নি
মধুমৎ-তমম্—মধুরতম
বচ:—বাক্য
তুভ্যম্—তোমারই উদ্দেশ্যে
মনীষা—মনীষা
ইয়ম্—এই
অস্তু—হয় যেন
শম্—প্রীতিকর
হৃদে—তোমার হৃদয়ে
যাম্—তোমাকেই
গির:—বাক্য
সিন্ধুম্ ইব—সিন্ধুকে যেমন
অবনী:—নদীসকল
মহী:—বিপুল
আ+পৃণন্তি—পূর্ণ করে তোলে
শবসা—আপন বলে
বর্ধয়ন্তি চ—আর বৃদ্ধিসাধন করে, বর্দ্ধিত করে

তোমারই উদ্দেশ্যে, হে অগ্নি, এই মধুরতম বাক্য, তোমারই উদ্দেশ্যে এই মনীষা, তোমার হৃদয়ে শান্তি হয়ে ওঠে যেন তা ; বাক্‌রাজি তোমাকে পূর্ণ করে ধরে, সাগরকে পূর্ণ করে যেমন বিপুল জলধারা, আর আপন বলে তাকে বর্দ্ধিত করে ধরে ॥৫॥

৬। যামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দচ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে।
স জায়সে মথ্যমান: সহো মহত্‌যামাহু: সহসস্পুত্রমঙ্গির: ॥৬॥

যাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি

অঙ্গিরসঃ—অঙ্গিরা ঋষিরা
গুহাহিতম্—গুহায় নিহিত
অনু-অবিন্দন্—আবিষ্কার করেছে
পিপ্রিয়াণম্—আশ্রয় গ্রহণ করে
বনে বনে—বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে
সঃ—সেই তুমি
জায়সে—জন্মগ্রহণ কর
মথ্যমানঃ—মন্থিত হয়ে
সহঃ—(সহসা—সাধন), বলের সহায়ে, শক্তিমান
মহৎ—বিপুল, মহান
ত্বাম্—তোমাকে
আহুঃ—তারা বলে
সহসঃ—বলের, শক্তির
পুত্রম্—পুত্র
অঙ্গিরঃ—হে অঙ্গিরা

তোমাকে, হে অগ্নি, অঙ্গিরা-ঋষিরা আবিষ্কার করলে গুহার মধ্যে নিহিত, বন হতে বনের মধ্যে তুমি নিয়েছ আশ্রয়, মন্থিত হয়ে সেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ শক্তিমান হয়ে, মহান হয়ে, তাই শক্তির পুত্র তোমাকে বলে তারা, হে অঙ্গিরা ॥৬॥

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—দশম সর্গ

ওই সব উদ্ভাসন রাজ্যে হ'ল মনের প্রথম অগ্রগামী পদক্ষেপ।
অজ্ঞানে পূর্ণ, পূর্ণ হ'তে চায় সে জ্ঞানে।
এখান হ'তে আরম্ভ তার কৌতূহলী মনের জিজ্ঞাসা :
খুঁজে চলে সর্ব্বদা, চারিভিতে যা কিছু রূপ—মুষ্টিগত করতে চায় আপনার,
সর্ব্বদা আশা তার মহত্তর কিছু আবিষ্কার করবে সে।
উদ্‌গ্রীব সে স্বর্ণপ্রভ উদয়ের অরুণ-শিখার,
জাগ্রত সে নব আবিষ্কারের প্রান্ত ধরে চলে।
তবু সব ক্রিয়াকর্ম্ম তার শিশুর পরিমাপে,
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন নবজাতকের খেলা,
মন-প্রাণ হ'ল আসুর-শিশুর পুতুল।
কাজ করে একটা নকল দুর্গ গড়ে তোলা হয় যেমন করে,
অদ্ভুত ভাবে স্থির তা ক্ষণিকের জন্য,
বালুকা দিয়ে গঠিত তা মহাকালের সৈকতে,
অদৃশ্য শাশ্বতের অপার সাগরের কোলে।
মহাশক্তি বরণ করেছে এই যন্ত্রটি ক্ষুদ্র অথচ শাণিত,
পরম আবেগে অনুসরণ করে চলে সে শ্রমসাধ্য ক্ষণিক বিলাস এক ;
অজ্ঞানের শিক্ষাদান এই গুরুভার নিয়েছেন তিনি,
তাঁর চিন্তার সূত্রপাত আদিম নিশ্চেতন শূন্য হ'তে,
নিজে শিক্ষা করে শিখাতে হবে তাঁকে
জ্ঞান জাগাতে হবে তার নিদ্রালু কন্দর হতে।
জ্ঞান কভু আসে না অতিথির মত আমাদের কাছে,
আসে না আহূত হ'য়ে আমাদের গৃহে বাহির হ'তে ;
আমাদের গোপন সত্তার অন্তরঙ্গ সখা সে,
লুকায়ে ছিল আমাদের মনোবৃত্তির পশ্চাতে, ছিল সে সুষুপ্ত :
ধীরে জেগে উঠেছে প্রাণের তপ্ত তেজের স্পর্শে :
বিপুল যক্ষ এই যে রয়েছে অন্তরে রূপহারা হয়ে
জাগরণ তার, তাকে রূপদান হ'ল প্রকৃতির কাজ।
সত্য মিথ্যা মিশে সব রয়েছে একটা বিশৃঙ্খলা।
মন খুঁজে বেড়িয়েছে নির্জ্ঞানের গভীর কুজ্ঝটিকার মাঝে,
নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করে কিন্তু দেখে না ভগবান।
একটা স্থূল তাৎকালিক কৌটিল্যনীতি

সত্যকে অস্বীকার করে ক্ষণিকের সব সত্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য,
দেবসত্তাকে লুকিয়ে রাখে অনুশাসনের মধ্যে অনুমানের মধ্যে
যাতে বিশ্ব-অজ্ঞান ক্রমে জ্ঞানবান হয়ে ওঠে।
এই অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে সর্ব্বশক্তিমান মনোময় পুরুষ :
যখন সে তার সদ্য-আলোকিত পর্ব্বত-চূড়া হ'তে তাকিয়ে দেখে রাত্রির অন্ধকারে,
নিশ্চেতনার উপরে যখন হয় তার প্রথম হস্তক্ষেপ :
অপরিচিত এই অন্ধকার ব্যাহত করে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি ;
ত্বরান্বিত হস্ত তাঁর কাজ করতে শিখবে সাবধানী উৎসাহে :
পৃথিবী সদা করে শুধু নয়র অগ্রগতি।
তবুও শক্তি তাঁর দৃষ্টিহীন পৃথিবীর মত নয় :
পৃথিবীকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয় অযোগ্য যন্ত্র যত,
প্রাণশক্তি আর স্থূল দেহ আবিষ্কার করেছে যাদের :
পৃথিবীর অনুভব সব অনিশ্চিত আলেখ্যের আশ্রয়ে,
ধারণা সব তার বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাতের অনুমান :
ক্ষুদ্র দীপ যত জ্বালিয়েছে সংশয়াকুল চিন্তার স্পর্শ।
নাই তার অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ আন্তরদৃষ্টি,
দেখে সে চলে ক্ষণিক স্ফুরণে জ্ঞানচূর্ণ যত, গেঁথে রাখে তাদের একসঙ্গে ;
সত্যকে ক্রীতদাসী করে রাখে তার আপন দারিদ্র্যের সেবায়,
বহিষ্কার করে দেয় প্রকৃতির নিগূঢ় একত্ব,
এই যে চলন্ত বিশ্বসত্তা কেটে ধরে তাকে অণুর মাত্রায় আর ভারের ওজনে ;
মাপকাঠি তার হ'ল আপনার অজ্ঞান।
আপনার রাজ্যে আপনি দ্রষ্টা ও ধর্ম্মাধিপতি,
বৃহত্তর সেই মহাশক্তি আপনার অর্দ্ধ-উদিত সূর্য্যের আলোকে
কাজ করে চলেন সীমাবন্ধনীর মাঝে, তবু আপনার ক্ষেত্রপতি তিনি ;
চিন্তাশক্তির অধিকার পেয়েছেন তিনি, তারই বলে পেয়েছেন জ্ঞান ;
দাবী এখন তাঁর শৈশব-দৃষ্টির একচ্ছত্র শাসন।
তাঁর চোখে জলে, যতই আঁধার ঘেরা হোক,
সেই দেবতার দৃষ্টি জানে যে তার কর্ম্মাবলী অনুপ্রেরণার বশে :
একটা জগৎকে গড়ে তোলে সুদূরদর্শী আপন শিখার আলোকে।
আপন রাজ্যে তাঁর হয় না পদস্খলন হয় না ব্যর্থতা,
তবে বিচরণ তাঁর সূক্ষ্ম এক শক্তির সীমানার মাঝে
মন তাকে পার হয়ে যেতে পারে সূর্য্যের অভিমুখে।
প্রার্থী সে এক উর্দ্ধতর আধিপত্যের পদে,
পথ তিনি কেটে ধরেছেন রাত্রি হতে জ্যোতির দিকে,
খোঁজ করেন তিনি অনধিগত এক বিশ্বজ্ঞান।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩২)

আত্মার বিভাব (Modes of Self) প্রসঙ্গে কূটস্থ আত্মা বা আত্মসত্তা ও জীবাত্মা যথাক্রমে Self ও Soul এ দুটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ বুঝে দেখতে হবে। কূটস্থ আত্মা, যিনি আছেন অধিষ্ঠান বা পটভূমিকারূপে, তিনি নৈর্ব্যক্তিক। আর জীবের আত্মার শক্তির লীলা চলে। জ্ঞানযোগের সাধনার লক্ষ্য ওই Self বা আত্মার নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নিয়ে, বেদে তাঁকেই বলা হয়েছে পুরুষ। প্রকৃতি যেমন ত্রিগুণা, তেমনি আত্মার বা পুরুষেরও তিনটি আত্মানুভব দিয়েই আত্মার বিভাব জানতে হয়, কিন্তু কূটস্থ অচল ধ্রুব অপরিণামী অপরিবর্তনীয় যে আত্মা, তার আবার বিভাব কি এই প্রশ্ন প্রথমেই আসে। আবার সেই আমিও অনুভবে নৈর্ব্যক্তিক। শেষ পর্যন্ত এক পুনো যেন পর্যবসিত। যখন গতিমুখ উজানে এ বিচার তখনকার সত্য। আত্মাকে বা মুক্ত আমিকে বুঝতে হলে জীব ও জগৎ ছাপিয়ে যেতে হয়। আত্মানুভব সত্য হলে, গাঢ় ও নিবিড় হতে থাকলে—জানা যায় আত্মা বা ব্রহ্মই জীব হয়েছেন জগৎ হয়েছেন। এ যদি না স্বীকার করতে চাই না জানি, তা হলে তো তাঁকে পুরুষ বা তাঁর বিভাব বলতে পারি না। জীবজগৎ ছাপিয়ে ব্রহ্ম সব থেকে আলাদা—একথা বললেই মনে হয় তিনি যেন জীবজগৎ-নিরপেক্ষ। কিন্তু এ অনুভবও গভীর হতে থাকে। তার পরিপাকে সামগ্রিক উপলব্ধি যখন আসে, তখনই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি সম্যক্ প্রতিবোধ জাগে। বিভাবগুলিও পূর্ণতর সুডৌল হয়ে ওঠে।

স্থির শাশ্বত চিন্ময় অধিষ্ঠান তত্ত্ব ও আত্মবোধ বিশ্বাতীত তুরীয় কালের অতীত হয়ে সেই বোধ যেমন আছে, তেমনি সেই সত্তাই কালকে কলিত করে কালের প্রবাহে সৃষ্টির পর্বে পর্বে নেমে এসেছেন। কালধারার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্ববোধে নিজেকে মেলে ধরেছেন তাঁর শক্তিতে। তাই জীবচেতনা যখন বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত হবে, তখন তা থেকেই সর্বাত্মভাব আসবে। আর অপন আত্মাকেই ঐ চিন্ময় অধিষ্ঠান-তত্ত্ব বলেও জানা যাবে। চেতনাকে বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে জানা জ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ। আবার চেতনাকে গুটিয়ে নিয়ে যে জানছে তাকে যখন জানি, সেই জ্ঞান হল তারও পরের জানা। নিজেকে দেখতে গিয়ে গভীর অতলে যখন দৃষ্টি চলে যায়, তখন দেখতে পাই চঞ্চল মনের অধিষ্ঠান ঐ স্থির অচঞ্চল বোধ। এই বোধই বিজ্ঞান। তাতে আছে এক স্বচ্ছ প্রসন্ন ভাব। সব ভাব মিলিয়ে সুনিবিড় অস্তিত্বের বোধই আত্মবোধ।

এ বোধ প্রসন্ন শান্ত স্থির কিন্তু বিদ্যুৎগর্ভ। তাই সে আবার শক্তিতে টলমল ভরপুর। আত্মবোধের পরিব্যাপ্তিতে ব্রহ্মের বোধ। ব্রহ্মই সব হয়েছেন। জীবজগৎ যেমন হয়েছেন, তেমন সব ছাপিয়েও তিনি। আত্মশক্তিকে দাবিয়ে রাখার যে শক্তি তাও শক্তি। আবার শুধু অন্তরাবৃত্তিতে কেন, চেতনার প্রকাশে বহিরাবৃত্তিতেও আত্মবোধ অচল থাকে। "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" এ-বোধ যেমন আমার অস্তিত্বের গভীরে, তেমনি সবার সব

কিছুর গভীরে। কেননা আমার আত্মকেন্দ্র বিশ্বেরও নাভিমূল। তাই আত্মবোধ আর ব্রহ্মবোধ এক, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। ব্রহ্মই সব হয়েছেন, কিন্তু হয়েও তিনি ফুরিয়ে যাননি। সব ছাপিয়ে সবাইকে অতিক্রম করে তিনি আছেন নির্বিশেষ হয়ে। তাই বলে সেখানেও তিনি নিঃশক্তিক হয়ে যেতে তো আর পারেন না। শক্তি সেখানে নিমেষিত। আবার বিভূতিতে শক্তি বৈচিত্র্যে উল্লসিত। তিনিই বিশ্বাতীত নির্বিশেষ এবং বিশ্বে বিচিত্র। ব্যক্তিতে আবার একক। তিনটি বিভাবই ওতপ্রোত, তা উপলব্ধি করতে পারি আমার আত্মচৈতন্য দিয়েই।

আত্মচৈতন্যই যে বিবিক্ত পুরুষ, আর তার প্রকৃতি আমার এই দেহ-প্রাণ-মন সব এটি প্রথম সাংখ্যাচার্যেরাই দেখালেন পুরুষ-প্রকৃতি বিবেকের কথা বলে। সাধনার প্রথম অবস্থায় এই বিবেক (discrimination) অবশ্যকরণীয়। কেননা আমাদের চৈতন্য সবসময় সাক্ষী চৈতন্য থাকে না। তাই ওই স্থির ভূমিও খুঁজে পাই না। প্রকৃতির বশে গেলেই দুঃখ, বিকৃতি। তাই প্রকৃতি হতে পুরুষকে তফাৎ করার অর্থই হল, দেহ-প্রাণ-মনের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তাদের সব কিছু অতিক্রম করে আত্মচৈতন্যের শুদ্ধ বোধে পুরুষের প্রতিষ্ঠা। কাঁচা আমিকে পরিত্যাগ করে পাকা আমিকে লাভ করা। এই লক্ষ্য নিয়েই নেতিবাদের সাধনা ; নির্বাণষট্‌কে তার পরিচয়। পূর্বে বহুসূত্রে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

সাংখ্য-নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধনির্বাণ তিনের মূলেই বিবেকখ্যাতির প্রভাব, আর তার লক্ষ্য মুক্তি। এই উজানধারায় মনোময় সংসার-ত্যাগ ও শান্তি লাভ। এটা খুব বড় কথা এবং গীতার ভাষায় যিনি যোগারূঢ়, তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব ও সহজ। ভোগে ও কর্মে জড়াতে চাইনে, নীচে আর নামাই হবে না, এই ভাবে জন্মান্তর রোধ করতে চাই, যার ফল ঐ মুক্তি। চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা এখানেই আসে। দ্রষ্টা হয়ে স্বরূপে অবস্থান, এই ভাবে মুক্তি হল জীবের। কিন্তু এই জীব ও জগৎকে যিনি চালান, যিনি নিজে দ্রষ্টা জগদতীত হয়েও জগতের প্রভু ঈশ্বর, বিশ্বপুরুষ তো তিনিই। তবুও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। ঈশ্বরবাদের দিকে থেকে দেখলে কিন্তু দেখি, ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হয়েছেন এ যদি গোড়ায় ধরি, তাহলে পাব ইতিবাদ। বেদান্তে এ দিকটাও আছে।

এই যে বিচিত্র জগৎ তার রসই বা কে ভোগ করছে? তাঁকে Cosmic Self যদি বলি? সেই বিশ্বপুরুষের কর্মে তো কোনও বন্ধন নেই। তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। আর এই-ই তো ঈশ্বরের কর্ম। তাঁর ধর্ম যদি জীবের হয়, তাহলে ভোগ ও কর্ম এসে পড়বেই। তাই সে শুধু উপদ্রষ্টা নয়, অনুমন্তাও। এবং আরও গভীরে ভর্তা। সাংখ্যদর্শনে কিন্তু প্রকারান্তরে দেখালেন যে পুরুষের দৃষ্টিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুরুষে শুধু ভোগের ছায়া পড়ে। ঈশ্বর হয়ে যিনি ভোগ করেন, তাঁর ভোগে ও কর্মে স্বাতন্ত্র্য থাকে। তিনি কোনমতেই লিপ্ত হন না, এই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতিকে ভরণ করবার সময়ও ভর্তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য যদি বজায় থাকে, তাহলে বন্ধন কোথায়? জীবের বন্ধন আছে, তাই সে মুক্তি চায়। আর ঈশ্বর-পুরুষ স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছেন। আবার বন্ধন খুলতেও তাঁর কোনও বাধা নেই। নিগ্রহ

করে বন্ধন স্বীকার করছেন তাঁর অনন্ত প্রেমে ও শক্তিতে। আবার অনুগ্রহ শক্তি-সম্পাতে মুক্তির আনন্দে উদাস হয়ে যাচ্ছেন। এই হল নটরাজের নটার বাঁধন আর উন্মোচন। তা দেখতে ও বুঝতে পারলে, মুক্তির সাধনার সঙ্গে প্রকৃতির বরণে ও ভোগে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারলে প্রকৃতি থেকে ভয় কেটে যাবে। শুধু মুক্তি চাইলে সে চাওয়ারও এক বন্ধন আছে, পূর্ণতায় তা নিয়ে যেতে পারে না। তাই স্বাধীনতা চাই—সব দিক দিয়ে সর্বতোভাবে। রসচেতনায় প্রেমে ও ভালবাসায় যেমন তাঁরই সঙ্গে একরস হয়ে যেতে পারি; তেমন তাঁর সঙ্কল্পের সঙ্গে কর্মে ও শক্তিতে এক হয়ে গিয়ে, তাঁরই নিমিত্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারি। তাহলে কর্মে বন্ধন হয় না, এই হল গীতার কর্মযোগের শিক্ষা। তাই কর্মে ভক্তিতে ও জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারলে যেমন প্রকৃতির তিনটি গুণ দেখা যাবে, তেমন পুরুষেরও তিনটি বিভাব ধরা যাবে। গীতার উপদ্রষ্টা হতে মহেশ্বর হওয়া পর্যন্ত পুরুষের ওই প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করার ইঙ্গিত আছে। প্রকৃতি তখন নির্মাণী প্রজ্ঞা, বেদে যাঁকে বলা হয়েছে মায়া।

প্রকৃতির মধ্যে একটি ক্রিয়ার ধারা লক্ষ্যণীয়। তার তিন গুণের লীলা একটা ক্রমপরিণতির দিকে চলেছে। তাই মনে হয়, তার একটা লক্ষ্য আছে। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এ কথা স্বীকার করেন না। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে চৈতন্যেরই বিপুল বিস্তার দেখেছেন, তাকে বন্দনা করেছেন। সেখানে জড়বাদের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যের সংস্পর্শেই প্রকৃতিতে ক্রমবিকাশের ঊর্ধ্বমুখী স্তরগুলি খুলছে। শ্রীঅরবিন্দ সেই দৃষ্টি মিলিয়ে ক্রম-অভিব্যক্তির মূলে দেখেছেন জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিগূঢ়িত, যার তা হতেই চৈতন্যের প্রকাশ চিৎ-প্রকর্ষ। সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই প্রেরণা। উদ্ভিদে প্রাণ রয়েছে, রয়েছে রস। অনুভবশক্তি সেক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়নি, একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন অর্ধ-জাগ্রত ভাব। তাই লক্ষ্যটা সেক্ষেত্রে অস্পষ্ট। কিন্তু পশুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য খানিকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে। মানুষের মধ্যে চৈতন্য দেখা দিলে এই স্তর-বিভাগ মূল্যবোধ ও কাল-চেতনা লক্ষ্য করার ফলে বোঝা গেল চিৎপ্রকর্ষই চৈতন্যের লক্ষ্য। জড়বাদের ব্যাখ্যা যতই নির্ভুল গণিতে ধরা পড়ুক না কেন, চৈতন্যই তাকে চালাচ্ছে। চৈতন্য না হলে তার চলার সাধ্য নেই। ভাবনা সংবেদন ও তা থেকে সঙ্কল্পশক্তির সাক্ষাৎ মেলে (thinking feeling willing)। ব্রহ্মে যদি এ শক্তি অনন্তগুণের হয়, তাহলে জীব ব্রহ্ম হলেই বা এ সব চলে যাবে কেন? ব্রহ্মই যেমন উপদ্রষ্টা—জ্ঞানের চরম ও পরম, ভর্তা ভোক্তা হয়ে তেমন রসেরও চরম ও পরম এবং মহেশ্বর হয়ে সঙ্কল্পেরও চরম ও পরম। এই পর্যন্ত হলে তবে জীবের পূর্ণতা, দিব্যজীবনের লক্ষ্যও এই পরিপূর্ণতা।

এই দিক দিয়ে দেখলে, Self বা আত্মাই যে তিনধারায় প্রকাশিত, এও জগতেরই জীবন ও সৃষ্টির ধারা—তা বোঝা যাবে। শুধু যান্ত্রিক জড়বাদের ধারায় তার ছক বাঁধা যায় না। মানুষের অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে আলোকে ও মৃত্যু হতে অমৃতে উত্তীর্ণ হওয়ার যে অভীপ্সা, তা তার জীবনেরই মূল্যবোধ। আমাদের জীবনে এর বিরোধ মুক্ত প্রকাশ চাই। প্রকৃতিতে জড়িয়ে থাকলে এগুলি বিকৃত হয়ে যায়, জ্ঞান পঙ্গু শক্তি ধর্ব আনন্দ

অন্ধ। এগুলিতে আমার যে স্বল্পতা বা খণ্ডতা, তা হতে আমার আত্মার অভিযান হক ব্রহ্মের পূর্ণতায়—বিশ্বাতীতে বিশ্বে ও ব্যক্তিতে। এই ভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ আত্মার বিভাব বিচার করেছেন।

শিব-শক্তি যুগনদ্ধ তত্ত্ব, তার মধ্যে শৈবদর্শন পুরুষতত্ত্বকেই বুঝা করেছেন। নির্বিশেষ বাদী শঙ্করাচার্যকে সেই অর্থে শৈব বলা যায়। তাঁর দর্শনে শক্তির স্বীকৃতি নেই, বৌদ্ধ দর্শনেও নেই। ব্রহ্ম-জগৎ-জীব এই ত্রিপুটি অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখলে শিবই জীব সেই তত্ত্ব আসে। বেদে অদিতি অবন্ধনা। তিনি পিতা তিনি মাতা তিনি পুত্র—ত্রিক দর্শনের মূল ভাব এতে পাওয়া যায়। পুরাণে শিব-শক্তি-কুমার, এই কুমারই জীব, শিব পুরুষ আর তাঁর শক্তি গৌরী। পশু পশুপতি ও পাশ—এইভাবে দেখলে পাশবদ্ধ হলে জীব আর পাশমুক্ত হলে শিব। শিব নিজেই নিজেকে নিগ্রহ করে পাশবদ্ধ পশু হচ্ছেন, আবার তাঁর অনুগ্রহ -শক্তিতে পাশমুক্ত পশুপতি সদাশিব হয়েও যেতে পারেন। এই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। শিব ভূতনাথ পশুপতি আর গৌরী তাঁরই শক্তি, একসঙ্গে দেখা যায়। কিন্তু জীবকে নন্দী ভৃঙ্গী ধরলে একটু যেন খাটো থেকে যায়। তাই শিব-শক্তি-কুমার হলে এলে তিন তিনে এক করতে আর বাধা থাকে না, মিলে যায়। মনে হয় বুদ্ধি দিয়ে বুঝে বিচার করতে গিয়ে (logical scheme) ব্রহ্ম-জগৎ-জীব মেলাতে না পেরে, একটাকে হেঁটে বাদ দিয়ে বা একতরকে অদ্বৈতকে প্রমাণ করতে হয়, যেমন কিনা মায়াবাদ ও বৌদ্ধদর্শনে আমরা পেয়েছি। কিন্তু প্রাণ দিয়ে বা অনুভব দিয়ে বুঝলে তিনে এক বোধ হয়। উপনিষদে প্রাণও ব্রহ্ম, শুধুই প্রজ্ঞান ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্ম আর প্রাণ যুগনদ্ধ তত্ত্ব, তাতে শক্তির স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

শৈব ধারায় রসের স্রোত ক্ষীণ হয়ে এলেও তন্ত্রে যাবার তা পুনরুজ্জীবিত। বৈষ্ণব বেদান্তে রসের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, পুষ্ট হয়ে চলেছে। শান্ত দাস্য সখ্য মধুর ভাব নিয়ে আরাধনা, চরমে আরাধিকা শক্তিই রাধা। সেই শক্তিই তো নিত্য জীব। তার এমন জোর যে, প্রাণের উল্লাসে সে বলতে পারে "আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে"। তবু এ ভাবও ছাপিয়ে যেতে হয়। তাঁর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে হয়। নিঃশেষে মিলে গলে একাকার হলে তবেই তাঁর পরমা স্বীয়া প্রকৃতি আরাধনার শক্তিতে ত্রিপুটির বিভাব নানারূপেই দেখা যাবে ও বোঝা যাবে।

সংহিতায় পুরুষবাদে পরমতত্ত্বই পুরুষ—সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষসহস্রচরণ সংযুক্ত পুরুষ। মহান্ পুরুষ মহাভূত, এই সব বলে তাঁকে প্রাকৃত জীব বা ভূত হতে পৃথক করে ভাবনা করা হয়েছে। ভাগবতদর্শনে এই পুরুষবাদের প্রসার। গীতায় তিনি ক্ষরপুরুষ অক্ষরপুরুষ ও পুরুষোত্তম। এই ক্ষরপুরুষ একদিকে যেমন ভূত অপরদিকে পুরুষ অক্ষর বলতে লোকত্তর তত্ত্ব, কাজেই জগৎ সেখানে বাদ পড়ে যায়। তাই ক্ষর অক্ষর মিলিয়ে পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গ, অধ্যাত্ম অনুভব ও সম্যক্ দর্শন দুইই তাতে মেলে। ক্ষরের সমষ্টি বিশ্ব। অক্ষর বিশ্বাতীত। আবার অক্ষরের চেয়েও তিনি উত্তম। পুরুষোত্তম অক্ষর হয়ে বর্ণাতীত অবর্ণ যেমন, তেমন তিনিই আবার সব বর্ণের সমাহার। মরমিরা তাকে বলেছেন নিরক্ষর—সন্তেরা সব ছিলেন নিরক্ষরের প্রিয়া : যেমন কবীর কেশব দাস

প্রভৃতি। এঁরা ওই জ্ঞানীর প্রেমকেই জীবনে রূপায়িত করেছেন। রস সেখানে জ্ঞানে নিরাকৃত নয়।

এরপর প্রশ্ন ওঠে পুরুষ সগুণ না নির্গুণ! পরমতত্ত্ব যখন পুরুষ তখন তাঁর অখণ্ড সমগ্রতারও দুটো দিক দেখা যায়। পুরুষ-প্রকৃতি একাকার, প্রকৃতি গুণময়ী। গুণলীলায় সৃষ্টির ঠাস বুনানি। এখন পুরুষের গুণ বলতে দেখি তিনি জীবে যেমন গুণাধীন—"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে", তেমনি তিনিই আবার গুণাধীশ। প্রকৃতির গুণলীলার তিনি অধীশ্বর, তিনি জগতের প্রভু। আবার তিনিই তো জীবজগৎ ছাপিয়ে গুণাতীত নির্গুণ ভাবাতীত নিরঞ্জন। তাই কোনও গুণ দিয়েই আমরা তাঁর অনন্ত গুণের পরিসীমা করতে পারি না। অনন্ত ভুবন ব্যাপ্ত করে তিনি যেমন গুণাধীন পুরুষোত্তম সগুণ ব্রহ্ম, তেমনই তুরীয় প্রপঞ্চোপশম হয়ে সব ছাপিয়ে "কেবল"। পুরুষোত্তমই অনন্তকাল ধরে গুণলীলায় অবতরণ করেও গুণাতীত নির্গুণ।

অহং সর্বজীবসাধারণ, পুরুষের অহং দানা বাঁধলে ব্যক্তিত্ব দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে প্রাকৃত মানুষের যে ব্যক্তিত্ব, তা প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নয়। মনেরই একটা বিক্ষেপ—খণ্ড ভাবে অহংএর খেলা, সেখানে কোনও চরিত্র তখনও গড়ে ওঠেনি; তা কেবলই পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বিশ্বগত, চৈত্যপুরুষের যা স্বভাব—প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় পুরুষবিধতা (Personality)। তাই পুরুষের আছে কাঁচা আমি অর্ধস্ফুট ছোটো অহং, পাকা আমি বা চৈত্যপুরুষের অহন্তা এবং পরম পুরুষের পরাহন্তা বা পূর্ণহন্তা। অহন্তার এই তিনটি বিভাব। ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিক-পরায়ণ দুরকমই হয়ে থাকেন। তাঁর পুরুষবিধতার ধারণা হতেই দেববাদের উৎপত্তি।

পরম দেবতা পুরুষ হলেই দেববাদ এসে যায়, তিনি মানুষের ছাঁচে গড়া। পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলে, যেমন মিশর বা অন্য কোনও প্রাচীন স্থলে দেখা গেছে, দেবতাকে মানুষের মত করে গড়া হয়েছে। খৃষ্টধর্মেও দেখা যায় দেবতা পুরুষ, কিন্তু তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা নেই। তাঁদের দর্শন পড়লে মনে হয় দেবতা নৈর্ব্যক্তিক, যদিও সাধারণ ভাবে সাধনায় তাঁর স্থান হয়নি। মরমিয়া সাধকদের মধ্যে সেই দর্শন পাওয়া যায় যখন তাঁরা বলেন, fight alone with alone। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন, আমাদের বহু দেবতার মধ্যে একজন ওদের দেবতা, তিনি ব্যক্তিকসম্পন্ন যেমন কিনা শিব দুর্গা কালী কৃষ্ণ। কিন্তু আমরা ভাবের রসে ভাবনার ব্যাপ্তিতে ও তুরুতায় একদেবতাকেই পরম দেবতা আবার সর্বদেব বলে দেখতে ও বন্দনা করতে শিখেছি। "একদেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তার সাক্ষ্য। তিনিই সর্বভূতে গূঢ় সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতের অধিবাস। আবার তাদের ছাপিয়েও সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ হয়ে আছেন, এই হল পরিপূর্ণ ঔপনিষদ ভাবনা। এরকম ভাবনা ওদের কোথায়? আমাদের দেববাদেও সবসময় পরমপুরুষের পুরুষবিধতা ধরা হয়। কিন্তু ওদেশের দেববাদে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক তুরার ভাবনা যেন পাওয়া যায় না। শুধু তত্ত্ব ভাবনা নয়, ভাবের দিক থেকেও সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেবীর আরাধনা করে থাকি, তাঁর "চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুরতা"। ইষ্টদেব যিনিই হন, তিনিই সবার ইষ্ট জগতের নাথ, এই ভাব নিয়ে আমাদের সাধনায় নির্দেশ গোড়াতেই দেওয়া

থাকে। কিন্তু খৃষ্টানদের পক্ষে এ ভাবে দেবতাকে বা ইষ্টকে ধরা কঠিন। ইষ্টদেবতার ভাবনায় আমাদের তিন ভাবেই তাঁর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ধরা হয়েছে—আমার ইষ্ট সবার আবার সবার ইষ্ট আমার, আবার সকলের ইষ্টই এক তিনি। উপনিষদে তিনিই সঃ, এই সঃ আবার নৈর্ব্যক্তিকও। সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর তুরীয় পাদ, তাঁর এক অংশে মাত্র জগৎ স্থিত। একদিকে তিনি সর্বদেবময় আমারই ঠাকুর ইষ্টদেবতা। আবার তিনিই সব ছাপিয়ে "অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।" তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এইরকম করে নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে তাঁর তিনটি বিভাব। শুধু মন বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না।

আত্মা বা ব্রহ্মের বিভাব প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে সবগুলি মিলিয়ে দেখলে দেখব, আত্মা বা ব্রহ্মের বিভাব বলতে যুক্তিপূর্ণ বিচারে জীব-জগৎ-ব্রহ্ম এই ত্রিপুটি। এই ত্রিপুটি প্রাণের দিক দিয়ে দেখলে সৃষ্টির ধারা। বিপরীত ক্রমে শিব-শক্তি-কুমার বা পতি-পাশ-পশু এই ত্রিপুটির অনুভব হবে। পুরুষবাদ দিয়ে দেখলে ক্ষরপুরুষ অক্ষরপুরুষ ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমেরই গুণের প্রকাশ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। ভাগবতে এই পুরুষেরই মহিমা। গুণের দিক থেকে তিনি গুণাতীত নির্গুণ হয়েও গুণের অধীশ্বর পুরুষোত্তম, জীবরূপে গুণের অধীন। তাঁর নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি ইষ্টদেব সর্বদেবময়। তাছাড়াও তিনি যে আরও কত কি, তা তো বলাও যায় না, বলে শেষ করাও যায় না। যিনি সব ছাপিয়ে অবাঙমনসোগোচর, তাঁর সংজ্ঞা দিতে শুধু বলা যায় "সঃ"।

এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল, সাধারণ পুরুষ গুণের বা প্রকৃতির অধীন বলে সাধক চান ব্রহ্মোত্তমোলেশশূন্য অবস্থায় পৌঁছতে, গুণাতীত নির্বিশেষ ভূমিতে আরূঢ় হতে। তারপর কিন্তু ঈশ্বরের লক্ষণ তাঁতে বর্তাবে, গুণের অধীশ্বর হতে হবে। পুরুষের বিভাবগুলিকে জীবনে রূপ দিতে না পারলে তা পুঁথিগত তত্ত্ব হয়েই থাকে, সত্য হয় না। তাই গুণাতীত হয়ে থেকে গেলেও পূর্ণতা আসে না। তিন ভাবের সামরস্য করে নিয়ে "বোধে বোধ" মিলিয়ে জীবনে রূপ দিতে হবে, পূর্ণযোগের এই দায়। এই জীবনে, এখানে, গুণাতীত ভূমির ঐশ্বর্য নামিয়ে আনতে হবে।

রামপ্রসাদ বলেছেন "সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়ে ভাঙছে ঢেলা"। আবার বলছেন—"আমি কালীর ব্যাটা"—এই তো জীবনে গুণাতীতের ঐশ্বর্য প্রকাশ। কালীতত্ত্বে কালীই লীলাময়ী। আবার তিনিই অবর্ণ গুণাতীত, তাই কালো, সমস্ত তাতে মিশেছে। তিনিই বর্ণহীন আকাশ, তাও বলা যায়। ক্ষরপুরুষকে ধরে অক্ষরের নিরাকরণ, অথবা অক্ষরকে নেনে ক্ষরকে একেবারে নস্যাৎ করা, যথার্থ দর্শন হতে পারে না। চাই পুরুষোত্তম যোগ। "দেহে অস্মিন্" তাঁকে ধরতে হবে। নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া অর্থ গুণাতীত হয়ে থাকা বা গুণহীন হয়ে যাওয়া নয়। তেমনই শুধু দ্বৈতদর্শন বা অদ্বৈতদর্শনে সিদ্ধ হলেই হবে না, দ্বৈতাদ্বৈত একই সঙ্গে দর্শন হওয়া চাই। দেববাদের মধ্যে তাঁর বিশুদ্ধ লীলারস প্রত্যক্ষ হলে রসসৃষ্টিতে দ্বৈতাভাসও লাগে। সব ভাব মিলিয়ে অখণ্ডতত্ত্বকে পেলে আর কোনও গোলে পড়তে হয় না। তাই প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে তত্ত্ব অনুভব হওয়া চাই। ঋষি যেমন বলেছেন "মন দিয়ে মনীষা দিয়ে হৃদয় দিয়ে" সব বুঝতে হবে। তখন তর্কবুদ্ধি তাকে পরিহাস করলেও সত্যের উপলব্ধিতে সত্যপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে "চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই" বলে জ্ঞানীর সঙ্গে ভক্তের দৃষ্টি নিয়ে উপহাস করা হয় বলে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেছেন। উজান গতিতে সম্ভোগদশায় দ্বৈতবোধ দেখা দেয়; বিলাসের ভূমিতে অদ্বৈতবোধ বুঝি আর রইল না, এ সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক নয়। গভীর হতে গভীরে একেবারে দ্বৈতাদ্বৈতবোধ বিবর্জিত হয়ে যেতে তো হবেই (Yogic process of stilling the mind)। কিন্তু অদ্বৈতবোধ-নিবিড় হয়েও শূন্যতায় আটকে থাকা চলবে না, সেও আসক্তি। তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে ভাটিয়েও আসা চাই—তাহলে বলতে পারি, "চিনি হয়েও তো চিনি খেতে হয়"।

নাগার্জুনকে বৈনাশিক বৌদ্ধ বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর দর্শনে মাধ্যমিক পথই অনুসরণের নির্দেশ আছে—ভব ও নির্বাণ কোন কিছুতেই আসক্ত হওয়া চলবে না। ভব-নির্বাণের মাঝখান দিয়ে চলেছে সেই পথ। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন নির্বাণের মহাসুখের কথা। ধ্যানের একরসপ্রত্যয়, আত্মারামতা সম্প্রসাদ এগুলি নিয়েই রূপান্তরযোগের সাধনা। ঐ নির্বাণ বা শূন্যতার পটভূমিকাতেই প্রচণ্ড শক্তিসম্পাতের ফলে ঘটবে ধাতুপ্রসাদ। তখন শুদ্ধ ধাতু আর চৈতন্য matter ও spirit-এ দ্বন্দ্ব থাকবে না, ভেদবুদ্ধি হবে না। দেহে প্রাণে মনে সম্প্রসাদ নির্বাণের মহাসুখ তখনই অনুভবে আসতে পারবে। শিব অটল, মহাশূন্য কিন্তু তারই মাঝে রয়েছে বিদ্যুৎ—প্রকৃতি টলমল করছে, তাঁর আবেশে। রজোগুণ রূপান্তরিত হয় বীর্যে সামর্থ্যে, তমোগুণ হয় স্থৈর্যে প্রশান্তিতে। বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবাধ প্রকাশ ঘটে এই জীবনেই, শেষ পর্যন্ত দেহে। এই রূপান্তরযোগের কৌশল রয়েছে ঐ মহাশূন্যের শক্তিতে আত্মারই বিভাবে। এই শক্তিপাতই সম্ভব করবে প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী
(Thoughts and Aphorisms)

মায়ের ব্যাখ্যা সহ

৩০৬—সন্ন্যাস গ্রহণ অবশ্য দুঃখমুক্তিদায়ক, গুহাতে গিয়ে থাকলেও শান্তি মেলে, আর পর্বতশিখরবাসে যথেষ্ট তৃপ্তি আছে; কিন্তু তথাপি তোমাকে ভগবান এখানে যেজন্য যেমনভাবে পাঠিয়েছেন তেমনি থেকে তোমার সেই কাজ ক'রে যাও।

মা : শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন যে তুমি সংসার না ছেড়েও সন্ন্যাস নিতে পারো, কিন্তু ভগবানের সেবক থেকে এখানে তাঁরই ইচ্ছাতে কাজ ক'রে যাওয়া অনেক বড়ো কথা, নিজের ইচ্ছাতে সন্ন্যাসগ্রহণ যতই বড়ো হোক তার চেয়েও। ২৬-১-১৯৭০

৩০৭—শংকরের কাজ দেখে ভগবান তিনবার হেসেছিলেন, প্রথম যখন তাঁর মৃত জননীর সৎকার করতে ঘরে ফিরে গেলেন, দ্বিতীয় যখন তিনি ঈশ উপনিষদের মায়াবাদ ভাষ্য লিখলেন, আর তৃতীয় যখন তিনি কর্মত্যাগ-তত্ত্ব প্রচার করবার জন্য নিজেই অনেক কাজ করলেন,—তখন তিনি তাতেই হেসেছিলেন।

মা : এই ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী ভেবেও বাহ্য সমাজরীতি পালন করতে গেলেন, ভ্রান্ত ভাষ্য রচনা করলেন, আর নিষ্ক্রিয়তা প্রচার করতে নিজেই সক্রিয় হলেন, তখন ভগবান তাঁর এই কাজগুলি দেখে হেসেছিলেন। ২৭-১-১৯৭০

৩০৮—লোকে তার কাজের সাফল্যই পেতে চায়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যদি তাতে বিফল হয় তাহলে জানবে যে প্রকৃতির প্রজ্ঞা ও শক্তি তাদের বুদ্ধিচাতুর্যকে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল ভগবানই জানেন কখন কেমনভাবে ব্যর্থতার দ্বারা আরো ভালো কাজ হয়।

৩০৯—যে লোক জীবনে কখনো ব্যর্থ হয়নি ও কোনো কষ্ট পায়নি তাকে কখনো বিশ্বাস করবে না, তার সৌভাগ্যের অনুসরণ করবে না, তার সপক্ষে লড়বে না।

৩১০—এই দুজন কখনো মহত্ত্বের ও স্বাধীনতার উপযোগী হয়না—যে ব্যক্তি কখনো কারো দাসত্ব করেনি, আর যে জাতি কখনো কারো অধীন হয়নি।

মা : এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যা কেবল দুঃখকষ্টের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। লোকে অজ্ঞতা-হেতু এগুলোকে এড়াতে চায়, কিন্তু ভগবান যাদের বেছে নিয়েছেন পৃথিবীতে তাঁর কাজের জন্য, তাদের দ্রুত উন্নতি দেবার জন্য তিনি তাদের উপরেই এগুলি দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁর প্রজ্ঞাই হলো সত্য ও চরম। ২৮-১-১৯৭০

৩১১—তোমার আদর্শ ও লক্ষ্যের কখন কিভাবে সাফল্য মিলবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করতে যেওনা। সর্বস্ত ভগবানের উপর সে ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি তোমার তরফের কাজ করে যাও।

৩১২—তোমার প্রচেষ্টা এমনভাবে করবে যাতে অবিলম্বে বর্তমান জীবনের মধ্যেই তোমার আদর্শের সাফল্য মেলে; অথচ তোমার অধ্যবসায় থাকবে এমন যার মূল্য হাজার বছরের পরিশ্রমের মতো। পাঁচ হাজার বছরেও যে সাফল্য আশা করতে তুমি সাহস করোনা, তা হয়তো কাল সকালেই মিলে যেতে পারে, আবার যা তুমি এখনই পাবার আশা করছ খুব ব্যগ্র হয়ে, তা হয়তো মিলবে একশো বছর পরে।

মা: রূপান্তরের সম্বন্ধে আমাদের ঠিক এমনি মনোভাবই গ্রহণ করা উচিত; অর্থাৎ চেষ্টা এমন ক'রে যেতে হবে যেন বর্তমান জীবনেই তার ফল মেলে, অথচ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এমন রাখতে হবে যাতে শতাব্দী পর্যন্ত সে প্রয়াস অটুট থাকে। ২৯-১-১৯৭০

৩১৩—আমাদের প্রত্যেককেই এখনও পৃথিবীতে লক্ষ জন্ম পার হতে হবে। তবে আমাদের এত তাড়া কিসের আর এত অভিযোগ বা অধৈর্যই বা কেন?

৩১৪—তাড়াতাড়ি চলো, লক্ষ্যস্থল এখনও অনেক দূরে; বৃথা আলস্যে বসে থেকোনা, কারণ পথের শেষ প্রান্তে প্রভু তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন।

মা: এখানেও শ্রীঅরবিন্দ সব দিক বিবেচনা করে বলছেন যারা ব্যস্তবাগীশ তাদের ধীরস্থির হতে, যারা অলস তাদের তৎপর হতে। দুই বিপরীতকে মিলিয়ে চলাই ঠিক যুক্তিযুক্ত, তাতে পুরো সাফল্য মেলে। ৩০-১-১৯৭০

৩১৫—আমাদের অল্পদিনস্থায়ী জীবনের প্রচেষ্টায় ও ক্ষণভঙ্গুর শতাব্দীর মধ্যে পর্বতের স্বর্ণচূড়াতে উঠে পৌঁছনো যাচ্ছেনা বলে আদর্শের দোষ দিতে থাকা ও ছেলে-মানুষের মতো কান্নাকাটি ও অনুযোগ করতে থাকা, এই দেখে দেখে আমি হয়রান।

৩১৬—কামনাবর্জিত হয়ে আত্মাকে লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ করো, এবং আপন ভিতরকার দিব্যশক্তির উপর নির্ভর করো; তাহলে তোমার সেই লক্ষ্যই তোমার পথ ক'রে দেবে, সেই লক্ষ্যই হবে তোমার উপায়স্বরূপ। কারণ লক্ষ্য হলেন স্বয়ং ব্রহ্মন্, যিনি নিজেই পূর্ণস্বরূপ। সেই পূর্ণব্রহ্মকে আত্মার মধ্যে পূর্ণভাবেই দেখ।

মা: অবশ্য আমাদের চিরন্তন যাত্রার যে দিব্যলক্ষ্য তা এই আত্মারই মধ্যে রয়েছে, কেবল আমাদের ব্যক্তিগত অন্ধতাই সে সম্বন্ধে চেতন হতে দেয় না। এই অন্ধতা অজ্ঞতা দূর করবার একমাত্র সার্থক উপায় হলো সেই পরমব্রহ্মের কাছে অকুণ্ঠ ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ১-২-১৯৭০

৩১৭—বুদ্ধির দ্বারা পরিকল্পনা করতে না গিয়ে তোমার ভিতরকার দিব্যদৃষ্টির উপর সে ভার ছেড়ে দাও। যা করতে হবে তার রাস্তা যখন নিলে যাবে তখন তারই দিকে নজর ঠিক রাখবে; শেষে যা হবার তা জগতের মধ্যে হয়েই চলেছে, এবং তোমার আত্মার মধ্যেও তা হয়েই আছে।

৩১৮—লোকে এই দেখে, যে-ঘটনাটি ঘটেনি তাকে চেষ্টাপ্রয়াসের দ্বারা ঘটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এ দেখা ভুল দেখা। কোনো কিছু ঘটাতে পারা হয়না, সে ঘটনা আপনিই ঘটে। কারণ ঘটনাই হলো ব্রহ্মন্, আদিকাল থেকে তিনি ঘটেই আসছেন এবং অভিব্যক্ত হচ্ছেন।

মা: এই ভাবে কথাটা বলা চলে যে সব কিছুই হয়ে আসছে অনাদি কাল থেকে, কেবল আমরা এই বস্তুময় জগতে তার সম্বন্ধে ক্রমশ চেতন হতে থাকি। এই ধরনে বলা এবং দেখা অবশ্য সাধারণ মানব চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ২-২-১৯৭০

৩১৯—যেমন কোনো নক্ষত্র থেকে তার আলো তার বিলোপ হবারও শত শত বছর পরে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যে যা গোড়া থেকেই হয়ে আছে তা সম্প্রতিমাত্র আমাদের স্থূল অনুভূতিতে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

মা: হাঁ, কিন্তু ব্রহ্মের সেই তখনকার ইচ্ছা আমাদের এই এখনকার অনুভবের সময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং আসল কথা হলো ব্রহ্মের কাছ থেকে যে আদেশ নেলে তাই করা, আপন ব্যক্তিগত ইচ্ছার বদলে।*

৪-২-১৯৭০
শ্রীমা

---

* অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৭ জানুয়ারি, ১৯৫৪

প্রশ্ন : মা, কোনো ব্যক্তির দেহগঠন থেকে কি তার চরিত্র প্রকাশ পায়?

উত্তর : না। চরিত্র জিনিসটা যত সোজা ব্যাপার নয়, অনেক কিছুর ফলে তার প্রকাশ হয়। যেমন, পুরুষানুক্রমিক কারণে এবং বাপ ও মায়ের দুজনেরই কাছ থেকে যা নেলে তার ফল বিভিন্ন রকমের হয়, এবং যা আসে পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব-পুরুষদের প্রভাব থেকে। তা ছাড়া আরো যেমন সব জিনিস আসে শৈশব কালের পারিপার্শ্বিক আবাহওয়া থেকে তার দ্বারাও চরিত্র প্রভাবিত হয় এবং দেহের গঠনও তার প্রভাব নেয়। সুতরাং কাউকে বাহ্য চোখে দেখে বলা যায় না তার ভিতরকার প্রকৃতি কেমন। হয়তো তার স্বভাবের কোন দিকে ঝোঁক, তার বাধাবিঘ্নগুলি কোথায়, তার সম্ভাব্যতা কতখানি তা বলা যেতে পারে, কারণ চেতনার যথেষ্ট উন্নতি ঘটলে তখন দেহ তার ছাঁচ নিয়ে সেখানে তেমন চরিত্রের বিকাশ করে।

প্রশ্ন : আর দেহ যখন রোগের দ্বারা বিকৃত হয়?

উত্তর : দুর্ঘটনার ফলেও তা হতে পারে। দুর্ঘটনা ঘটে অনেক কারণে : তা হয় প্রকৃতির ভিতরকার শক্তিসংঘর্ষের ফলে, উন্নতি ও বিস্তারের শক্তিদের সঙ্গে ধ্বংসশক্তির সংঘর্ষ। দুর্ঘটনার ফল যখন স্থায়ী রকমের হয়, তখন বিরোধী শক্তিদের যৎপরিস্তর আংশিক জয়লাভের দ্বারাই তা হয়, এবং তা হলো অনিষ্টকারী শক্তি, এটা লক্ষ্যণীয়।

থিওসফি প্রভৃতি কয়েক প্রকার শাস্ত্রে মানুষের মামুলী ধারণার মতো বলে থাকে : "কর্মের ফলেই ওরূপ হয়েছে, গতজন্মের নিশ্চয় তুমি কিছু যৎকর্ম করেছিলে, বর্তমান জন্মে সেই কারণে দুর্ঘটনা ঘটল।" কিন্তু এমন কথনো সত্য নয়। এ হলো মানুষী বিচার, প্রকৃতিরও নয় আর ভগবানেরও নয়।

দেহ গঠনের দিকের প্রশ্নটা সেখানে আসতে পারে যেখানে, মনে করো, তুমি নিত্যই নিরাশাবাদী থেকে হতাশা পোষণ করছ, মনে কোনো বিশ্বাস নেই, জীবনে কোনো আস্থা নেই, উৎসাহ নেই, এ সব জিনিস দেহগঠনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এই ধরনের মানুষের মধ্যে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে তারা তা এড়াতে পারেনা। কোনো রোগের বা দুর্ঘটনার নিমিত্তমাত্র এলেই সেটা তাদের পেয়ে বসে। যাদের মধ্যে নিত্য দুর্ঘটনা ঘটছে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করলেই তা দেখতে পাবে। অন্যদের বেলাতে অনুরূপ দুর্ঘটনার সুযোগ থাকলেও তাদের তা স্পর্শ করেনা। আর পূর্বোক্তদের চরিত্র লক্ষ্য করলেই দেখবে যে তারা প্রায় নিরাশাবাদী, কিছু একটা দুঃখ আসন্ন এ তারা প্রত্যাশা করেই আছে, তারা তাই সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। আর আমরা জানি যে তুমি যা ভয় করবে তাই তোমার হবে।

দুর্ঘটনার ভয় থাকলেই দুর্ঘটনা যেন চুম্বকের মতো তোমার কাছে এসে পড়ে, সুতরাং এটা চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করে। রোগের সম্বন্ধেও সেই কথা। অনেকে আছে যারা রোগীদের সঙ্গে মেশে, যেখানে রোগের মহামারী সেখানেও যায়, অথচ তাদের কিছু হয় না। আবার এমন আছে যারা রোগীর কাছে ঘন্টাখানেক মাত্র থাকলেই রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং তা নির্ভর করে ভিতরকার ভাব যেমন তারই উপর।

প্রশ্ন : শিশুদের বেলাতেও কি তাই ?

উত্তর : তা বলা যায় না। ওটা হলো নৈতিক দিকের প্রশ্ন। সুতরাং শিশুদের সম্বন্ধে ওদিক দিয়ে বলা যায় না যে যারা সুস্থ এবং নীরোগ তারা "ভালো ছেলে" আর যারা রোগে ও দুর্ঘটনায় ভোগে তারা "মন্দ ছেলে"। সে কথা ঠিক নয়। তোমাদের বলেছি যে প্রকৃতির যুক্তি মানুষের যুক্তির মতো নয়। যাকে আমরা ভালো বা মন্দ বলি, প্রকৃতির কাছে সে কথা তেমন নয়। তার কাছে বিবেচ্য কোনটা গঠনমুখী বা ধ্বংসমুখী, কোনটা অগ্রগতি বা কোনটা পশ্চাৎগতি। তদ্ভিন্ন এমন শিশু আছে যারা বেশ হাসিখুশি, স্ফূর্তিযুক্ত, জ্যোতির্ময়, আবার এমন আছে যারা সর্বদা ম্রিয়মাণ, অসন্তুষ্ট, গোমড়ামুখ। এরাই কিন্তু যত অসুস্থতা ও দুর্যোগের কবলে পড়ে। যাদের মধ্যে কিছু জ্যোতি আছে (আধ্যাত্মিক জ্যোতি না হলেও সাধারণ প্রাণজ্যোতি ও আস্থা ও আনন্দ আছে) তাদের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একটা সঙ্গতি থাকে যার ফলে তারা দুর্ঘটনা ও রোগব্যাধিকে এড়িয়ে বর্তমান জগতের অবস্থাতে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন—"সাধারণের ধারণা যাদের মন খুব সুতীক্ষ্ণ ও ধারালো তাদের দেহ হয় দুর্বল।" এর অর্থ বোঝা গেল না।

উত্তর : ওটা গত শতাব্দীর পুরোন ধারণা, এখনকার দিনের নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে লোকে ভাবতো যে যাদের দেহ যত দুর্বল ও ক্ষীণ, তারাই মনের দিক দিয়ে তত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়। এর কারণ বলা হতো যে তারা দেহের দিকে কোনো আনন্দ বা সুখ পায় না বলেই মনের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তাই তাদের বুদ্ধি প্রখর হয়ে ওঠে। বস্তুত রোগা হয়ে থাকাই তখনকার দিনের ফ্যাশন ছিল। কবিরা তেমনি ক্ষীণদেহ হতে চাইত, শিল্পীজনেরা নিজেদেরকে ঐরূপ দেখাতে চাইত, যে দেহ ক্ষীণ কিন্তু মন খুব উজ্জ্বল। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, বোধকরি তোমাদের জন্মের আগেই সে যুগ চলে গেছে। সেই রোমান্টিক যুগে যেমন ছিলেন ম্যুসে (Musset), তাঁর ছবি তোমরা দেখেছ কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁর ঐরকম রোগা কবি কবি চেহারা ছিল, পোষাকও ছিল তেমনি। কিন্তু এখন সে ফ্যাশন চলে গেছে, এখন লোকে চায় সুস্থ সবল সামঞ্জস্যযুক্ত দেহ, আর ছেলে-মেয়েদেরও সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

একজন বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিকের একটি গল্প পড়েছিলাম, সেটি আদিম প্রস্তর-যুগের গল্প, যখন মানুষ গুহাতে বাস করত আর পশুচর্ম দিয়ে দেহ আবৃত করত, বন্যজন্তু শিকার করে খেতো। একবার তাদের মধ্যে এক শিশু জন্মালো বিকৃত অঙ্গ ও খোঁড়া।

এমন শিশু হলে তখন তাকে মেরে ফেলা হতো। কিন্তু এই শিশুর মা একে লুকিয়ে রেখে বড়ো ক'রে তুললে। সে শিকার করতে অক্ষম, কোনো কাজের পক্ষে অক্ষম, তাই সে বসে বসে মনের দিকে ক্রমশ উৎকর্ষ ঘটিয়ে অবশেষে কবি হয়ে দাঁড়াল, সেই হলো প্রথম কবি। দেহের দ্বারা যা করতে অক্ষম, বাক্যের গুণে সে তা ব্যক্ত করত। এইরকম ভাব থেকেই একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে উৎকৃষ্ট রকমের মন পেতে হলে দেহের পুষ্টির দরকার নেই, দেহ যতই অপটু হবে মন ততই জ্যোতির্ময় হবে। কী ভ্রান্ত ধারণা!

আর দেহের উপর একরূপ নির্ভরতাও আছে। আমি তোমাদের বলেছি বিখ্যাত ফরাসী কবি Sully Prudhomme-র কথা, তিনি যখন মারাত্মক রোগে ভুগছিলেন তখনই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে অমায়িকভাবে হেসে কথা বলেছেন। তাঁর মন দেহের অবস্থার উপর নির্ভর করেনি। তবে এমন কখনো সকল ক্ষেত্রে হয় না।

প্রশ্ন : শিশুদের চৈত্যসত্তা কি সর্বদাই সামনের দিকে থাকে?

উত্তর : সব সময়ে নয়। বাড়তি বয়েসে যখন মন তৈরি হয় তখনের চেয়ে ছোটো বয়সে "সামনে থাকে" বটে, কিন্তু সকল শিশুর বেলাতে নয়। আর এখানকার দৃষ্টান্ত নিয়ে তার বিচার হয়না, কারণ এখানে যাদের ভর্তি করা হয় তাদের আগে আনা হয় আমার কাছে। যখন যাদের চৈত্য সামনে দেখি তখনই কেবল তাদের নিই, যার চৈত্য ঢাকা পড়েছে দেখি তাকে নিইনা। সুতরাং এখানে যারা রয়েছে তারা ব্যতিক্রম, নিতান্ত বাছাই করা।

প্রশ্ন : শিশুরা এত লোভী ও হ্যাংলা হয় কেন?

উত্তর : ওঃ, এই কথা! খাবার দিকে হ্যাংলা হওয়া তো কোনো অপরাধ নয়। যারা বেশি হ্যাংলা হয় তাদের হয়তো খাদ্য ঠিকভাবে পরিপাক হয়না, তাই তারা আরো বেশি খেতে চায়। যতটা খায় ততটার কাজ হয় না। সকলেরই বাহ্যসত্তা নানা দোষে পূর্ণ, শিশুরাও তার থেকে বাদ নয়। এ প্রশ্নের চেয়ে তুমি বরং জিজ্ঞাসা করতে পারো, "শিশুরা নিষ্ঠুর হয় কেন?" এটাই বিশেষ ভয়ংকর কথা।...এ জিনিস আসে তাদের অচেতনতা থেকে। তারা জানেই না যে অন্য কেউ তাতে কষ্ট পায়। তবে যদি তাদের সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা—তখন তারা বোঝে। যারা জন্তুদের উপর অত্যাচার করে (এমন অনেক আছে) তারা জানে না যে তারাও মানুষেরই মতো ব্যথা বোধ করে। যখন তারা পালিত পশুদের দেহে আঘাত করে, চুল ধরে টানে, খিমচি কাটে, তখন যদি তাদের দেহেও ঠিক তাই ক'রে দেখানো হয় যে তাতে কতটা ব্যথা লাগছে, তাহলে হয়তো তারা আর কেউ তা করবে না।

কেউ কেউ দুরন্ত রকমে অত্যাচারী হয়। সেটা হয় অসৎ প্রভাবের দ্বারা। এ জিনিস তাদের খুব শিশুকাল থেকেই দেখা দেয় এবং সারাজীবন তারা ঐরকমই থাকে, যদি তাদের সংশোধন করা না হয়, যা খুবই কঠিন।

একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে দেহসত্তার সঙ্গে চৈত্যের, আর আছে প্রাণসত্তার সঙ্গে মনের। তাই যে মনপ্রধান হয় সে বেশি প্রাণচেতন হয়, আর যে চৈত্যপ্রধান হয় সে সাধারণত বেশি দেহচেতন হয়। তাই শিশুদের চৈত্য সামনে থাকাতে তারা প্রায় দেহচেতন অবস্থায় থাকে। কিন্তু যেমনি মন গড়ে উঠতে থাকে এবং লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার ইচ্ছা জাগে, সেই সঙ্গে আগের জিনিস বদ্‌লে যায়। যারা পুরুষে ও মেয়েতে প্রভেদ দেখে (কেন জানিনা, কারণ দুইই সমান সত্তা), তারা বলে যে পুরুষ বেশি মন-প্রাণ-চেতন, আর মেয়েরা বেশি চৈত্য-দেহ-চেতন। এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু অনেক ব্যতিক্রম ও জটিলতাও আছে। ও একরূপ মোটামুটি ধারণা। বস্তুত যারা দেহচেতন তারা সাধারণত সরল ও ভালোমানুষ হয় (জ্ঞানসমৃদ্ধ না হলেও) আর তারা মন-প্রাণ-ধর্মীদের চেয়ে চৈত্যের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। তাই শিশুরা মন-প্রাণের বৈপরীত্যের দ্বারা জটিল না হওয়ার জন্য সহজেই তাদের চৈত্য বেরিয়ে আসতে পারে।

প্রশ্ন : কেমন ক'রে জানবো যে আমার চৈত্য সামনে আছে কিনা ?

উত্তর : কে জানবে ? তুমি নিজে ? নিজেই কি তা অনুভব করোনি কখনো ? আমি খুব ছোটদের কথা বলছি না, কারণ তাদের মধ্যে কিছু লক্ষ্য করা যায়না, কিন্তু তেমন শিশু তুমি নও, নিজেও কি কিছু অনুভব করোনা ? কখনো কোনোরকম পরিবর্তন টের পাওনা ? (প্রশ্নকারী মাথা নেড়ে স্বীকার করল) আ ! তোমাদের মধ্যে কেউই বলবে না যে চৈত্য কাজ করলে তা জানা যায়না, কারণ তখন নিজেই বেশ ভালো বোধ করতে থাকো, নিজের মধ্যে একটা আলো, আশা, বদান্যতা, সদিচ্ছা, জগতের প্রতি মমতা আসে, জীবনকে কর্মক্ষেত্র ও উন্নতির ক্ষেত্র বলে প্রতীতি হয়। আর যে সব দিনে তোমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে থাকে, সব কিছুতে অসুখী বোধ করো, কাউকে ভালো লাগে না, একটা অনিষ্ট করতে ও সব ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করে, স্ফূর্তি নেই, মনে কোনো আনন্দ নেই, সেদিনের চেয়ে ঐ সকল দিনের কি বিশেষ পরিবর্তন বোধ করোনা ? নিশ্চয় তা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু চৈত্যের জন্য বা কিসের জন্য হলো তা জানা যায় না।

উত্তর : অবশ্য চৈত্য কী ও প্রাণসত্তা কাকে বলে তা শিখিয়ে না দিলে জানা যায় না। কেবল মনে হয়, আজ বেশ ভালো লাগছে, কাল এমন ছিলাম না। নিজে আমি চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এ সব কথা জানতাম না, কিন্তু পরিবর্তনটা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম। কেউ শেখায়নি এবং বইতেও পড়িনি বলে এ সব কথা বলতে পারতাম না, তবু কিন্তু বিভিন্ন সময়ের তারতম্য পরিষ্কার বুঝতাম, যখন যেরূপ চেতনাতে থাকতাম।

কিন্তু তোমরা যারা এখানে থেকে সব কিছু শুনতে পাচ্ছ এবং বইতে পড়েছ আর আমার কাছেও শিখছ, তোমরা নিশ্চয় বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়াগুলি বুঝবে এবং চিহ্নিত ক'রে বলতে পারবে যে এটা এই আর ওটা ওই। দেহটা কোনদিন সুস্থ আর কোনদিন অসুস্থ তা কি টের পাওনা ?

প্রশ্ন : হাঁ, দেহের বেলাতে সেটা পারি।

উত্তর : দেহের সম্বন্ধে পার তো ? সকালে ঘুম থেকে উঠে কি বলতে পারো না যে আজকের দিনটা ভালো যাচ্ছে কিনা ?

প্রশ্ন : প্রতিদিন সে ধারণা বদ্‌লে বদ্‌লে যায়।

উত্তর : ঠিক কথা, রোজই ভাব বদলায়। এমন কি একই দিনে বদলায়। কিন্তু যখন প্রথম ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করো তখন কি রোজই এক রকমের হয় ?

প্রশ্ন : না।

উত্তর : আ। কোনোদিন বা এমন হয় যে সব কিছুই সঙ্গতিপূর্ণ আবার কোনোদিন বা এমন হয় যেন বাঁতাতে পেষা, বাঁতাটা কিছুতে ঘুরতে চায় না। ওই ঠিক তেমন। যেমন এখন দেহের বেলাতে বোঝো, তেমনি আভ্যন্তরীণ অনুভূতির বেলাতেও বুঝবে, নিজের মস্তিষ্ক সম্পর্কেও বুঝবে যে তা পরিষ্কার না ধোঁয়াটে। বুঝেছ ?

প্রশ্ন : হাঁ।

উত্তর : একই রকমের জিনিস।

প্রশ্ন : সত্তার কোন্ অংশে পর্যবেক্ষণশক্তি জন্মায় ?

উত্তর : বোধকরি সত্তার সকল অংশেই সে শক্তি আসে। মনেও হতে পারে, প্রাণে এবং দেহেও হতে পারে। কোনো ভাবধারার গতিকে যখন পর্যবেক্ষণ করো এবং তার যুক্তিকে অনুসরণ করো তখন একরকম হয়, আর যখন তোমার বন্ধুর কর্মপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য করো এবং তা নির্ভুল হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করো তখন অন্যরকম হয়। লক্ষ্যের কাজ তুমি দুই ব্যাপারই করছ কিন্তু তার ক্ষেত্র বিভিন্ন। পর্যবেক্ষণশক্তি তোমার দুটিতেই কাজ করছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। সত্তার একই অংশ থেকে তা হচ্ছে এমন কথা বলা যায় না। প্রত্যেক বিভিন্ন অংশেই জন্মায় এই একাগ্রতা ও পর্যবেক্ষণশক্তি। এর সঙ্গে বিচারণা শক্তিকে যেন ভুল করো না, কারণ বিচারণা হলো বুদ্ধির অন্তর্গত, বুদ্ধির দ্বারা সেই বিচারণা হয়। কোনটা কোথা থেকে আসছে এবং কোনটার কি মূল্য তা পৃথক ক'রে বোঝা যায়। বিচারণা নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের উপর, আগে পর্যবেক্ষণ পরে বিচার।

প্রশ্ন : চৈত্যের মধ্যে কি পর্যবেক্ষণশক্তি থাকে ?

উত্তর : তার চেয়ে বেশি কিছু থাকে। ওতে থাকে একটা প্রত্যক্ষ দর্শন। যেন আয়নার মতো ওতে সব কিছু প্রতিফলিত হয়। বিকৃতিপ্রাপ্ত না হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ জিনিস পরিষ্কার থাকে, একরূপ স্পর্শবোধের মতো, যেমন কেউ কাছে এলে বোধ হয়। ওদের মধ্যে দেখবে ওরা বিনা কারণে একজনের কাছে ঘেঁষে, আর অন্য একজনকে

দেখলেই দূরে সরে যায়। তুমি হয়তো ঐ দুজনের মধ্যে কোনো ভালোমন্দ পার্থক্য দেখছ না, কিন্তু ছেলেরা সহজেই একজনের দিকে আকৃষ্ট আর অন্যজনের প্রতি বিমুখ হয়। সেখানে জোর করতে গেলে কান্নাকাটি ক'রে পালিয়ে যায়। তাদের অজ্ঞান চেতনাটই মধ্যে একটা চৈত্যদৃষ্টিশক্তি থাকে যা অন্যের চৈত্যকে দেখতে পায়।

প্রশ্ন : কেউ কেউ শীঘ্রই একাগ্রতা আনে আর কেউ কেউ তা পারেনা।

উত্তর : হয়তো তারা সেই ভাবেই জন্মায়, অথবা আপন অজ্ঞাতে তারা একাগ্রতার অভ্যাস ঘটায়। হাঁ, অনেক ছেলেরা ছোটো থেকেই খুব মনোযোগী হয় আবার অনেকে তেমনি অমনোযোগী হয়। ভিন্ন ভিন্ন সত্তার আভ্যন্তরীণ গঠন বিভিন্ন। দুজন একরকম হয় না। কেউ একাগ্রতা নিয়েই জন্মায়, কেউ তা নয়।

প্রশ্ন : তা কি বাড়াতে পারা যায় না?

উত্তর : বাড়ানো নিশ্চয় যায়, তার সীমা নেই। আর তা অপরিহার্য।

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন ("Education" থেকে) "প্রাচীন অলৌকিক শাস্ত্রে বলে যে আমাদের অনুভবশক্তি কেবল পাঁচ রকম নয়, মানুষে চর্চা করলে তা সাতরকম ও এমন কি বারো রকম পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনো যুগে এই সব গুণ কোনো কোনো জাতিতে বিশেষভাবে আয়ত্ত করা হয়েছিল। অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করলে সকলেই এই সকল অতিরিক্ত অনুভবশক্তি লাভ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় একটি গুণের কথা : তুমি দেহচেতনাতে তীব্র একাগ্রতা সহকারে প্রলম্বিত ক'রে দূরে অবস্থিত কোনো জিনিসের শব্দ, গন্ধ, রূপ, আস্বাদ ও এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত পেতে পারো।" সেই বারোটি অনুভবশক্তির কি কি নাম আছে?

উত্তর : নাম? চ্যাল্‌ডিয় যুগে (Chaldean) নাম দেওয়া হয়েছিল চ্যালডিয় ভাষাতে। অন্য দেশের প্রবাদে অন্য ভাষায় নাম ছিল, মিশরে ছিল মিশরী চিহ্নিত ভাষাতে। প্রত্যেক প্রবাদে স্বতন্ত্র নাম। আমার কাছে ঐ সকল নামের একটা তালিকা ছিল, এবং বিভিন্ন অনুভবশক্তির ব্যাখ্যাও ছিল, কিন্তু সে অনেকদিন আগেকার কথা, এখন আর স্মরণ নেই। তার মর্ম আগে যেমন বলেছি, চেতনাকে দূরে প্রলম্বিত ক'রে দিয়ে সেখানকার গন্ধ বর্ণ স্পর্শ প্রভৃতি অনুভব করা। যেমন মনে করো, তুমি হয়তো রোগে বা দুর্ঘটনার জন্য একই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছ, নড়বার ক্ষমতা নেই। ও-ঘরের পাশে রয়েছে অন্য ঘর, তারপর একটা সেতুপথ, সেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানে, সেই বাগানের মাঝখানে রয়েছে ষ্টুডিও। তোমার যদি জানতে ইচ্ছা হয় সেই ষ্টুডিওর মধ্যে কি হচ্ছে, তাহলে তোমার চেতনাকে বাড়িয়ে দিতে পারলে সেখানে পৌঁছতে পারো। এটি ঠিক ভাবে করতে সক্ষম হলে তুমি তোমার ঘরে বসেই দেখতে ও শুনতে পাবে যে সেখানে কি হচ্ছে। যদিও তোমার দেহটা রয়েছে ঘরের বিছানাতে, কিন্তু চেতনা চলে গেছে অত দূরে। সেটা দৈহিক চেতনাই, আভ্যন্তরীণ নয়, দৈহিক ভাবেই তুমি দেখছ এবং শুনছ।

সেখানে কারা আছে তা দেখতে পাচ্ছ, কি বলছে তা শুনতে পাচ্ছ। এমন শক্তি অবশ্য একদিনেই জন্মায় না, অনেক কঠোর প্রচেষ্টা করলে তবে হয়। এই ধরনের একটা শক্তি ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, তাদের জীবনধারা অনুযায়ী। এখন কেমন আছে তা জানিনা, কিন্তু তারা মাটিতে কান পেতে এক মাইল দূরের পদধ্বনি শুনতে পেতো, দুই তিন কিলোমিটার দূর থেকে কারা আসছে তা মাটিতে কান দিয়ে জানতে পারতো। আর কুকুরদের মধ্যে এমন শক্তি আছে, একটা গন্ধ শুঁকিয়ে দিলে তারা সেই গন্ধের চলে যাওয়া পথের অনুসরণ ক'রে যার গায়ের গন্ধ তার কাছে হাজির হতে পারে। এ একটা অতি অনুভবশক্তি, যার দ্বারা সাধারণ চোখের চেয়েও বেশি দেখা যায়, এমন কি কঠিন দেয়াল ভেদ করেও দেখে। শোনা যায় অন্ধেরা এমন অতিরিক্ত বোধশক্তি পেয়ে দূরের জিনিস টের পায়। তারা চোখে কিছু দেখে না, রাত্রির মতো গভীর অন্ধকারে চলাফেরা করে, আর অতিরিক্ত বোধের দ্বারা কোনো জিনিসকে না ছুঁয়েও তা জানতে পারে, এমন কি ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র থাকলে তাতে ধাক্কা খায় না, আগের থেকেই টের পেয়ে যায়।

প্রশ্ন : ছোটবেলাতে শিশুদের মন গড়েনা, প্রাণসত্তার বেলাতেও কি তাই?

উত্তর : না, মনের চেয়ে প্রাণসত্তার দ্রুত বাড় হয়। আগেই বলেছি যে ছেলেদের প্রাণসত্তা শীঘ্র নির্দিষ্ট আকার নেয়। প্রথমে তা থাকে জলের মতো তরল, তাই সহজেই তার উপর প্রভাবের ছাপ পড়ে, কারণ তখনও তা শক্ত দানা বাঁধেনি, মাখনের মতো নরম নমনীয়। কিন্তু কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে তাদের চরিত্র একটা স্থায়ী গঠন নিয়ে নেয়, তখন আর তা বদলানো যায় না, দোষ থাকলে তখন সংশোধনের দরকার হয়। সে হলো স্বতন্ত্র কথা। মন্দ স্বভাবকে সংশোধিত করতে হলে নিত্য শিক্ষার দ্বারা তাকে সঠিক পথে চালনা করতে হয়। ছোটো বয়সে সেটা সম্ভব, কিন্তু বেশি বয়সে তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সহজে হয়না, তখন মন্দ অভ্যাসকে সজোরে আঁকড়ে থাকাতে তাকে ভেঙে ফেলার দরকার হয়। কিন্তু ছোটোরা নমনীয় থাকে বলে তাদের বদলানো যায়, উন্নতি ঘটানো যায়, বোঝানো যায় যে আজকের চেয়ে কাল ভালো হবে।

প্রশ্ন : এই সব মন্দ অভ্যাস, যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা, এ কি প্রাণসত্তার দোষে?

উত্তর : তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন, ছেলেরা যারা নিজের জিনিস ঠিক রাখতে পারেনা, জিনিস নষ্ট করে কিংবা হারিয়ে ফেলে—তাদের ঐ স্বভাবের তিনটি কারণ আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে এদের জীবনীশক্তি কম, সেইজন্যই কিছু সামলাতে পারেনা, কোনো কিছুতে সাবধান হতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, বাস্তব জীবনে তাদের উৎসাহের অভাব, কোনো কিছুতে আঠা নেই, নিয়ম মেনে চলার বালাই নেই। কাপড়চোপড় ছেড়ে তারা এদিক ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে, খেলার শেষের পুতুলগুলো যত্রতত্র ছড়ানো থাকে, বইখাতা কোথায় রাখে তার ঠিকানা নেই, কলম কাগজ নোটবই প্রভৃতি নিত্যই হারায়। (এখানকার স্কুলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই এইরকম, বইটই প্রায়ই হারায়; আমি দেখেছি পড়ার বই সারারাত ফুলের টবের মধ্যে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট মতো হয়ে গেছে,

পেন্সিল কলম কত হারিয়েছে তার সংখ্যা নেই, বিস্তর কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, আমার কাছে জমা হয়েছে।) এ স্বভাব হয় অশিক্ষিত প্রকৃতি হতে, শিক্ষার অভাবে কোনো রীতিপদ্ধতি নেই। যারা কোনো জিনিস রাখতে পারে না, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তারা কোনো কিছু পাবার উপযুক্ত নয়। যারা জিনিসের মর্ম জানেনা তাদের কোনো কিছু পাবার অধিকার নেই। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন তাঁর নানা চিঠিতে। তিনি বলেছেন, ঘর করতে না জানলে কিছুই পেতে পারো না। ওটা কি ধরনের আত্মনিমগ্নতা যা খুবই খারাপ। বড়ো বয়সে এরা নিজেদের বাক্স দেরাজ ঘরের তাক প্রভৃতি গুছিয়ে রাখে না, সবই থাকে এলোমেলো জট পাকানো। বাইরের থেকে দেখলে মনে হবে তাদের ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন কিন্তু তাদের ড্রয়ার খুললেই দেখতে পাবে সেখানে একেবারে কুরুক্ষেত্র। সমস্তই অগোছালোভাবে জড়ো করা, শৃঙ্খলা কিছু নেই। অনেকে আছে বাইরের জিনিসের সম্বন্ধেও যেমন অগোছালো, নিজেদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও তেমনি, সব সময়েই এলোমেলো ভাব নিয়ে অব্যবস্থিতচিত্ত। আমি বরাবরই দেখি যারা জিনিসের ঠিক রাখতে পারে না তারা নিজেদের মাথারও ঠিক রাখতে পারে না। তাদের মাথায় পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা একসঙ্গে জট পাকিয়ে থাকে, তার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সংশ্লেষণ নেই। তারা নিজের মনোভাবকে গুছিয়ে নিতে অক্ষম হয়। এদের ঘরে ঢুকে যদি এদের দেরাজ খুলে দেখ এবং বইএর তাকের দিকে নজর দিতে পারো তাহলে দশ মিনিটের মধ্যে এদের মনের পরিচয় মিলে যাবে।

অপরপক্ষে একজন এমন মানুষ ছিলেন (কে তা পরে বলছি) যাঁর ঘরে অসংখ্য বইটই এবং জিনিসপত্র ঠাসা থাকত, কিন্তু তুমি যদি তার ভিতর থেকে মাত্র এক টুকরো কাগজ অন্য কোথাও সরিয়ে রাখো অমনি তিনি তা জানতে পেরে বলবেন, "কে আমার জিনিসে হাত দিয়েছে।" তুমি হয়তো এত জিনিস দেখে দিশেহারা হবে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনটা কোথায় আছে সবই তাঁর জানা। সেই ঘর গোছাতে গিয়ে যদি তুমি কোনো কিছু 'ওলট-পালট করো, তখন তিনি বলবেন, "তুমি আমার সবস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে।" আমি অবশ্য এটা শ্রীঅরবিন্দের কথাই বলছি। এরূপ স্থলে দারিদ্র্যের সঙ্গে শৃঙ্খলার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার যদি এক ডজন মাত্র বই আর অল্পমাত্র জিনিসপত্র থাকে তা গুছিয়ে রাখা সহজ বটে, কিন্তু আসল কথা বুদ্ধিপূর্বক সাজানো, বহু জিনিস হলেও ইচ্ছা থাকলে তা সম্ভব।

কেউ অসুস্থ বা অক্ষম হলে তার কথা অবশ্য আলাদা। তবুও একটা সীমা আছে ; আমি এমন অসুস্থ ব্যক্তির কথা জানি যে শয্যাগত থেকে বলেছে, "অমুক দেরাজটা খুলে তার বাঁ দিকের কোনে অমুক জিনিসের তলায় অমুকটা আছে দেখতে পাবে।" নিজে উঠতে না পারলেও কোন জিনিস কোথায় রয়েছে তার সব জানা। কিন্তু এমন কথা বাদ দিলেও আসল দরকার হলো একটা সুশৃঙ্খলা, যেমন দেখা যায় লাইব্রেরিতে, সেখানে বইগুলি তাকে তাকে এমন সুষ্ঠুভাবে সাজানো থাকে (যদিও একজনের দ্বারা হয় না) যে তুমি যদি তোমার কার্ড দেখিয়ে বলো "আমার অমুক বইটি চাই," তবে পনেরো মিনিট বা এমন কি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা মিলে যাবে, যদিও সেখানে প্রতি ঘরে ঘরে অসংখ্য বই রয়েছে।

একেই বলে শৃঙ্খলা। অবশ্য সেখানে অনেকজনে মিলে তার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তোমার নিজের ব্যাপারে তুমি নিজের জিনিসগুলো আর নিজের মনের চিন্তাগুলো ঠিক এইভাবে সাজিয়ে নেবে, যাতে কোথায় কি রইল তা তৎক্ষণাৎ জেনে ও বুঝে নিতে পারো। সে বুদ্ধিটুকু তোমার নিজের মধ্যেই, অন্য কারো নয়, যার দ্বারা তোমার জানা থাকে যে কোথায় কোন জিনিস রইল, বা অন্যত্র সরিয়ে রাখা হলো। যাদের এমন অভ্যাস থাকে তাদের চরিত্রে এবং কাজকর্মেও একটা শৃঙ্খলা থাকে। এতে সফল হলে আপন পার্থিব জীবনেও তারা উন্নতি করতে পারে। জীবনকে এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করলে তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নতুবা যথেচ্ছাচারে বিশৃঙ্খল জীবনকে একরূপ অনির্দিষ্টভাবে কাটানো, তাকে যথার্থ বেঁচে থাকা বলে না। কেবল অচেতনার সমুদ্রে নিত্য তরঙ্গাঘাতে ইতস্তত ভেসে বেড়ানো, তলতলে পাহাড়ের গায়ে নিত্য ধাক্কা খাওয়া যাবার জন্য ঢেউ এসে অন্যত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেল, এমনিভাবে প্রচুর ধাক্কা খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনিশ্চিত জীবন বহন করতে থাকা এক বিড়ম্বনা। তারপর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার এমন অবস্থা কেন হলো "তা জানিনা। এমন ধরনের কথা ভাবো কেন? "জানিনা।" এমন কাজটা করলে কেন? "জানিনা"—সকল প্রশ্নের ঐ একই উত্তর—"জানিনা"।

মূলতঃ বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হলো একটাই : নিজেকে জানা। আমরা এখানে জানতে এসেছি—আমরা কী, কেন রয়েছি এখানে, কেন এসেছি এখানে, কি করতে রয়েছি। তা যদি না জানি তবে জীবন তো শূন্য—নিজেরও কাছে পরেরও কাছে।

সুতরাং সে কথা যত গোড়া থেকে শিখতে শুরু করা যায় ততই ভালো। জীবন কেন ও জগৎ কেন সে সম্বন্ধে জানতে যত ছোটো বেলা থেকে আরম্ভ করা যায় ততই ভালো, এমন কি পাঁচ বছর বয়সেরও আগের থেকে। তারপর এ শিক্ষা শত বছর বয়স পর্যন্তও চলতে পারে। যার তাতে সর্বদাই পাবে নতুন নতুন বিস্ময়, কত অজানা কথা জানা, অজানা অনুভূতি লাভ করা, নতুন জ্ঞান অর্জন করা। আর যতই তুমি জানবে ততই বুঝবে যে আরো অনেক জানবার আছে। আমি এ কথা বলতে পারি যে নির্বোধ যারা হয় তারাই কেবল বলে যে আমি সব জানি। তারাই কেবল এসে বলে, "ও! এটা তো আমি জানতাম। এ সবই জানতাম।" ওতেই তাদের চেনা যায়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন—"প্রত্যেকেরই চরিত্রের মধ্যে দুটি বিপরীত ভাব থাকে, একই জিনিসের আলোর দিক ও অন্ধকার দিকের মতো।" কেন তা হয়? অন্ধকারকে বাদ দিয়ে আলোটাই কেবল কেন থাকেনা?

উত্তর : তাই থাকবে, যদি তুমি অন্ধকারটাকে ছেঁটে বাদ দিতে পারো ; কিন্তু তাকে আগে তাড়ানো চাই। আপনা হতে তা যায় না। সমগ্র জগৎটাই হলো ভালোমন্দ বিশ্রিত। কোনো জিনিস এমন হবেনা যার আলো অন্ধকার দুটো দিক নেই। বস্তুত অন্ধকার আছে বলেই তুমি আলোকে স্পষ্ট করে দেখতে পাও। জগৎ এমনি ভাবেই তৈরি, সুতরাং কেবল আলোটি বেছে নিতে হলে তোমাকে অন্ধকার দূর করার জন্য চেষ্টাকৃত সাধনা করতে হবে। এই কথাই ওখানে তোমাদের বুঝিয়েছি, তা ছাড়া আরো কিছু বলেছি ;

বলেছি যে ঐ অন্ধকারই হলো একটা নিদর্শন স্বরূপ, যাকে জেনে তোমার প্রকৃতির মধ্যে তাকে জয় করতে হবে, তবেই তুমি উপলব্ধি করবে যে এখানে তুমি এসেছ কি করতে। যদি কোনো কাজের মধ্যে তোমার অংশ থাকে, যদি তোমার এখানে বিশেষ কিছু কর্ম করবার থাকে, তাহলে তার সঙ্গে এমন বাধাও থাকবে যা তোমার মধ্যে প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠবে, যাতে জানা যাবে যে সেটিকে জয় করা বিশেষ দরকার এবং তা তোমার অবশ্য করণীয়ের মধ্যে। যদি তোমাকে এমন বাধাবিঘ্ন জয় করতে হয় যা পৃথিবীতে সর্বত্রই আছে তাহলে তাকে জয় করা খুব কঠিন কাজ হবে (তার জন্য এক বিশেষ চেতনা ও বিশাল শক্তির দরকার), কিন্তু তোমার আপন আয়ত্তের মধ্যে যে অন্ধকার বা বাধাবিঘ্ন থাকে, তাকে জয় করা তোমার তো নিজের হাতের মধ্যেই রইল : সর্বদা আপন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে তুমি তৎক্ষণাৎ ও সরাসরি ভাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে।

"বুলেটিনে" শ্রীঅরবিন্দের লেখা সেই বিখ্যাত চিঠি "Evil Persona" (মন্দজন) পড়োনি ? সেই চিঠিতে এই কথা পরিষ্কার ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া আছে।

—শ্রীমা

পথের কথা

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

অসত্যের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেবার উপায় আছে একটিমাত্র।

তা হলো, আমাদের চেতনার মধ্যে যা কিছু এমন আছে যা ভগবানের উপস্থিতি-বোধকে বাধা দেয়, তাকে নিঃশেষে নির্মূল করা।

—শ্রীমা
৩১-১২-১৯৭২

মা : হাঁ, ঐ কথাটাই আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলি।

ও কথা একেবারে খাঁটি সত্য, পুরোপুরি সত্য। তাকে বুঝে নিতে পারা হয়তো সহজ নয়, কিন্তু অতি গভীরতম সত্য হলো তাই।

আমাদের মধ্যে যা কিছু ভগবানের অভিব্যক্তিকে আবৃত ও বিঘ্নিত ও বিকৃত ও নিবৃত্ত করে তা কেবল ঐ জিনিস : মা অসত্য।

ভক্ত : কিন্তু তা করতে পারা খুবই মেহনতের ব্যাপার!

মা : আমি সর্বদাই তাই ক'রে চলেছি—প্রতিদিন ও সারাদিন ধরে, এমন কি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও। বেঁচে থাকার মূল্য একমাত্র তাই।

১০ মার্চ, ১৯৭৩

ভক্ত : ঠিক বলতে পারিনা, কিন্তু যখনই আমি সেই নূতনতর চেতনার সংস্পর্শে আসতে চেষ্টা করি তখনই অনুভব করতে থাকি একটা জ্যোতির্ময় বিশালতা, যেমন আপনি বলে থাকেন।

মা : হাঁ।

ভক্ত : কিন্তু আমার বোধ হয় যে তা অটল স্থির, তার মধ্যে তাই একইভাবে থাকা যায়, কিন্তু...

মা : তাই বটে। আমি তা বোধ করি।

ভক্ত : নিজেকে সর্বক্ষণ তাতে ভরে থাকাই কি যথেষ্ট, আর কিছু করার দরকার হয়না?

মা : আমি তো তাই মনে করি। সর্বদাই কেবল বলি : তুমি যা চাও, তুমি যা চাও...তাই হোক যেমন তুমি চাও, আমি তাই যেন করি যেমন তুমি চাইবে, কেবল তাই যেন জানি তুমি কি চাও।

আরো বলি : তুমি ছাড়া তো মৃত্যু, তোমাকে নিয়েই জীবন। মৃত্যু মানে দৈহিক মৃত্যু নয়, কিন্তু তাও হতে পারে ; এখন যদি আমি তাঁর সংস্পর্শ ছাড়া হই তাহলে তাই হবে, কিন্তু সে যে অসম্ভব। আমি নিত্য বোধ করি যে আমিই তাই—বর্তমান চেতনার সকল বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও। এই হলো কথা। আর যখন আমি কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি, সে যেই কেন হোক (না হাতের বুঠো খুলে দেখালেন যেন আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন), আমি কেবল এই করি। (পুনরায় অনুরূপ ভঙ্গী)

(নীরব থেকে)

সব সময়ের জন্য (খুব আশ্চর্যের কথা) আমি বোধ করি যেন আমি এক ক্ষুদ্র শিশু, আভ্যন্তরীণ আশ্রয় নিয়ে আছি (কেমন ক'রে বলি)—আছি এক ভগবৎ চেতনার কোলের মধ্যে—সকল দিক দিয়ে ঘেরা হয়ে। *

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতাব্দীপূর্তি উৎসবে ভাষণ

গৌরী ধর্মপাল

১৯৬১ থেকে সুরু করে ১৯৭২ পর্যন্ত, এই কিঞ্চিদধিক এক দশকের মধ্যে বাংলা-দেশের তথা ভারতবর্ষের তিনজন মহানায়কের তিনজন আদিত্যপ্রতিম পুরুষের, জন্মশতাব্দী একে একে পূর্ণ হল। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতি যদি হয় একটি সুবিশাল অরণ্যানী তাহলে এঁরা তিনজনে সেই অরণ্যানীর তিনটি মহাকায় বনস্পতি—অতিদূর পর্যন্ত প্রসারিত তাঁদের শাখাপ্রশাখা ; অতি গভীর পর্যন্ত বিসর্পিত তাঁদের মূল। ভারতীয় সংস্কৃতি যদি হয় পূর্বাপরসমুদ্রাবগাহী দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়, তাহলে এঁরা তিনজনে তার তিনটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। এঁদের উচ্চতায় বিস্ময়ে পাতায় ফুলে ফলে ধড়ুতে পাথরে মাটিতে যে তফাৎ আছে তার তারতম্য বিচার করার ক্ষমতা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না, সে-বিচারের কোন প্রয়োজনও দেখি না। তাঁদের মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারি, তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে, মুখে আমার চোখ খুয়েছে, আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমার চরণ, তাহলেই আমরা ধন্য হব, পুণ্য হব, কৃতকৃত্য হব ; তাহলেই তাঁদের সর্বার্থসিদ্ধির সাধনা পূর্ণ হবে আমাদের জীবনে।

আমাদের জীবনটাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে এসেছিলেন এঁরা—এই তিনজন শিল্পী, মহাশিল্পী, মহাজীবনের শিল্পী। এঁদের মত এবং পথ, রুচি এবং প্রকৃতি, সাধনা এবং সিদ্ধিতে অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু একটি জায়গায় এঁরা তিনজনেই এক। সেটি হল তাঁদের সুগভীর দেশপ্রেম। দেশকে তাঁরা ভালবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। বিদেশে দীর্ঘকাল বাস করে বিদেশের সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ ফসল তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার পরেও এবং সমস্ত বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করার পরেও, দেশের প্রতি তাঁদের ভাল-বাসা শুধু যে অটুট থেকেছে তাই নয়, শতগুণে বেড়ে গেছে। অনেক দেশ ঘুরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে...

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বিবেকানন্দ বলেছেন, আগেও দেশকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন দেশের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। আর সুদীর্ঘ চোদ্দ বছরব্যাপী ইংলণ্ড প্রবাস এবং বিদেশী শিক্ষাগ্রহণের পর, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাকি জীবন কাটিয়েছেন দেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় ; দেশের সংস্কৃতির লুপ্ত এবং গুপ্ত রত্নগুলির পুনরাবিষ্কারে ; আর সমগ্র দেশের হয়ে এক সর্বস্বপণ-করা অভিনব যোগসাধনায়। মৃণালিনী দেবীকে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত পত্রে তিনি বলেছিলেন, 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি,

ভক্তি করি, পূজা করি।' তাঁর দেশ, তাঁর ধর্ম, তাঁর যোগ তাঁর কাছে একে তিন, তিনে এক।

দেশকে সবাই ভালবাসে। জন্মভূমি সবার কাছেই স্বর্গের বাড়া। এই জল মাটি হাওয়া গাছপালা পশুপাখি, এই আপন-করা গন্ধ, এই প্রগাঢ় প্রেমরস—এ কি ভালো না বেসে পারা যায়? কিন্তু তবু বলব, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেমের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, দেশপ্রেম তাঁদের সঙ্কীর্ণ করেনি, তথাকথিত nationalist করেনি, তাঁদের উদার করেছে, বিশ্বপ্রেমিক করেছে, বিশ্বমানব করেছে। মাত্র এগারো বছরের ব্যবধানে, একই নগরে আমাদের এই কলকাতায় এই তিনজন বিশ্বমানবের জন্ম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিস্ময়ের ঘটনা। দ্বিতীয়ত, এই ভালবাসা শুধুমাত্র অন্ধ আবেগপ্রসূত নয়, এর গভীর কারণ আছে। এই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মধ্যে তাঁরা এমন কিছু দেখেছিলেন, এমন ঔদার্য এমন ঐশ্বর্য এমন ব্যাপ্তি, এমন আকাশচুম্বিতা, অতলস্পর্শতা এবং সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা—যা অন্য সমস্ত সংস্কৃতির তুলনায় তাঁদের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। আর তৃতীয়ত এ ভালবাসা তাঁদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেয়নি। শুধু আক্ষেপ নয়, শুধু আহা উহু নয়, কী করলে দেশের সত্যিকার ভাল হয়, এ ভাবনা তাঁদের শয়নে-স্বপনে নিশিদিন তাড়না করেছে অঙ্কুশের মত, তাঁদের পাগল করেছে, ঘরছাড়া করেছে। তাঁরা শুধু অলস প্রেমিক নন, তাঁরা কর্মী, তাঁরা শিল্পী, তাঁরা স্থপতি। ভারতবর্ষের বর্তমান তাঁদের কাঁদিয়েছে, ভারতবর্ষের অতীত তাঁদের সান্ত্বনা প্রেরণা এবং শক্তি যুগিয়েছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তাঁদের বলিষ্ঠ হাতে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে, উঠছে।

এঁরা তিনজনেই ভারতবর্ষের এক মহিমময় স্বর্ণযুগের, এক পৃথিবীজোড়া মৈত্রী-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে পৃথিবীর সব মানুষের মহামিলনের মেলা বসেছে। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, অতীত ভারতবর্ষের গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় তার প্রভা কীর্ণ বিকীর্ণ পরিকীর্ণ করে, হিরণ্য দ্যুতি সবিতার মতো জাগছে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ, জননী জগন্মোহিনী জগত্তারিণী ভারতবর্ষ আর, শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন, এই ভারতবর্ষের পুরাণ মঞ্চে নবীন সূত্রধার হয়ে, তিনি এক পৃথিবীজোড়া আশ্চর্য সপ্তাঙ্ক মহানাটকের চতুর্থ অঙ্কের মোহড়া দিচ্ছেন-নিচ্ছেন। সেই নাটকের রচয়িতা মহাকাল। তার প্রথম অঙ্কে জড়ের উদ্দাম তাল-বেতালের নৃত্য। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রাণের তাণ্ডব। তৃতীয় অঙ্কে মনের চরণপাত, এক অতিনব চঞ্চল ছন্দে। এই জড় প্রাণ আর মন—এরা তিনজনেই কী যেন খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না, তাদের বাঁচার ভেতর এক বনের পাখির ডাক বারেবারে এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু তাদের সাধ্য নেই খাঁচার শিক-শিকল ভেঙে উড়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, এ শিকল ভাঙতে হবে, সাধ্য-সাধনা করে নামাতে হবে মনের ওপারে যা সেই অতিমানসকে। তখন জড় প্রাণ আর মনের বাঁধাবাঁধি সীমানা ছাড়িয়ে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হবে মানুষের চেতনা। আনন্দ চিৎ সৎ-এর সঙ্গে সচেতন সন্ধি হবে তার, বিগ্রহ ধরবে সে মানুষে মানুষে। বিরহিণী স্বপ্নগর্ভভারাতুরা পৃথিবী যাবে তার পতিগৃহে, তার নিজ নিকেতনে, ছিদ্রহীন সুখের বাসরে, আনন্দভুবনে।

সমাজ সংসার দেশ দেশকর্ম সব ছেড়ে, সমাজ সংসার দেশ দেশকর্ম সব কিছুকে পরিপূর্ণ করার জন্যে, পণ্ডিচেরীর সাধনপীঠে অতিসুকঠিন সাধনায় নিমগ্ন হয়ে এই চতুর্থ অঙ্কটি রচেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

স্বপ্নদ্রষ্টাদের জন্মশতাব্দী একে একে পূর্ণ হল। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন তো কই পূর্ণ হল না? অবশ্য চূর্ণও হয়নি, কিন্তু পূর্ণও তো হয়নি? এর কারণ কী? কারণটি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীর একটি পঙ্‌ক্তিতে—

A moment sees, the ages toil to express.
ঝাঁকিদর্শন পলকের
যুগ যুগ তারি উচ্চারণের সাধনা।

সত্যদ্রষ্টারা সত্যকে দর্শন করেন বিদ্যুৎ-উদ্ভাসে—সে দর্শন অমোঘ অভ্রান্ত অব্যর্থ, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে বিশেষ করে সঙ্ঘজীবনে, সমাজজীবনে, জাতীয়জীবনে সিদ্ধরূপ ধরতে তা কত সময় নেবে, তা বলা কঠিন। কেননা সে-সিদ্ধিকে ফলিয়ে তোলার জন্যে বহু পুরুষের সাধনার প্রয়োজন। ভূগর্ভে প্রোথিত হয়েছে একটি বজ্র-বীজ। তাকে উদ্ভিন্ন করতে হলে চাই বহুজনের বিলিত বজ্রবীর্য। যত বেশিসংখ্যক মানুষ সচেতনভাবে যোগ দেবে এ সাধনায়, তার সিদ্ধির লগ্নও ততই ঘনিয়ে আসবে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি চমৎকার শ্লোক আছে

কলিঃ শয়ানো ভবতি, সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি, কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥
—চরৈব।
শুয়ে শুয়ে থাকে যে, সে কলি হয়,
সে-ই তো দ্বাপর, উঠে বসে যে-ই।
উঠে যে দাঁড়ায়, সে-ই হয় ত্রেতা,
চলতে যে থাকে, সত্য সে-ই॥ চলতে থাক।

কথাটি যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনি জাতির জীবনেও সত্য। যে-জাতির লোকেরা খালি শুয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটায়, তারা রয়েছে কলিযুগে। যারা ঘুম ছেড়ে উঠে বসেছে তারা দ্বাপর। আলস্য ঝেড়ে ফেলে যারা উঠে দাঁড়িয়েছে তারা ত্রেতা। আর যারা চলেছে তারা সত্য। চলতে চলতেই তারা সত্যকে পাবে। এ চলা কেমন চলা? ঘোড়দৌড় নয়, চক্র-বর্তনি নয়, ঘুরপথে ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় ফিরে আসা নয়, এ হল 'মানব-বর্তনি' human cycle, শাঁখের রেখার মত একটার পর একটা চক্র পেরিয়ে উজিয়ে চলা সেই একটি বিন্দুর দিকে, যেখানে ফুঁ দিয়ে তাঁর পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন পার্থসারথি। ডাক দিচ্ছেন সেই কবে থেকে।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না
বেজে ওঠে পঞ্চমে সুর
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর...

যুগ যুগ ধরে যেন একটাই ছবি আঁকা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য, যীশুখৃষ্টের স্বর্গরাজ্য, পুরাণের সত্যযুগ, বৈষ্ণবদের বৈকুণ্ঠ, শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব-যুগ—চূড়ার নানা ছবি, এক একজন এসে একটু করে রং দিচ্ছেন, রঙান দিচ্ছেন। বিশ্বস্রষ্টার কল্পনা যেন এক একজন মহাশিল্পীকে আশ্রয় করে একটু একটু করে মূর্ত হয়ে উঠছে। একটাই প্রিয় ছবিকে বারে বারে ঘুরে ফিরে আঁকছেন তিনি। সেই ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি যেন বলতে চান, আমি এক থেকে বহু হয়েছিলাম, আবার আমি বহু থেকে এক হব। পিণ্ডাকৃতি সর্বসন একঘেয়ে এক নয়। ভেদাভেদের বিচিত্র সুষমায় এক! 'হারানো ছড়ানো পাগল খুঁজচে ফিরে সে আপন হবে।' সেই পাগলের আকুতি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করে বলছে—We must renew the secret bond in things.

বাঁধতেই হবে আবার নতুন করে
জীবে জীবে জড়ে লুকোন প্রেমের রাখী।

আর বিয়োগ নয়, বিয়োগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এবার যোগ। পূর্ণযোগ। সব দিয়ে সব পাওয়া। সব দিতে হবে—এই হল সাধনা। সব পেতে হবে—এই হল লক্ষ্য।

মানুষের মনে এ দ্বন্দ্বটা অনেকদিনের। দেব? না, নেব? পাব, না, ছাড়ব? হাঁ বলব, না, না বলব? নেতি, না, শুন্য?

এই দ্বন্দ্বেরই বিশ্বরূপ হল সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, বাইরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে অন্তরের ঐশ্বর্যের গরমিল, অর্থ ও কামের সঙ্গে ধর্ম ও মোক্ষের বিরোধ, পরার সঙ্গে অপরার আড়ি, অভ্যুদয়ের সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের ঝগড়া, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর কোঁদল, ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাসের সঙ্গে গার্হস্থ্যের দলাদলি, শ্রেয়-র সঙ্গে প্রেয়:-র খেয়োখেয়ি; যা ভালো, তার সঙ্গে যা ভালো লাগে তার মুখ-না-দেখাদেখি।

এই দোটানার মধ্যে দুলছে মানুষ। এই একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে ভর করে হেলান দিয়ে আছে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির ইমারৎ। যে-কোন মুহূর্তে তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, হচ্ছেও। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পূর্ব আর পশ্চিমের মুখোমুখির ফলে এই দোটানা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

এই দ্বন্দ্বের, দ্বিধার, দোটানার মূল স্বরূপটি কী? যাজ্ঞবল্ক্যের শব্দ ধার করে বলতে পারি, মানুষ একদিকে চাইছে উপকরণ আর একদিকে চাইছে অমৃতত্ব। উপকরণের সিদ্ধি দিয়ে গড়ে উঠছে তার সভ্যতা—আগুন, লাঙল, হাতিয়ার, বাড়ি, রাস্তা, সহস্র যন্ত্র, কারখানা, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, বিমান, রকেট, চন্দ্রযান, শুক্রযান। আর অমৃতত্বের সাধনা দিয়ে গড়ে উঠছে তার সংস্কৃতি—কাব্য শিল্প সাহিত্য দর্শন যোগ আত্ম-বিজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা। সভ্যতা আনছে তার সুখ-সুবিধা আরাম, কিন্তু সেই সঙ্গে অতৃপ্তি। তার অশনায়, তার খাই-খাই আর কিছুতেই ঘুচছে না, রাক্ষসী সুরসার মতো তার হাঁ ক্রমশ বড় হচ্ছে আর বড় হচ্ছে।...আর সংস্কৃতি আনছে তার শান্তি স্বস্তি আনন্দ রস, কিন্তু

সেই সঙ্গে অপূর্ণতার বেদনায় তীব্রদহন। তার 'উপনারা' উতলাপানামি আর কিছুতেই ঘুচছে না।

তরুণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কি তার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গ শিশু কোন বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।

সংস্কৃতিহীন সভ্যতা বুওহীন অনলঙ্কৃত কবন্ধের মতো বীভৎস, তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। আর সভ্যতাহীন সংস্কৃতি নীড়হারা পাখির মতো শূন্যে উড্ডীন—কোথায় তার পা রাখার জায়গা? কোথায় তার নীড়? সে-সংস্কৃতি আকাশকুসুমের মত অন্তরিক্ষে ভাসমান, সে ফুটবে কোথায়?

ঐ আকাশকুসুমকে যদি এই পৃথিবীর ধুলো-জল-কাদা-পাঁক-মাটিতে ফোটান যায়, ঐ আকাশের সোনার হাঁসটি যদি সেই পদ্মবনে বাসা বাঁধে, স্বর্গ মর্ত্য যদি একাকার হয়ে যায়, 'দিব্য বসু' স্বর্গের ধন আর 'পার্থিব বসু' মর্ত্যের ধন যদি মিলে মিশে যায়, তাহলেই, একমাত্র তা হলেই, সভ্যতার অতৃপ্তি আর সংস্কৃতির অপূর্ণতার বেদনা ঘোচে।

এই ভারতবর্ষের মাটিতে একদিন এই অখণ্ড অদ্বৈত পূর্ণদৃষ্টির সাধনা এবং সিদ্ধি ঘটেছিল। তার প্রবর্তক ছিলেন বেদের ঋষিরা। তাঁরা বললেন, এই পৃথিবীই হচ্ছেন হিরণ্যবক্ষা অদিতি, এই ভোগবতীই হচ্ছেন ভূগবতী, তাঁর যা-কিছু ন্যূনতা আছে, অপূর্ণতা আছে, তা ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠছে প্রজাপতির স্পর্শে। রূপদক্ষ শিল্পী কবি প্রজাপতি অনেক যুগ ধরে তাঁকে গড়ছেন একটু একটু করে।

ত্বম্ যশি-আবপনী জনানাম্, অদিতিঃ কামদুঘাপপ্রথানা।
যত্ ত উনং তত্ ত আ পূরয়াতি, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য॥
(অথর্ববেদ ১২। ৬১)

মানুষ জুড়াও, ঝাড় বাছ নাও, তুমি কামধেনু, যশীনা অদিতি, বেড়েই চলেছ, বেড়েই চলেছ, তোমার যা কিছু হানি খুঁত ত্রুটি পুরিয়ে দেন তা, দিন তা, দেবেন, ঋতের প্রথম সূনু প্রজাপতি। তাঁরা বললেন, ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যম্ অস্তি। ন চেদ্ ইহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ॥
(কেনোপনিষদ্ ২। ৫)

এখানে, এ দেহে, এই পৃথিবীতে, যদি জানে কেউ, তবে হাঁ, সে আছে। এখানে, এ দেহে, এই পৃথিবীতে, যদি না জানে, তো, মহাবিনাশ। কি করে জানব? কি করে সত্যের এই হিরণ্ময় কিরণময় জীবনময় মরণময় অন্নময় প্রাণময় মনোময় আবরণ-আভরণ ঘুচিয়ে সত্যকে দেখব তার পূর্ণ মহিমায়? আমরা যে অযোগ্য? 'পুনুকামো হি মর্ত্যঃ', মানুষের অনেক যে কামনা। ঋষি বললেন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, ও একটু ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে-খন, দেবতা ক্ষমা না করে পারবেন কেন? তাঁর সৃষ্টির মূলেও যে কামনা! ও নিয়ে প্যানপ্যান না করে কামনাকে বৃহৎ করে দাও। 'উরুং নো লোকং পৃথিবী কৃণোতু' বিশাল লোক দাও পৃথিবী আমাদের, দাও আয়ত লোচন, চোখ বড় কর, চোখ যেন বড় বড় হয়ে যায় মহাবিস্ময়ে, মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে

সেই বিস্ময় নিয়ে স্মরণ করতে করতে যেন গান জাগে, ধ্রুবপদে বাঁধা খেয়ালী বিশ্ব-তানে গলা মেলান বিচিত্র গান। 'উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম'—যেখানেতে অবাধ ছুটি সেখানে মেলায় ডানা দাও ওগো দেবতারা, সেই বৃহতের মধ্যেই মিলব আমরা। আমাদের বৃহৎ প্রতিটি ক্ষুদ্রকে গভীর করে স্পর্শ করে সমৃদ্ধ করবে, আমাদের ভূমা প্রতিটি অল্পে আনপনা আঁকবে, আমাদের মহান প্রতিটি অণুতে অণুতে হবে, প্রত্যেকের প্রতিটি কামনাকে বর করে সবার আকাশের শিকেয় তুলতে তুলতে আমরা হব আপ্তকাম সর্বকাম মহর্লোকের বাসিন্দা।

ভূর্ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি লোক পেরিয়ে মহর্লোকের এলাকা। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় আনন্দ চিৎ সৎ—দেবতার এই তিনটি অবস্থাবতী, আর দেহ প্রাণ মন—মানুষের এই তিনটি 'অবস্থাবতী' এক ওতপ্রোত সুতোয় গাঁথা। ইন্দ্রধনুর মতো এরা ফুটে আছে একই আকাশের বুকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নিয়ে। তার একদিকে অন্ধকারে কাঁদছে পৃথিবী, অন্যদিকে সূর্য অপেক্ষমাণ প্রসন্ন মহিমায়। এইখানে দাঁড়িয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি দেখলেন আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গের দিকে ধাপে ধাপে উঠে আসছে মানুষ। 'ধনে জনে পরিপূর্ণা শস্যশ্যামলা এই সমস্ত পৃথিবী আমারই ভোগবতী, আমি তার ভগবান্। আমি যুবা, চিরকাল তাই থাকব। আমি বলিষ্ঠ, আশীতেও আশিষ্ঠ, সম্রাট্'—এই মোহানন্দই হল সেই মহানন্দের প্রথম ধাপ। মনোমুগ্ধ মানুষের পক্ষে এই হল আনন্দের চরম সীমা। কিন্তু এই চরম সীমার খাঁচাটির ভেতরে অনন্ত আনন্দের পাখি কেবলই পাখা ঝাপটাচ্ছে, নখ আঁচড়াচ্ছে। তারি তাড়নায় মানুষ ঐ আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে একটু একটু করে উঠছে আর দেখছে, যতই ছাড়ছি, ততই বাড়ছি, ততই আনন্দ যাচ্ছে বেড়ে। এমনি করতে করতে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দে এসে পৌঁছল সে, যখন সে সব ছেড়েছে আর সব পেয়েছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', তখন সে দেখতে পেল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে তেন জাতানি জীবন্তি তৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' আনন্দ থেকেই জন্মাচ্ছে এই সমস্ত কিছু, আনন্দেই বেঁচে আছে, আনন্দের দিকেই চলেছে, প্রবেশ করছে আনন্দেই। তখন সে গান গেয়ে গেয়ে বলে, অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য, আমিই ঋতের প্রথম পুত্র। আমি প্রজাপতি। আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ। আমিই জড়, আমিই আত্মা। আমিই সব। আর ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এখন প্রতিটি বিষয়ই অনন্ত বিস্ময়ের খনি, বিষয়ানন্দেই ব্রহ্মানন্দ।

এই আত্মবিজ্ঞান, সর্ববিজ্ঞান, দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ণ, তাদের সরস সজীব সতেজ নবীন বৃহৎ করা, দাম্পত্য-পারিবারিক-গার্হস্থ্য জীবন, আশ্রম জীবন, অত্যাপ্রমি-জীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি অলিতে গলিতে গর্তে-মর্তে, খানায় খন্দে, আঁশগাদা-পাঁশগাদাতে এই বাঁচার মতো বাঁচার মন্ত্র, এই বিশ্বপ্রজাপতির পাদস্পৃষ্ট ব্রহ্মকমলের রেণু ছড়িয়ে দেওয়া—এই হল ভারতবর্ষকে উত্তরকালের পৃথিবীকে বেদের ঋষিদের সুদক্ষিণ দান। তারি বিস্তারিত প্রয়োগ তন্ত্রে। তারি জীবন্ত বিগ্রহ বাসুদেব দেবকীনন্দন ব্রজবল্লভ পুতনাসূদন কংসধ্বংসী নিরন্তর সংগ্রামশীল দুর্জনের মহাভয় সজ্জনবন্ধু পার্থসারথি ব্রহ্মক্ষত্রিয় কৃষ্ণ। সমগ্র ভারতবর্ষের হয়ে, সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত

মানুষের হবে এই উত্তরাধিকারকে তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য সমুজ্জ্বল আশ্চর্য আধারে গ্রহণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

'I have been given a religious and philosophical mission, to re-explain the Veda and Vedanta (i.e. Upanishads) in the ancient sense which I have recovered by actual experience in Yoga, and to popularise the new system of Yoga (new in arrangement and object) which has been revealed to me.'

'আমাকে একটি ব্রত দেওয়া হয়েছে—তা হল বেদ এবং বেদান্তের (অর্থাৎ উপনিষদের) পুনর্ব্যাখ্যান তার প্রাচীন অর্থে, যে-অর্থ আমি আবিষ্কার করেছি যোগের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ; আর সেই নতুন যোগপদ্ধতির প্রচার—নতুন মানে পারম্পর্যে এবং উদ্দেশ্যে নতুন—যা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'The Arya presents a new philosophy, and a new method of Yoga, and everything that is new, takes time to get a hearing. Of course, in reality, it is only the old brought back again, but so old, that it has been forgotten.'

'আর্যপত্রিকা দিচ্ছে একটি নতুন দর্শন, যোগের একটি নতুন পদ্ধতি। যা কিছু নতুন, শ্রোতা পেতে তার সময় লাগে। অবশ্য, আসলে, পুরোনকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে নতুন করে। কিন্তু সে পুরোন এত পুরোন যে তা ভুলে গেছে সবাই।'

এই পুরাণ-চিত্রটিকে নতুন করে নতুন রং দিয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানচিত্র করে আঁকলেন শ্রীঅরবিন্দ। বললেন, এই মন-গড়া খণ্ডিত বিখণ্ডিত হিংসায় উন্মত্ত ঈর্ষাজর্জর কামক্লিন্ন ক্রোধান্ধ মদমত্ত লোভলকলক পৃথিবীকে আমাদের উত্তর পুরুষের, আত্মপুরুষের বাসযোগ্য করতে হলে একজন-দুজন মহাপুরুষ, গুটি পাঁচছয় সংস্কার, গোটা কয়েক ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন—এদিয়ে স্থায়ী কোন ফল হবে না। এগুলি প্রদীপ, মোমবাতি, লণ্ঠন বা মশালের মতো কিছুকাল ধরে একটি বা কয়েকটি স্থানকে আলোকিত করে তারপর নিবে যায়। কিছুদিন হৈ হৈ হয়, কিছু মানুষ জেগে ওঠে, অনেক মানুষ মেতে ওঠে, কিন্তু তারপর আবার যে-অন্ধকার সে-ই অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পথের কাঁটা একলা দলতে দলতে বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালাতে জ্বালাতে নিঃসঙ্গ অভাগা মানবপ্রেমিকদের পথচলা। এতে হবে না। সামগ্রিক ভাবে মানুষের চেতনার উত্তরায়ণ চাই। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জ্বালাতে হবে একটি একলক্ষ্য পাওয়ারের বাল্‌ব্‌।

If the light that is being born increases; if the number of individuals who seek to realise the possibility in themselves and in the world grows large, and they get nearer the right way, then the spirit who is here in man, now a concealed divinity, a developing light and power, will descend more fully, as the Avatar of a yet unseen and unguessed Godhead, from

above, into the soul of mankind, and into the great individualities in whom the light and power are the strongest. (Human Cycle, p. 361)

'যে জ্যোতি জন্ম নিচ্ছে তা যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে, যদি এ সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে ফলিয়ে তোলার জন্যে উৎসুক সাধকের সংখ্যা হয় অনেক, আর তারা ঠিক পথের কাছাকাছি যায়, তাহলে এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা, যে ক্রমবর্ধমান জ্যোতি এবং শক্তি, যে দেবতা গুহাহিত হয়ে আছেন, তিনি পূর্ণতর রূপে ওপর থেকে নেমে আসবেন এক অদৃষ্টপূর্ব অকল্পিতপূর্ব ঈশ্বরের অবতার হয়ে, নেমে আসবেন প্রবেশ করবেন মানুষী চেতনায়, আর সেই সব সুবহান্ ব্যক্তিসত্তায়, যাঁদের মধ্যে জ্যোতি এবং শক্তি হচ্ছে প্রবলতম'। এ কথা সত্য যে প্রথম অবস্থায় সমস্ত মানুষ সেই স্তরে উঠতে পারবে না; কিন্তু যাঁরা এই যুগান্তরের প্রবর্তক তাঁরা কখনোই এই মতবাদে বিশ্বাস করবেন না যে বেশির ভাগ মানুষ বরাবরই নিচের স্তরে থেকে যাবে আর কেবলমাত্র কয়েকজন ভাগ্যবানই উঠতে পারবে মুক্ত আলোহাওয়ার স্তরে, but will start from the standpoint of the great spirits who have striven to regenerate the life of the earth and held that faith in spite of all previous failures. (ঐ পৃ. ৩৫৯) যে সব মহাত্মারা এই পৃথিবীর জীবনকে নতুন ভাবে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন এবং আগের সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে-বিশ্বাস কিছুতেই হারান নি, তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই আরম্ভ করবেন এঁরা, এই নতুন যুগের প্রবর্তকেরা।'

এই age of the Truth (ঐ পৃ. ৩৪৩) সত্যযুগকে কাছিয়ে আনার প্রথম প্রস্তুতি হল, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মানুষের মধ্যে দেবতাত্মার আবিষ্কারকেই সমাজের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান, নীতি, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি—সব কিছুর লক্ষ্য করে তোলা। শিক্ষার মধ্যে সমস্ত বিদ্যার স্থান থাকবে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে শুধু দক্ষতা-অর্জন নয়, তার উদ্দেশ্য হবে আত্মসংস্কৃতি, আত্মাকে খোঁজা। ভূতবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান শুধু প্রকৃতির প্রক্রিয়ার খবর নিয়ে এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত হবে না, প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে তারা খুঁজবে পুরুষকে। অর্থনীতির উদ্দেশ্য হবে না একটা বিরাট বিকট উৎপাদনের যন্ত্র তৈরি করা, সে দেবে সমস্ত মানুষকে তার নিজস্ব রুচি প্রকৃতি এবং ক্ষমতা অর্থাৎ স্বধর্ম অনুসারে কর্ম করার আনন্দ, আর সেই সঙ্গে তার অন্তর্জীবনকে গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট অবসর। সে গড়ে তুলবে সবার জন্য একটি সরল সমৃদ্ধ সুন্দর জীবন—a simply rich and beautiful life for all. রাজনীতি মানুষকে রাষ্ট্র নামক যন্ত্র-দানবের দাস করবে না। এই রক্তপিপাসু দানবের পূজাবেদীতে অন্য জাতির অন্য ধর্মের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার প্রেরণা যোগাবে না, রাজনীতি আত্মাকে, জাতির স্বধর্মকে আবিষ্কার করে তাকে বিকশিত করবে, সমস্ত মানুষের কল্যাণ কর্মে তাকে নিয়োজিত করবে। সেই কল্যাণকর্মটি কী?

That work would be to find the divine self in the individual and the collectivity, and to realise spiritually, mentally, vitally,

materially its greatest, largest, richest and deepest possibilities in the inner life of all and their outer action and nature.

'সেই কল্যাণকর্মটি হল প্রতিটি ব্যক্তিতে, প্রতিটি সমূহে, সেই দেবতাত্মাকে খুঁজে খুঁজে বার করা, এবং আমাদের মনে প্রাণে জড়ে তার মহত্তম গুরুতম গভীরতম সম্ভাবনাগুলিকে সবার অন্তর্জীবনে বহির্জীবনে মূর্ত করে তোলা'। (ঐ ১৪৪ পৃঃ)

কবি-রাজনীতিক শ্রীঅরবিন্দ সেই সাধনাই করেছেন। উত্তরপাড়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন, সনাতন ধর্মই আমাদের জাতীয়তা। যা সনাতন, যা চিরন্তন, যা পুরাণ, যা চিরনূতন; যা নিখিল বিশ্বকে তার বুকে ধারণ করে আছে, ভারতবর্ষের সেই ধর্মের বিশাল দিগন্তের পর দিগন্ত, সানুর পর সানু তিনি দ্রষ্টা হয়ে সৃষ্টা হয়ে খুলে দিয়েছেন আমাদের চোখের সামনে।

একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। নিচে ঘন অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা যায় না। আমাদের সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে পথ, মহাপ্রস্থানের মহা-আগমনের পথ, উৎ-তরণের অবতরণের পথ, যেই পথের অনেক ওপরে সারে সারে দাঁড়িয়ে আছেন ঋগ্বেদের ঋষি থেকে আরম্ভ করে দিব্যজীবনের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত, তাঁদের গলা শুনতে পাচ্ছি, তাঁরা হাঁক দিয়ে বলছেন—

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তি যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বসু উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ।
(ঋ ১। ১১৩। ৭)

ঐ দেখা দিল দ্যুলোকের মেয়ে আলোকের মেয়ে উষা
এই যে ফুটছে যৌবনবতী, ঝলমলে বাস পরা।
পৃথিবীর ধন যত কিছু আছে তার ঈশ্বরী হয়ে
হে সুভগা উষা, প্রকাশিত হও, আজকে এখানে এখনই।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন সর্বব্যাপী সর্বপ্লাবী সর্বাসক্ত প্রেমের বন্ধন। আর স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন নির্বাধ স্বাধীনতা, মুক্তি। এই বন্ধনে-মুক্তিতে একাকার করা শাশ্বতী উষা আসুন শুধু একজন দুজন কয়েকজনের চেতনায় নয়, সবার চেতনায়, ভোর হোক বিভাবরী, এ দিন আজি সব ঘরে গো দিক না খুলে দ্বার, এই হোক উষার বরপুত্র, বর ও পুত্র, শ্রীঅরবিন্দের শততম জন্মজয়ন্তীতে আমাদের সবার মিলিত প্রার্থনা, সঙ্কল্প ও সাধনা।

ভূরে রাজন্ নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিম্।
সংবিদানা দিবা, কবে, শ্রিয়াই মা ধেহি ভূত্যম্॥

প্রসন্ন হও, গভীরে মজাও, কল্যাণময়ী তুমি মা আমার।
দ্যুলোকের সখী, কবি, দাও রাখী
সিদ্ধি ঋদ্ধি দুয়ে একাকার।

সিদ্ধি-ঋদ্ধি, পরা-অপরা দুটিকে একসঙ্গে নিয়ে তোমার কোলে, আমরা দেখব শত বরষ, বাঁচব শত বরষ, উঠব শত বরষ, শতের চেয়েও বেশী। পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্। রোহেম শরদঃ শতম্। তুরুশীঃ শরদঃ শতাৎ॥

হিরণ্ময় পরিক্রমা

হিমাংশু নিয়োগী

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্‌সের (relics) দিব্য পরিক্রমার কথা বলার আগে আপনাদের কাছে শ্রীঅরবিন্দ ভবন সম্পর্কে কিছু বলব।

আমরা অনেকদিন ধরেই শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান সঠিক নিরূপণের জন্য চেষ্টা করে আসছিলাম। কর্পোরেশন রেকর্ড, কর্পোরেশন বার্থ রেজেষ্ট্রী, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ষ্ট্রীট ডাইরেকটরী প্রভৃতি অনুসন্ধান করছিলাম। কিন্তু কোথাও তেমন কোন সন্ধান সঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা নথিপত্রে তখন বাড়ীর মালিকের নামধাম থাকা হ'ত কিন্তু বাড়ীর বাসিন্দাদের কোন উল্লেখ থাকত না। আমরা জানি ১৯৪৭ সালে লোয়ার সার্কুলার রোডে 'রত্নানী'-তে শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়। তখন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "That is not the house where I was born. It was somewhere on Theatre Road, may be 4 Theatre Road."

শ্রীঅরবিন্দের এই কথার সূত্র ধরে আমরা কর্পোরেশন রেকর্ড থেকে এটা প্রমাণ করতে পেরেছি যে ১৯৩৫-৩৬ সালে ৪নং থিয়েটার রোডই এখনকার ৮নং থিয়েটার রোড। বাড়ির মালিকের নাম দেখা যায় মিঃ এড্‌রা, পরে হাত বদল হয়ে হয় মিঃ সাহুল। ব্রিটিশ আমলের বাংলা সরকার এই ৮ নং বাড়ীটা কিনে নেন প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। স্বাধীনতার পর এই বাড়ীটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হিসাবে নেওয়া হয় এবং এই অনুসারে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই বাড়ীতে থাকেন। তারপর শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ওই বাড়ীতে ছিলেন এবং ওখানেই দেহত্যাগ করেন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের রিলিফ্‌ ও পুনর্বাসন দপ্তর ছিল ওই বাড়ীতে। আর কিছুদিন আগে এই বাড়ীতেই বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যালয় ছিল আর বলা যেতে পারে এটাই মুখ্যত মুজীবনগর। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমাদের প্রায়ই বলতেন, "ওই আট নম্বর বাড়ীটা দেখ তো। কেউই যে ওখানে টেঁকে না, ব্যাপার কি?"

আমরা রেকর্ডে দেখি শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ পরবর্তীকালে এই আটনম্বর বাড়ীতেই ছিলেন। আর শ্রীঅরবিন্দের কথা অনুসারেও আমরা কর্পোরেশন রেকর্ডে দেখি, ৪নং থিয়েটার রোডই পরে এই ৮নং থিয়েটার রোড হয়েছে। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল এই বাড়ীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাল্যস্মৃতি জড়িত।

আমরা যখন শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকীর জাতীয় কমিটির কাছে বাড়ীটির জন্য আবেদন করলাম তখন জাতীয় কমিটি একটি বিশেষ সাব্‌-কমিটি গঠন করে কলকাতায় পাঠান বাড়ীটির ঐতিহাসিক প্রমাণপত্র সব পরীক্ষা করার জন্য। এই সাব্‌-কমিটি সব নথিপত্র দেখে একমত হলেন যে এই আটনম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ীটির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাল্যস্মৃতি জড়িত। আর সম্ভবত: এই বাড়ীতেই শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী কমিটির তরফ থেকে বাড়ীটি আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসাবে দাবি করলাম, এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের নানা রকম জটিলতা পার হয়ে, প্রধানমন্ত্রীর

ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও আনুকূল্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় বাড়ীটি শেষ পর্যন্ত পেলাম।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আইন পাশ করে সরকারীভাবে একটি সমিতি গঠন করে সেই সমিতির তত্ত্বাবধানে বাড়ীটি "শ্রীঅরবিন্দ ভবন" হিসাবে হস্তান্তরিত করা হয়। এই সমিতির সভ্য হিসাবে রয়েছেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, পূর্তমন্ত্রী প্রভৃতি নয় জন এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের তরফ থেকে আমরা সাতজন এই সমিতির সভ্য।

যাই হোক, বাড়ীটি পাওয়া গেল। এইবার রেলিকস্ পরিক্রমার কথা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না ১৯৫২ সালে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি। মা তার জবাবে বলেছিলেন, "I shall not give Relics to Calcutta unless they are received in state।" আমার আর কিছু বলার থাকলনা। কেননা state honour দিয়ে Relics receive করা তো আর আমার হাতে নয়।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অনেক দিনের কথা। এর মধ্যে কি শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ প্লেন-যোগে নিয়ে কলকাতায় আনা সম্ভব হত না। হয়তো হ'ত। কিন্তু রেলিকস্ এনে তুলতাম কোথায়? যে সব জায়গায় তোলার কথা ভাবা যায়, কেন জানি না, মনের দিক থেকে কোন সাড়া আসে না।

আরও একটা কথা ভেবে দেখবার মত। শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ দিল্লীতে গেল, উড়িষ্যায় গেল, মাদ্রাজেও গেল—অথচ অবাক হলাম, মা কোথাও এই শর্ত দিলেন না, কিন্তু কলকাতার বেলায় মায়ের এই শর্ত কেন? সে কি কেবল শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান বলে? মনে তো হয় না। তবে কি বাংলার কাছে মায়ের বিশেষ কোন দাবী আছে? হয়তো তাই।

রেলিকস্ আনবার জন্য আমি আর পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন মহাশয় ১৪ই জানুয়ারী বিমানে আশ্রমে যাই। মায়ের হাত থেকে শ্রীঅরবিন্দের রেলিকস্ নিয়ে শ্রীভোলা সেন মহাশয়কে বেশ বিচলিত দেখেছিলাম। হয়তো কোন বিশেষ অনুভূতি তাঁর হয়ে থাকবে। যাই হোক, ১৫ই জানুয়ারী আমরা দমদম এসে পৌঁছলাম। দমদম বিমানবন্দরে, রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, হাইকোর্টের কতিপয় বিচারপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকলে ফুল মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। রাজ্যপাল বললেন, "রেলিকস্ আবার গাড়িতে যাবে।" আমাদের ঠিক হয়েছিল সেই রাত্রির মত রেলিকস্ থাকবে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলের সেলে, যেখানে শ্রীঅরবিন্দ এক বৎসর কারা-অন্তরীন ছিলেন।

গভর্ণরের গাড়ীতে করে রেলিকস্ চলেছে...সামনে দুজন পাইলট পুলিস। রেলিকসের পিছন পিছন আমাদের সকলের গাড়ি।

পরের দিন সকালে প্রধান বিচারপতি পদযাত্রা করে রেলিকস্ নিয়ে এলেন আলিপুর কোর্টে এবং রাখা হল যে কক্ষে শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্যদের বিচার হয়েছিল। সেই কক্ষে জাল দিয়ে ঘেরা বন্দীদের একটা খাঁচা ছিল, সেখানে যে স্থানটিতে শ্রীঅরবিন্দ নিয়মিত বসতেন সেই জায়গায় একটা বড় সাদা মালা দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। কোর্ট চলাকালীন সময় পর্যন্ত রেলিকস্ সেখানে ছিল। বিকেল চারটের সময় শোভাযাত্রা

যায় ধ্বনি। প্রথমে জেলব্যাণ্ড, তারপরে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, পুলিসব্যাণ্ড, তারপরে মুখ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট প্রভৃতির নেতৃত্বে রেলিকৃস্ একটা সুসজ্জিত গাড়িতে এগিয়ে চলল। পিছনে লাল-পেড়ে শাড়ি পরে একদল মেয়ে শঙ্খ বাজিয়ে "শ্রীঅরবিন্দ স্বাগতম্", "বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ স্বাগতম্", "মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ সুস্বাগতম্" "যোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ সুস্বাগতম্", "ভগবান শ্রীঅরবিন্দ সুস্বাগতম্," প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা চলেছে। পিছনে একদল সুসজ্জিত ঘোড়শোওয়ার। অপূর্ব গরিমাময় সেই দৃশ্য! রাস্তার দুধারে জনতা শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে কেউ ফুল দিল, কেউ ধূপ দিল, কেউ মালা দিল। এইভাবে রেলিকৃস্ এসে পৌঁছাল শ্রীঅরবিন্দ ভবনে ১৬ই জানুয়ারী। সাথে সাথে শতাধিক মেয়ে শঙ্খধ্বনি করে আকাশবাতাস মুখরিত করে শ্রীঅরবিন্দের আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

প্রধান বিচারপতির হাত থেকে রাজ্যপাল রেলিকৃস্ গ্রহণ করে সভামঞ্চে রাখলেন। স্তোত্রপাঠসহ সভা আরম্ভ হল। সভায় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, প্রভৃতির ভাষণের পর মুখ্যমন্ত্রী রেলিকৃস্ নিয়ে এলেন ভবনের দ্বিতলে এবং ওখানে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত থাকে। প্রত্যহ বহুলোক, বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এসে রেলিকৃস্ প্রণাম করে যায়। রোজই বিকালে কিছু না কিছু বক্তৃতার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

এরপর ২৪শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে রেলিকস্ নিয়ে আমি, অরিন্দম বসু ও ছাটেনারায়ণ শর্মা শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির হয়ে বিমানযোগে বাগডোগরায় গিয়ে নামলাম।

আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলায় পরিক্রমা করে এসেছি। আমাদের পরিক্রমার সঙ্গে ছিল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা ও আশ্রম কর্মজীবনের ফটোপ্রদর্শনী, বুকষ্টল, আশ্রম সংক্রান্ত ফিল্ম্ দেখাবার ব্যবস্থা। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং হয়ে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে নিবতিখোরা চা বাগানে, তারপর কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, কালীয়াগঞ্জ হয়ে বালুরঘাট, সেখান থেকে মালদহ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসাত, ব্যারাকপুর, হাওড়া; মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি হয়ে বাঁকুড়া, সেখান থেকে পুরুলিয়া, তারপর বরাকর, কুলটি হয়ে আসানসোল, দুর্গাপুর হয়ে সিউড়ী, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, উত্তরপাড়া, যাদবপুর, আর যাদবপুর থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ ভবনে এসে রেলিকৃস্ পরিক্রমা শেষ হলো। ঐ দিন রেলিকৃস্ এসে শ্রীঅরবিন্দ ভবনে প্রবেশ করতেই শতাধিক শঙ্খধ্বনিতে শ্রীঅরবিন্দের পুনরাগমনবার্তা ঘোষিত হল। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এক সংক্ষিপ্ত ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ-স্তোত্র পাঠের ভিতর দিয়ে এক পরম দেবমুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ ভবনের পবিত্র বর্বরবেদীতে রেলিকৃস্ সংস্থাপনা করলেন রাজ্যপাল শ্রী এ, এল, ডায়াস।

পরিক্রমার যেখানেই গিয়েছি, স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা, এন. সি. সি. গার্ল গাইড, এবং স্থানীয় লোকেরা সবাই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন। রেলিকৃস্ যে পথ দিয়ে গেছে দু'পাশের বাড়ীর ছাদ ও অলিন্দ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনি করে শ্রীঅরবিন্দকে স্বাগত করেছেন তাঁরা। অনেক জায়গায় লোক সমাগম এমন হয়েছিল যেন মনে হয়েছিল সারা শহরটা বুঝি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, এত লোক কি দেখার

আশায় আসছে—ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থেকেছে—সে কি এই পাঁচ ইঞ্চি আর পাঁচ ইঞ্চি একটা বাক্স দেখার জন্য? না সে কিসের আকর্ষণ? দুপুর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অনেক জায়গায় লোক সারিবদ্ধভাবে রেলিক্স দর্শন করে গেছেন কিসের আকর্ষণে? এই জনতার ভিতরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, সবাই ছিল। মনে পড়ে দার্জিলিং লরেটো কনভেন্ট স্কুলে যখন গিয়েছি, সেই সময় তো প্রচণ্ড শীত, ক'দিন আগেও বরফ পড়েছে, কিন্তু ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই মিশনারী স্কুলের কর্তৃপক্ষ এক আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন। ওঁদের মাদার সুপিরিয়ার রীতিমত গবেষণা সুরু করে দিলেন রেলিক্স কোথায় থাকবে তার জন্য। এখনকার ডরমিটারি যেখানে, সেখানেই ছিল তখনকার কালের স্কুল বোর্ডিং। ওখানেই রেলিক্স রাখা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো তাঁদের Ex-student-র ছবি তাঁরা স্কুলে রাখতে চান কিনা? উত্তরে মাদার সুপিরিয়ার বললেন, "We shall be thrilled to have the picture of Sri Aurobindo".

পরিক্রমা সুরু করবার আগে কোনরকম প্রচার করার কোন ব্যবস্থাই আমরা করিনি। বরাবরই ভেবেছি, এটা শ্রীঅরবিন্দেরই পরিক্রমা। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তাঁর বাংলাদেশকে দেখতে বেরিয়েছেন। আমরা ভগবানকে দেখি, না ভগবান আমাদের দেখেন? কতলোক শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স দেখল এটা বড় কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাংলাকে দেখলেন এটাই আসল কথা। প্রচারে হয়তো লোক সমাগম আরো বেশি হতো, কিন্তু বরাবরই, কেন জানি না, প্রচারের দিকে আমার মন কখনও সায় দেয়নি। শ্রীঅরবিন্দও প্রচার কোনদিন ভালবাসতেন না। তাছাড়া ঘটনার তাৎপর্য জনতার সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না।

মনে পড়ে, আমি সেবার আশ্রমে। দুই তিন চার পাঁচ ছয় (২৩, ৪, ৫৬)—এই তারিখটির একটা occult তাৎপর্য আছে বলে মা আমাকে আশ্রমে থাকতে বিশেষভাবে বলেছিলেন। সেদিনটি চলে গেল। আমি তো বিশেষ কিছু লক্ষ্য করতে পারলাম না।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, কিছু কি ঘটল?" মা বললেন, "কেন তুমি দেখনি? রাশিয়ান এথলেটসরা মার্চপাষ্ট করে গেল আমার সামনে দিয়ে তাদের পতাকা নমিত করে?"

এই ঘটনার যদি এতখানি গুরুত্ব থেকে থাকে তাহলে এই যে নানা জায়গায় পরিক্রমার পথে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে শ্রীঅরবিন্দ দেখে এলেন তার গুরুত্ব কে নিরূপণ করবে?

আর সব কিছুর কি ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? না কি ব্যাখ্যা করা যায়? গ্রামের পথে যেতে দেখেছিলাম এক কৃষক বধূ, কাঁখে সন্তান, হাতে শঙ্খ, একা দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশে কোন লোকালয় নেই, দূরে একটিমাত্র কুটির দেখা যায়, হয়তো তারই।

কে তাকে সংবাদ দিয়েছিল যে এইপথে ভগবান যাবেন? কেমন করে সে জানল? সে তো এমন বিশেষ কেউ নয় যে তাকে লোকে খবর দেবে? এমন করে কত হৃদয়ে যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন ভগবান তার সংবাদ কে রাখে?

হাওড়া থেকে আন্দুল যাবার পথে ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে রেলিক্সকে প্রণাম করছে, যার দুচোখে তার অশ্রুর ধারা। কিসের এই চোখের জল?

স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা ঘটে তাই ভগবানের চরণে পৌঁছায়। প্রচারে জনতা জড়ো হতে পারে কিন্তু অকৃত্রিম হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদিত হতে পারে না। যাদবপুর থেকে যে শোভা-

যাত্রা হয়েছিল, লোকে বলেছে, "অরাজনীতিক কোন মিছিলই এর আগে এত বড় এমন পবিত্র সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়নি।"

যে সব স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি তারা তাদের স্কুল বা কলেজের সামনে ধূপ ও পুষ্প নিয়ে সারিবদ্ধভাবে রাস্তার ধারে শ্রদ্ধা ভরে দাঁড়িয়েছিল রেলিক্সের প্রতীক্ষায়। এরই বা তুলনা কোথায়?

পরিক্রমায় নানা জায়গায় নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। আমাকে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল তার দুটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

প্রথম প্রশ্ন: এই পরিক্রমা কেন? কিইবা এর উদ্দেশ্য?

এর উত্তরে বলি, রেলিক্স নিয়ে এই পরিক্রমা করার চিন্তা আমার মাথায় কিভাবে, কেন এবং কবে যে এসেছিল তা এখন বলতে পারব না। কিন্তু তা আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে পরিক্রমা করতেই হবে। সরকারী কমিটিতে পরিক্রমার প্রস্তাব যখন দিলাম আমি কোন বাধাও পাই নি। শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গায় বলেছেন, ভারতবর্ষ মহাকালীর দেহ এবং বাংলা তার হৃৎপিণ্ড। তা যদি হয়, তবে গত ক'বছরে কার্যকলাপে এইটাই দেখা গেছে যে হৃৎপিণ্ডেই কোন দুষ্টব্যাধি দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যাধি আছে যা নিরাময়ের জন্য এক্স-রে ব্যবহার করতে হয়। এই সর্বাঙ্গীণ ব্যাধি একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজ্যোতি নিরাময় করতে পারে। তাঁর দিব্যজ্যোতির স্পর্শে বাংলা তার নিজের সত্তা ফিরে পাক এই প্রার্থনা বুকে নিয়ে আমরা পরিক্রমায় বাহির হয়েছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: এই মা কে? ইনি কি শ্রীঅরবিন্দের মা? এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ মা সম্বন্ধে যা যা বলেছেন এবং মা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সেগুলি তাদের কিছু কিছু বললাম। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মায়ের চেতনা ও আমার চেতনা এক; কেননা সৃষ্টির লীলায় তা অপরিহার্য। মায়ের দিকে যে ফিরেছে সেই আমার যোগ সাধনা করে। আর মাও বলেছেন, "Without He I exist not; without me He is unmanifest". আমি বললাম, দেখ ভাই, মা যে কে তা বুঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই— আমি তাদের আগের দিনের গল্প বললাম, মা তখন রাত্রে ধ্যানে আসতেন। এক একদিন মায়ের আসতে অনেক বিলম্ব হত, রাত বারোটা একটা এমন কি দুটো পর্যন্ত হয়ে যেত। একদিন একটি সাধক বলল, এটা যেন মায়ের কেমন। দেরীই যদি হবে, তো একটা নোটিশ দিয়ে দিলে আমরা ধীরে সুস্থে বাড়ী থেকে আসতে পারতাম।

আমাদের কোন কথা বা চিন্তা মায়ের অগোচর থাকে না। এর অনেকদিন পর অন্য এক উপলক্ষে মা বলেছিলেন, "তোমরা কথায় কথায় ভাব এটা মায়ের বড় অন্যায়, তোমরা আমার জন্য এতটুকু অপেক্ষা পর্যন্ত করতে চাও না। তোমরা জান? "Even the gods are waiting for ages to have Darshan of me?"—"দেব-দেবীরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছে একবার আমার দর্শন লাভ করবার জন্য।"

শ্রীঅরবিন্দ অন্তরালে, কিন্তু মা রয়েছেন আমাদের মধ্যে। নিয়ত তাঁর চরণে প্রার্থনা বাংলা তথা ভারত যেন তার নিজের সত্তাকে খুঁজে পায়, তার ভগবত অভিপ্রেত যে ব্রত তা যেন সে সার্থক করতে পারে।

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

আমাদের মধ্যে যাহারা ভল্‌টি ভেনজিয়ান্স বিমানে হাওয়াই-কসরৎ দেখাইবে বলিয়া সাব্যস্ত হইল তাহাদের এই কসরৎ দেখাইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দশঘন্টা করিয়া বিমান উড়াইবার কৌশল অভ্যাস করিতে হইত। সেজন্য আমাদের স্কোয়াড্রনের 'এ' ফ্লাইট হইতে পাঁচজন ও 'বি' ফ্লাইট হইতে পাঁচজন করিয়া দশজনের একটি ইউনিট গঠন করা হইল। দশ-বার দিনের মধ্যেই এই দশজন বৈমানিক তাহাদের পূর্ব্বেকার উড়িবার উচ্চমান ফিরিয়া পাইল।

দিল্লীস্থিত কেন্দ্রবিমানদপ্তর হইতে একজন উচ্চপদস্থ বিমান কর্ম্মচারী আসিয়া এই দলের বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপের ভঙ্গী ও তারপর পলায়নের কায়দা দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়া গেলেন। এখন আমাদের স্কোয়াড্রন "কসরৎ দেখাইবার জন্য প্রস্তুত" বলিয়া স্থির হইল। এই দশজন বৈমানিক (ক্রু), দশটি বিমান (ভল্‌টি ভেনজিয়ান্স) এবং দশ-পনর জন ইঞ্জিনীয়ার বৈমানিক লইয়া একটি ডিটাচমেন্ট গঠিত হইল। এই ডিটাচমেন্ট দিল্লী হইতে ১৫-২০ মাইল দূরে স্যাবলক্ষেত্রের মাঝখানে একটি বিমানক্ষেত্রে (নাম ওরগাঁও) সকালবেলা রওনা হইয়া দুপুরের মধ্যে পৌঁছাইল। ওখানে পৌঁছাইয়াই চক্ষু জুড়াইয়া গেল! চারিদিকে সবুজের মেলা বসিয়াছে। কি মনোরম দৃশ্য। মটর, কেসারি প্রভৃতি নানাপ্রকার সবজি ও ফসল ফলিয়া রহিয়াছে। জমির উর্ব্বরতার জন্য ফসল উৎপন্নও হইয়াছে প্রচুর। কোহাটের শুষ্ক-ধূসর ক্ষেত্র হইতে এই সবুজের স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশে আসিয়া মন-প্রাণ-চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

আমরা কয়েকজন বিমান হইতে অবতরণ করিয়াই পাশের মটরগুঁটির ক্ষেতে নামিয়া মটর তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম! কি মিষ্টি ও সুস্বাদু! কয়েকটি দানা খাইতে না খাইতেই ক্ষেতের মালিক কয়েকজন চাষীর সাথে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন— তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লম্বা লাঠি। আসিয়াই ভীষণ সোরগোল শুরু করিয়া দিলেন। আমাদের মধ্যে একজন হিন্দীভাষী ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে আমরা সকলে পকেট হইতে ঝড়াৎ করিয়া এক টাকা করিয়া বাহির করিয়া দিলাম এবং কয়েকটি মটরদানা খাইবার অনুমতি চাহিলাম। টাকা হস্তগত হইবামাত্র তিনি হুকুম করিলেন তাঁহার লোকদের এবং তৎক্ষণাৎ একবানা পরিপুষ্ট মটর আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এইগুলি পূর্ব্বেকার মটরদের মত তত মিষ্ট নয়। বুঝিলাম, চুরির জিনিষ বেশী মিষ্ট।

এরপর নূতন বিমানক্ষেত্র হইতে প্রত্যহ দুই বেলা কসরৎ সুরু হইল। উড়িয়া গিয়া দিল্লীর উইলিংডন বিমানক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর ছোঁ মারিয়া নামিয়া কয়েকটি ময়দার বস্তা ফেলিয়া ফিরিয়া আসা। ফিরিয়া আসিয়া মকুস করা হইল। দুই-তিনদিনের মধ্যেই আমরা ময়দার বস্তা ফেলায় ওস্তাদ হইয়া গেলাম। নিশানার উপর ময়দার বস্তা ফাটিয়া ধোঁয়ার মত অনেকদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিত। দূর হইতে দেখিলে সত্যসত্যই বোমা পড়িয়াছে বলিয়া ভ্রম হইত। এর পর কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে বা নির্দ্দিষ্ট সময় একটি ছোট খড়ের

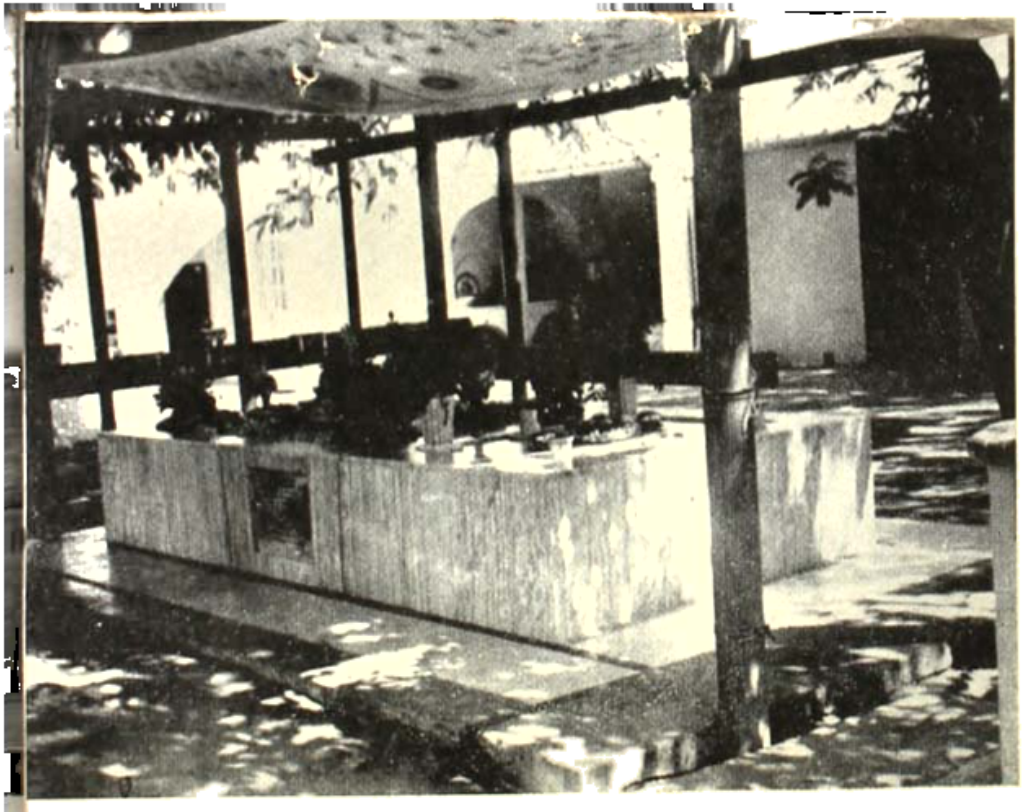

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন
কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স নিয়ে আসছেন।

শ্রীঅরবিন্দের

সারা পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রেশিয় পরিক্রমা সমাপনান্তে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ভবনে রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস্ রেশিয় সংস্থাপন করছেন।

16 2 73

At the service of Truth

Blessings

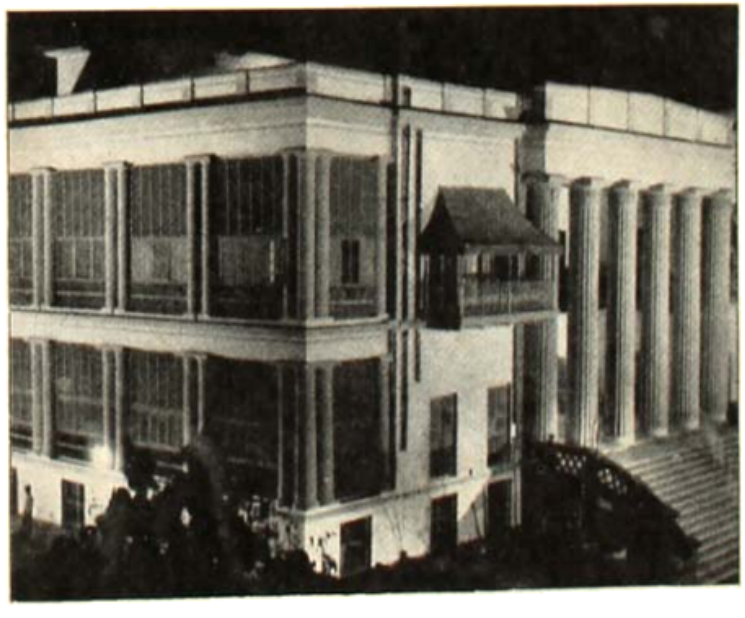

উপরের সারি : উত্তরবঙ্গে হাতীর পিঠে করে শ্রীঅরবিন্দের রেলিঙ্গ পরিক্রমা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্. সি. সি. ছাত্রছাত্রীদের গার্ড-অব্-অনার।

জয়তু শ্রীঅরবিন্দ

• শ্রীঅরবিন্দের রেলিক্স অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস; কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন, স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী ও শ্রীহিমাংশু নিয়োগী

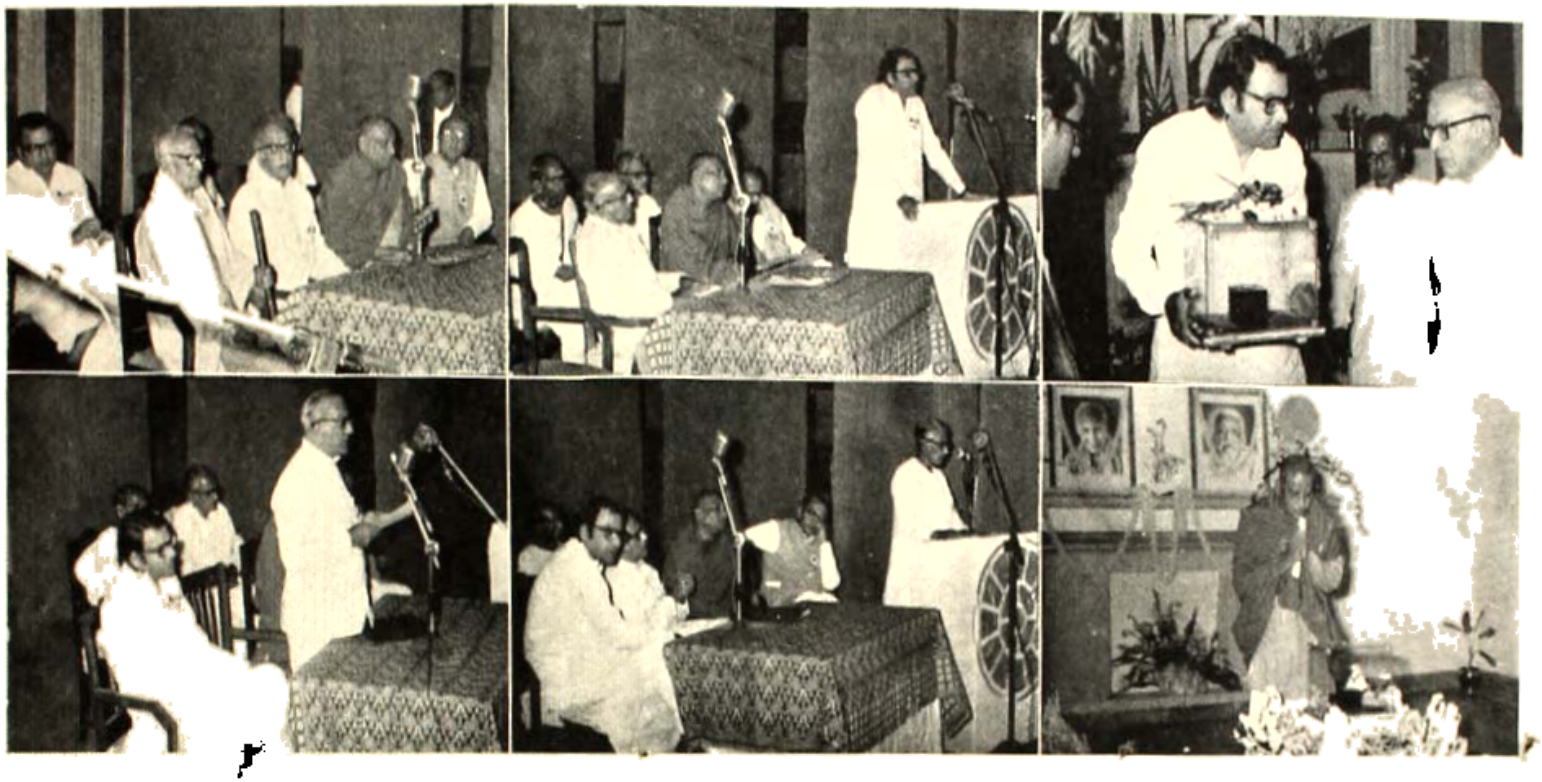

"দেবতার দীপ হস্তে
যে আসিল ভবে
সেই ক্ষণমুহূর্তে, বলো,
কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে।
যখন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

আলীপুর কোর্ট থেকে
শোভাযাত্রা চলেছে
শ্রীঅরবিন্দ ভবনে

আলীপুর কোর্ট

শ্রীঅরবিন্দ ভবনের পবিত্র মর্মর বেদীতে শ্রীঅরবিন্দের হেলিয়ম সংরক্ষিত

ঘরের উপর ময়দার বোমা ফেলা হইল এবং বিজলীওয়ালাদের কারদার আগুন ধরাইয়া দর্শকদের আরও তাক্ লাগাইয়া দেওয়া হইল। এইসব ময়দার বস্তার মধ্যে একটি লোহার টুকরা থাকে। এই লোহার টুকরাগুলি ময়দার বস্তা মাটিতে পড়িয়া গেলে মাটির মধ্যে গাঁথিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিতাম বোমাগুলি নিশানা হইতে কত দূরে পড়িয়াছে! আমাদের স্কোয়াড্রনের বোমাগুলি কখনই নিশানা হইতে ১৬ ফিট দূরে পড়ে নাই—অর্থাৎ আমাদের এই স্কোয়াড্রনের তাকনৈপুণ্য হইল ১৬ ফিট। এ পর্যন্ত অন্য কোনও স্কোয়াড্রনের এমন কি বিলাতের বিলাতী স্কোয়াড্রনগুলিরও সঠিকতা বা accuracy ২০ ফিটের কম হয় নাই! কাজে কাজেই কর্তারা আমাদের কর্মকুশলতা দেখিয়া প্রশংসার পঞ্চমুখ হইলেন! গবরের কাগজে আমাদের স্কোয়াড্রনের নাম দেওয়া হইল The Sheet Hot Squadron! এই ইংরাজী কথাটির কি মানে তখন চিন্তা করিয়া দেখি নাই। ইহার তাৎপর্য এইটুকু বুঝিলাম যে আমরা 'গরম স্কোয়াড্রন' অর্থাৎ এই স্কোয়াড্রনের নানুষ মারিবার ক্ষমতা খুব বেশী। ইহাদের বোমা নিশানায় তাক্ করিয়া ফেলিলে নিশানার উপরই পড়িবে। ইংরাজীতে একটি ঠাট্টা আছে যে, If you are on the target, you are safe। অর্থাৎ নিশানায় থাকিলে তোমার কোনও বিপদ নাই—কেননা নিশানায় (target) তাক্ করা বোমা নিশানায় তো পড়িবেই না অধিকন্তু নিকটেও পড়িবে না, সুতরাং কেহ যদি ঠিক নিশানার উপর থাকে তাহার কোনও বিপদ নাই। আমাদের স্কোয়াড্রনের ক্ষেত্রে আর এইরূপ ঠাট্টা চলিবে না।

কিন্তু আমরা অন্য সব স্কোয়াড্রনের কাছে এক অদ্ভুতভাবে ঠাট্টার পাত্র হইয়া উঠিলাম। অন্য স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা আমাদের দেখিলেই বলিত 'এই যে, Sheet Hot বৈমানিক —সরে যা, সরে যা!' মাঝে মাঝে এই ঠাট্টার মধ্যে এমন শ্লেষ থাকিত যে আমরা সহ্য করিতে পারিতাম না এবং শেষে দুইদলে হাতাহাতি লাগিয়া যাইত! এইরূপে কয়েকবার হাতাহাতির পর আর কেহ আমাদের স্কোয়াড্রনকে বিদ্রূপ করিতে সাহস পাইত না।

রাজধানীর কর্তাদের কসরৎ দেখাইবার পর আমরা আবার কোয়েটায় ফিরিয়া গেলাম।

যে ভল্টিভেঞ্জিয়ান্সগুলিতে আমরা কসরৎ দেখাইয়াছিলাম সেগুলি অন্য বৈমানিকরা আসিয়া এলাহাবাদের নিকট ফাঁফামৌ বিমানবন্দরে লইয়া গেল। দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখার ফলে সেগুলি অকেজো হইয়া গেল। জাপানী যুদ্ধে যতগুলি ভল্টিভেঞ্জিয়ান্স বিমান ব্যবহার করা হইয়াছিল সবগুলিকেই শেষ পর্যন্ত ফাঁফামৌতে এইভাবে কবর দেওয়া হইয়াছিল।

আবার সেই কোয়েটা। আবার সেই পি. টি. ও প্যারেড।

সেখান হইতে পরে আবার কলিকাতার দমদম বিমানবন্দরে ফিরিয়া আসিলাম। এবারে স্পেশাল ট্রেনে হৈহৈ করিতে করিতে। সেই পুরাতন অতিচেনা দমদম বিমানবন্দর! পৌঁছিয়াই আমাদের জন্য প্রস্তুত স্পিট্ ফায়ার (Spit fire) বিমান পাইলাম। বিলাতী রাজকীয় বিমানবাহিনীর একজন ওয়ারান্ট অফিসার আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই বিমানচালনা ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা সুরু হইয়া গেল। একটি কথা তিনি আমাদের পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিলেন—এই বিমানে Rolls Royce কোম্পানীর ২২শত অশ্ব-শক্তির ইঞ্জিন লাগানো আছে। তখনকার দিনে কোনও

দেশে এত বেশী অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন ছিল না। তিনি আরও বলিলেন—এত বেশী শক্তি থাকার জন্য এই বিমানের ইঞ্জিনকে মাটির উপর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়—কাজেই সাধারণ ভাবে ইঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন। যদি ইঞ্জিনে কোনও ভুল-ত্রুটি থাকে তবে ইহা আকাশে ওড়া মাত্র বৈমানিক তাহা বুঝিতে পারিবে এবং বোঝামাত্র সত্বর সে বিমান অবতরণ করাইবে।

১০।১৫ দিনের মধ্যে আমরা বিমান চালাইবার কৌশল শিখিয়া ফেলিলাম। তারপরই হুকুম আসিল যে আমাদের গোয়ালিয়র যাইতে হইবে ইহার অন্যান্য কৌশল শিখিবার জন্য।

গোয়ালিয়রের মহারাজপুর বিমানবন্দর আমাদের কাছে পরিচিত।

মহারাজপুরে আমরা যেদিন পৌঁছিলাম সেদিনই আমাদের কাজ পুরোদমে শুরু হইয়া গেল। এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন বেলা দশটার সময় একটি স্পিটফায়ার বিমান উড়িয়া আসিল এবং দেখা গেল তাহার একটি টায়ার পাথরে ঘষা খাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। টায়ারটি বিশদভাবে পরীক্ষার পর এই সাব্যস্ত করা গেল যে বিমানটি আর একবার মোটে উড়িবার ক্ষমতা রাখে। সেজন্য টায়ার না বদলাইয়াই বিমানটি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেই সময় ১নং স্কোয়াড্রনের বৈমানিক-ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন একজন শিখ—নাম, সবপূরণ সিং লোটা। আমাদের স্কোয়াড্রনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মেসে উনি যখন শুনিলেন যে টায়ারফাটা অবস্থায় বিমান ছাড়া হইয়াছে তখন একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন এবং চিৎকার করিয়া সেই স্কোয়াড্রনের বৈমানিক-ইঞ্জিনীয়ারকে বলিলেন—'য়ান তুমকো কয়েদ করা দেগা'। সত্যসত্যই ১৯৪৫ সনে যখন কয়েকজন ভারতীয় বৈমানিক বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন কোহাটে বিচারের সময় তিনি ঐ বৈমানিক-ইঞ্জিনীয়ারের (তিনি নিজেও বিদ্রোহ করার অপরাধে কারারুদ্ধ হন) বিরুদ্ধে খুব জবরদস্ত সাক্ষী দিয়াছিলেন! ভারতীয় বিমানবহরে আমরা দুই প্রকার লোকেদের নিকট হইতে দূরে থাকিতাম। প্রথম বিলাতী রাজকীয় বিমানবাহিনীর গোরারা—যাঁহারা বৈমানিক হিসাবে আমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াও আমাদের উপর সরদারি করিতেন, আর দুঃখের বিষয় আমাদের বিমানবাহিনীর উচ্চপদস্থ 'অয়র্চাদেরা' তাহাদের সবসময় সব ব্যাপারে সাহায্য করিতেন—তাহার উদাহরণ এর পূর্বে দিয়াছি, পরে আরও পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার শিখ বিমানিকেরা—ইহাদিগকে আমরা 'কোব্রা (Cobra) বলিয়া ডাকিতাম। ইহারা ঐ কোব্রার মতই বিষাক্ত ছিল। গুপ্তচরবৃত্তিতে ইঁহারা কুখ্যাত। ইহারা সুবিধা পাইলেই ছোবল মারিত।

মহারাজপুরে আমাদের প্রধান কাজ হইল বিমানকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা। অল্প দিনের ভিতরেই আমরা স্পিটফায়ার আয়ত্তে আনিলাম। এই স্পিটফায়ার বিমান এত শক্তিশালী ছিল যে উড়নপথে ইহাকে লইয়া বেশীদূর দৌড়াইতে হইত না। ১০০ গজ দৌড়াইবার পরই ইহার ইঞ্জিন বিমানকে সোজা আকাশে তুলিয়া লইতে পারিত।

মহারাজপুরে এই বিমান চালনায় দক্ষ হইতেই আমাদের আবার বর্মার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইল।

কবি নিশিকান্ত

নিশিকান্ত

নিশিকান্তর অনুবাদ-কবিতা ঃ

অমলকিরণের ৪টি কবিতা

হরীন্দ্রের ১টি কবিতা

I

অমলকিরণ

SRI AUROBINDO

All heaven's secrecy lit to one face
Crowning with calm the body's blinded cry—
A soul of upright splendour like the noon:

But only shadowless love can breathe this pure
Sun-blossom fragrant with eternity—
Eagles of rapture lifting, flickerless,
A golden trance wide-winged on golden air.

Amal
6-12-35

Sri Aurobindo's comment:

"Exceedingly fine. Illumined mind. All the lines are admirable."

শ্রীঅরবিন্দ

সকল স্বর্গের গোপনতা প্রজ্বলিয়া উঠিয়া একটি মুখে
প্রশান্তিতে কিরীটিত করিল তনুর দৃষ্টিহীন ক্রন্দনেরে—
ভাস্বর-আর্জব-আত্মা মধ্যাহ্ন-প্রকাশ সম সমৃদ্ধি-মহান!

শুধু ছায়াহীন প্রেম প্রশ্বাস লভিতে পারে এই সুনির্মল
অংশুমালী-প্রসূনের অক্ষয় সৌরভে পূর্ণ কাল হীনতায়—
উর্ধ্বায়িত আনন্দের ঈগল-বলাকা, অনিশ্চিত, হেম-কান্ত
এ সমাধি পর্ণ-প্রসারিত হেম-দীপ্তি-বায়ুর মণ্ডল 'পরে।

(প্রথম অনুবাদ)

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

A very fine translation.
(খুবই চমৎকার অনুবাদ।)

শ্রীচরণেষু—গুরুদেব! এ অনুবাদটি আপনি ভালোই বলেছিলেন, তবু আমি দু-একটি স্থানে আরো ভালো করবার চেষ্টা কোরলাম। "upright splendour like the noon" এবং "Eagles of rapture lifting, flickerless", এ দুটি স্থানে একটু পরিবর্তন কোরলাম। পূর্বেকার অনুবাদে এ দুটি স্থান অন্যরকম ছিল। (1) Grandeur-এর ষষ্ঠ লাইনের শেষভাগে আমি যে ভুল কোরেছিলাম, তা হাস্যকর; তা সংশোধন করে দিলাম। এই কবিতার শেষ লাইনে clasped-এর সঠিক অনুবাদ করতে বললেন, অমলকিরণ; সেইজন্য "গাঁথা" কথাটির স্থানে "ধরি" কথাটি বসালাম। (2) এই দুটি অনুবাদের সংশোধন কেমন হয়েছে জানাবেন। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি প্রণত নলিনীকান্ত

শ্রীঅরবিন্দ (দ্বিতীয় অনুবাদ)

সকল স্বর্গের গোপনতা প্রজ্বলিয়া উঠিয়া একটি মুখে
প্রশান্তিতে কিরীটিত করিল দেহের দৃষ্টিহীন ক্রন্দনেরে—
ভাস্বর মহান-আত্মা আর্জবসমৃদ্ধিময় মধ্যাহ্নের মত।

শুধু ছায়াহীনপ্রেম প্রশ্বাস লভিতে পারে এই সুনির্মল
বিবস্বান-প্রসূনের অক্ষয়-সৌরভে পূর্ণ কাল-হীনতায়
মাঝে—নন্দিত-ঈগল-বৃন্দে উর্ধ্বায়িত, অনিশ্চিত, হেমকান্ত
এ সমাধি পর্ণ-প্রসারিত হেম-দীপ্তি-বায়ুর মণ্ডল 'পরে।

GRANDEUR

I was a worshipper of gorgeous sound—
The rocky reboance of a waterfall,
Immeasurable the night-wind's lion-call,
The moonward baying of the great sea-hound!
I was a devotee of splendid hush—
Silvery moonglobe's surf-awaking sleep,
Purple precipitous lone-brooding steep
Of massive hills where wind and water rush!

But now, O Lord, Thy puissances have grown
Such intimate love that my soul-dream has grasped
Grandeur through briefest beauty: I have viewed
A flying heart-beat of infinitude
In every voiceful wing-waft and have known
Ages of joy from tiny blossoms clasped!

Amal
19.1.34

Sri Aurobindo's comment:
"It is a very good sonnet."

সমৃদ্ধি

আছিলাম অর্চয়িতা উদ্দীপিত ধ্বনির বৈভবে—
শৈলচারী-প্রপাতের বৃষ-নাদ স্বনিত সংঘাতে,
নৈশ-ঝঞ্ঝা-কেশরীর অপ্রমেয়-হুঙ্কারের সাথে,
পূর্ণিমার চন্দ্রপানে গর্জমান স্নান-সিন্ধু-রবে।
আছিলাম একনিষ্ঠ অপরূপ স্তব্ধ-মৌনতায়—
চাঁদের রূপার চক্রে সমুৎকীর্ণ জাগর-নিদ্রাতে,
নির্জন-নিষণ্ণতায় উর্ধ্ব-লীন রক্ত-নীলিমাতে
নগেন্দ্র-শিখরে যেথা করে খেলা পবনে বন্যায়।

কিন্তু আজ, হে সম্রাট, তব পরাক্রম লভিয়াছে
পরিণতি তীব্রতম অনুরাগে—যে মোর মর্মের

স্বপ্নের সমৃদ্ধি বহে প্রতি তুচ্ছ সৌন্দর্য-বিকাশে :
দেখিয়াছি, অসীমের উড়েচলা প্রাণস্পর্শ ভাসে
প্রতি পাখা-বিধুনন-তরঙ্গিত ঝঙ্কারের মাঝে,
জানি, ক্ষুদ্র পুষ্পে গাঁথা প্রফুল্লতা যুগ-যুগান্তের।

নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

An exceedingly fine translation. I think you have misunderstood "surf-awaking sleep" in line 6.

(চমৎকার অনুবাদের পরাকাষ্ঠা। আমার মনে হয় ষষ্ঠ লাইনে "surf-awaking sleep"-এর অর্থ তুমি ভুল বুঝেছ।)

* "সমৃদ্ধি" কবিতার সংশোধন :

(ষষ্ঠ লাইন) তরঙ্গ জাগায়ে তোলা রজতাভ চাঁদের নিদ্রাতে,
(শেষ লাইন) জানি, ক্ষুদ্র পুষ্পে ধরি প্রফুল্লতা যুগ-যুগান্তের !

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

(1) I am not sure that these changes are an improvement. The original version seems to me more powerful.
(আমি ঠিক বলতে পারছি না যে এই পরিবর্তনগুলি আরো ভালো হয়েছে। পূর্বেকার অনুবাদটিই আমার মনে হয় বেশি জোরালো।)

(2) It is more accurate but poetically less effective.
(* এটি আরও বেশি নিখুঁত বটে তবে কবিত্বের দিক থেকে ক্ষীণপ্রাণ।)

শ্রীচরণেষু—গুরুদেব। যমলের "শ্রীঅরবিন্দ" কবিতাটির অনুবাদ পূর্ববৎ রাখিলাম। ভালো করিতে গিয়া মন্দ হইল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। "সমৃদ্ধি"র ভুল লাইনটি আবার সংশোধন করিলাম এইরূপে : "জোয়ারের ঢেউতোলা সুপ্তিমগ্ন পূর্ণচন্দ্রিকাতে" এই লাইনে "মগ্ন" কথাটি থাকাতে "নির্জন-নিমগ্নতার"-এর স্থানে "বিশাল-নির্জনতায়" করিলাম। "ধরি" কথাটি কাটিয়া "গাঁথা" কথাটি রাখিলাম।* এবার কেমন হয়েছে জানাবেন। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি প্রণত নিশিকান্ত

(* জানি, ক্ষুদ্র পুষ্পে ধরি)

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

It seems to me quite all right now.
(আমার মনে হয় এটা এখন পুরোপুরি ঠিকই আছে।)

THIS ERRANT LIFE

This errant Life is dear although it dies;
And human lips are sweet though they but sing
Of stars estranged from us; and youth's emprise
Is wondrous yet, although an unsure thing.

Sky-lucent Bliss untouched by earthiness!
I fear to soar lest tender bonds decrease.
If Thou desirest my weak self to outgrow
Its mortal longings, lean down from above,

Temper the unborn light no thought can trace,
Suffuse my mood with a familiar glow!
For 'tis with mouth of clay I supplicate:
Speak to me heart to heart words intimate,

And all Thy formless glory turn to love
And mould Thy love into a human face!

এই পান্থজীবন
(প্রথম অনুবাদ)

পান্থজীবন বড়ই প্রিয়, মরণ মাঝে যদিও তার যাত্রা অবসান ;
মানবের এই অধর মধুর, যদিও সে মুখর হয়ে অলীকতারা ভাবে
বিভোরসুরে গান গেঁথে যায় ; যৌবনের এই দুঃসাহসিকতার অভিযান
পরম আশ্চর্য তবু জানে না তার আশায় সে-ফল পাবে কি না পাবে।

হে আকাশ প্রদীপ্তকান্তি, পার্থিবতার স্পর্শবিহীন হে আনন্দময়!
মেলতে তোমায়-চাওয়ায়-ডানা শঙ্কা লাগে! এ ক্ষীণ বাঁধন ছিন্ন যদি হয়।
এ মর্ত্যআকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত পরিণতির পথে তুলতে যদি চাও
আমায় তুমি, তবে এবার উর্ধ্ব হতে আমার পানে অবতরণ করো,

স্নিগ্ধ করো অচিন্-আলো—তীব্রতা যার সইতে নারে কোনো ভাবের প্রাণে,
পরিপ্লুত করি আমার আকুলতায় পরিচিত দীপন তব দাও,

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্তিকা

? আমার এ যে মাটির আনন—তোমার করুণার তরে সে শুধুই ভিক্ষা চায় :
হৃদয়তলে হৃদয় রাখি আমার সঙ্গে বলো কথা অন্তরঙ্গতায়.

. ? অসীম অরূপ ঐ গরিমার প্রকাশখানি অনুরাগের লীলায় তুমি ধরো
আর সে প্রেমের লীলা তোমার সমুখে মোর মূর্তিরা দাও মানবের সমানে।

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

It is a fine translation on the whole, but in the last ?-lines I don't think it quite renders the intensity of the original or the peculiar turn of the sense which creates the intensity—its force and power.

(মোটের উপর এটি একটি চমৎকার অনুবাদ. কিন্তু শেষের ?-চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে মূলের তীব্রতা বা যে অদ্ভুত অনুভূতির মোচড়ে এই তীব্রতার সৃষ্টি—সেই প্রেরণা ও শক্তি পুরোপুরি ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে হয় না।)

এই যাযাবর জীবন
(দ্বিতীয় অনুবাদ)

এই যাযাবর জীবন যে প্রিয় যদিও মৃত্যু নহে ;
আর মানবের অধর মধুর যদিও সে সঙ্গীত
রচিল অলোকতারার ছন্দে ; পূর্ণিম-বৈভবে
এ আশ্চর্য যৌবন জাগে তবু সে অনিশ্চিত।

অন্তরজ্যোতি হে অপার্থিব আনন্দ। তব কাছে
উড়ে যেতে প্রাণ কাঁপে এ কোমল-বন্ধন ছেঁড়ে পাছে।
মর্ত্য-বাসনা হতে যদি তুমি আমারে তুলিতে চাও
তবে আপনারে ঊর্ধ্ব হইতে আন করি' আনমিত,
সে অপ্রকাশ অচিন্ত্য আলো করো অতীব্র করো,
মোর আকুলতা পূর্ণ করিয়া পরিচিত প্রভা দাও।
তৃষায় আর্ত্ত এই মৃন্ময়-আনন আমার চায় :
হৃদয়ে হৃদয় রাখি কথা বলো অন্তরঙ্গতায়,
তব কায়াহীন গৌরবরাশি করো প্রেমে লীলায়িত
আর সেই প্রেম মানব-বয়ান রূপে মূর্তিরা ধরো।

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব। আজ সকালবেলা এই কবিতাটি অবলের কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নিয়েছি। এবার মাত্রাবৃত্তে অনুবাদ না দিয়ে মূল ভাবটি ফুটোবার চেষ্টা কোরলাম। আগেকার অনুবাদের তুলনায় এটি কেমন হ'ল জানাবেন। শেষের সাত লাইনের যে ভ্রম ছিল তা সংশোধিত হয়েছে কিনা জানাবেন। আপনারা আবার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি। প্রণত নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

No. I am afraid this version is not at all successful—you have rendered the sense more accurately, but the power is not there. (না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে এবারকার অনুবাদটি মোটেই সার্থক হয়নি—তুমি অনুভূতিটি আরও নির্খুঁতভাবে ফুটিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে নেই শক্তির স্ফুরণ।)

যাযাবর এ জীবন
(তৃতীয় অনুবাদ)

যাযাবর এজীবন বড় প্রিয়, যদিও মরণ
লভে ; মানবের অধর বধুর, যদিও সঙ্গীত
রচে সুদূর-তারার ছন্দে ; দুঃসাহসী এ যৌবন
যদিও আশ্চর্যময়, সে বৈভব তবু অনিশ্চিত।*

অগ্নিজ্যোতি অপার্থিব হে আনন্দ। এ প্রাণ শঙ্কায়
কাঁপে উড়িতে তোমার পানে—যদি ছিন্ন হয়ে যায়
সুকোমল এ বন্ধন। এই মর্ত্যবাসনার পারে
আমারে তুলিবে যদি, ঊর্ধ্ব হতে হও আনমিত,
স্বপ্রকাশ অচিন্ত্য আলোক তব অতীব্র করিয়া
এসো তুমি, পূর্ণ করো পরিচিত প্রস্ফুরণধারে
উন্মুখ-আকুলতা ! এ মৃন্ময় আনন যে চায় :
হৃদয়ে হৃদয় রাখি কথা বলো অন্তরঙ্গতায়, ¢
অনঙ্গ-গৌরব তব প্রেমাবেশে করো লীলান্বিত,
মানববরানরূপে সেই প্রেম তোল গো মূর্তিয়া।

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব। মাত্রাবৃত্তে ও স্বরবৃত্তে জোরালো ভাব প্রকাশ করা যায় না। সেই জন্য এবার এই অনুবাদটি অক্ষরবৃত্তে চেষ্টা কোরলাম। এই শেষ চেষ্টা কেমন হ'ল জানাবেন।

পূর্বেকার ভ্রমগুলি সংশোধন হ'ল কিনা জানাবেন। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণত নলিনীকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

* I am afraid you have reversed the meaning here. It is rather: although uncertain, it is wonderful.

(আমার ভয় হয় তুমি এখানে উল্টো অর্থ করেছ। এটা বরং হবে : যদিও অনিশ্চিত, তবু আশ্চর্যময়।)

\$ The emphasis is on the fact that it is a mouth of clay that supplicates and therefore the supplication is for a human manifestation.

(যে সত্যের উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে তা হল : মৃন্ময় মুখ মিনতি করছে, সুতরাং এ মিনতি হ'ল মানুষী অভিব্যক্তির জন্য।)

This time it is much more the spirit of the original poem that gets through; only (apart from the two points I note in the margin) the last line is a little weak. Perhaps more prominence to the hunger for the human face would bring it out: "Let Thy love assuming a human image become a human face."

[এবারে মূল কবিতার ভাবটি অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে; কেবল (আমি মার্জিনে যে দুটি বিষয়ে মন্তব্য করেছি সে দুটি ছাড়া) শেষ পংক্তিটি একটু দুর্বল। সম্ভবত: মানুষী আননের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার অধিকতর প্রাধান্যে তা ফুটে উঠবে : "তোমার প্রেম মানবীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে হয়ে উঠুক মানুষী মুখ।"]

যাযাবর এ জীবন
(চতুর্থ অনুবাদ)

যাযাবর এজীবন প্রিয়, যদিও সে মৃত্যু লভে ;
মানবের অধর মধুরতম, যদিও সঙ্গীত
রচে সুদূর-তারার রাগিণীতে ; আশ্চর্যবৈভবে
পূর্ণ দুঃসাহসী এ যৌবন, যদিও সে অনিশ্চিত।

অমরজ্যোতি অপাপিব হে আনন্দ। এ প্রাণ শঙ্কায়
কাঁপে উড়িতে তোমার পানে—যদি ছিন্ন হয়ে যায়

সুকোমল এবন্ধন। এই মর্ত্যবাসনার পারে
আমারে তুলিবে যদি, ঊর্ধ্ব হতে হও আনমিত
অজাত-অচিন্ত্য-আলো অতীব্র করিয়া মোর প্রাণে,
এ-চেতনা পূর্ণ করো পরিচিত-প্রস্ফুরণ ধারে,
অভিন্ন-প্রকাশে এসো—এ মৃন্ময় আনন যে চায়:
হৃদয়ে হৃদয় রাখি কথা বলো অন্তরঙ্গতায়,
আর তব অনঙ্গ-গৌরববাণি করো লীলান্বিত
প্রেমাবেশে, সে প্রেম মূর্তিয়া এসো—মানব-বয়ানে!

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য:

This is all right. I think the last two lines were better in the other versions. (এবারে ঠিক হয়েছে। আমার মনে হয় শেষ পংক্তি দুটি অপরাপর অনুবাদগুলিতেই বেশি ভাল ছিল।)

শেষের দুই পংক্তির বিভিন্ন রূপ দিলাম:

১। অনঙ্গ গৌরব তব প্রেমাবেশে করো লীলান্বিত
সে প্রেম মূর্তিয়া তোলো মোর লাগি' মানব-বয়ানে।
২। অনঙ্গগৌরব তব প্রেমাবেশে করো লীলান্বিত,
মোর লাগি', সে প্রেম মূর্তিয়া দাও মানব-বয়ানে।
৩। অনঙ্গগৌরব তব প্রেমাবেশে করো লীলান্বিত
লভি সে-প্রেমের কান্তি মূর্ত হও মানব-বয়ানে।
৪। অনঙ্গ-গৌরব তব প্রেমাবেশে করি' লীলান্বিত
সে প্রেমে প্রেমিকরূপে মূর্ত হও মানব-বয়ানে!
৫। অনঙ্গ গৌরব তব প্রেমাবেশে করো লীলান্বিত
এসো সেই প্রেমাবেশ প্রমূর্তিয়া মানব-বয়ানে!

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব। শেষের দু'লাইনের, বিশেষ করে এক লাইনের বিভিন্ন রূপ দিলাম। কোন রূপটি আপনার ভাল লাগে জানাবেন। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি প্রণত নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য:

I think the last is the best among these versions.
(আমার মনে হয় শেষ অনুবাদটিই এগুলির মধ্যে সবচাইতে ভাল।)

MOTHER OF NEW-BIRTH

Her eyes embrace all life;
They are brimmed with love,
A weight which drew her down
From heaven above.

Two nectar-clouds are her breasts,
Tipped with strange fire—
A reverie of roses
Unknown to the mire—

Roses of God that tremble
Like budding suns
Within her spirit's wombed
Omnipotence.

Now that her sheen of clay
Flows through the air,
Time's secret destiny
Lies glowing bare:

Along each curve of dream
Moulded in earth,
We sweep on a wave of bliss
To shadowless new-birth.

Amal
4.6.37

Sri Aurobindo's comment:

"It is a very beautiful lyric quite equal to the others. I don't think there is the least sense of splitting—the images flow naturally one after the other."

নবজন্মের জননী

(মাত্রাবৃত্ত)

আঁখি দুটি তার সবার জীবনে দৃষ্টির আশ্লেষ
জড়ায় ; সে আঁখি পূর্ণ স্নেহের ভারে,
ভারাক্রান্ত সেই অনুরাগ ঊর্ধ্ব-অমরা হ'তে
এই বসুধার ধূলায় নামানো তারে।

সুধার জলদ-যুগল লগ্ন কোমল-বক্ষে তার,
বৃন্তে তাদের অপরূপ বহ্নিতে
আপনা বিভোলা ভাবের আবেশে গোলাপের শিখা জ্বলে—
যজ্ঞানা মুকুল এ মর্ত্য বেদিনীতে—

সে যে বিধাতার লীলার গোলাপ কিরণে বিকম্পিত
উদয়-উষার অরুণ-কলিকা সম
এই জননীর মর্ম-জ্যোতির গর্ভ-গৃহের মাঝে—
যে গৃহ অমিত-শক্তিতে অনুপম।

এতদিনে তার লাবণ্যময় দীপ্তির দেহখানি
সঞ্চরমান পৃথ্বী-পবন সনে,
কালের গোপন শুভবিকাশের অদৃষ্ট বিরাজিত
এই অনাবৃত রূপের প্রস্ফুরণে।

স্বপনাবর্ত বঞ্চিত প্রতি ভঙ্গির গতি লভি
বিরচিয়া উঠি' তনুরে দীপ্ত করি'
মোরা প্রবাহিত আনন্দময়আশীষউর্মিদোলে
ছায়ালেশহীন নবীনজন্ম ধরি'।

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

An exceedingly fine translation. I don't know however whether the meaning of the last stanza (first two lines of it) comes out very clearly. You might consult Amal.

(অতি চমৎকার অনুবাদ। যদিও আমি জানিনা শেষ স্তবকটির প্রথম দুটি লাইনে অর্থ খুব স্পষ্টভাবে ফুটেছে কিনা। তুমি অমলের সঙ্গে আলোচনা করতে পার।)

অমলের মন্তব্য :

(Last stanza)

Her whole body is as if made of curves of dreams given a physical form. Each such curve traces in our consciousness a wave of bliss on which we sweep to shadlowless new-birth.

(শেষ স্তবক)

তাঁর সমগ্র দেহখানি যেন সব স্বপ্নের মত বক্রতল দিয়ে গড়া যাদেরকে শারীরী কোরে তোলা হয়েছে। এই প্রতিটি বক্রতল আমাদের চেতনায় এঁকে দেয় পরমসুখের ঊর্মিদোল যার দোলায় আমরা ভেসে চলি ছায়ালেশহীন নবজন্মে।

নিশিকান্তের সংশোধিত শেষ স্তবক ও শ্রীঅরবিন্দের নিকট লিখিত পত্র :

স্বপ্নময়ী সে প্রতিবার তনু-বলয়ের বঙ্কিত
প্রতি রূপ-রেখা হেরিয়া স্বপনে শোভি'
মোরা প্রবাহিত আনন্দময়আশীষঊর্মিদোলে
ছায়ালেশহীন নবীনজন্ম লভি'।

শ্রীচরণেষু গুরুদেব। আজ অমলের কাছ থেকে জেনে অনুবাদের ভুলটি সংশোধন করে দিলাম। Roses এবং Suns-এ অমল "বহু জাতক" অর্থ কোরেছেন, সেই জন্য আমি 'গোলাপ দুটি' এবং 'দুটি আরক্ত অরুণ' কেটে দিয়ে 'গোলাপের শিখা', 'উদয়-উষার অরুণ' কোরলাম, ও সেজন্য যেটুকু পরিবর্তন আবশ্যক, তা কোরলাম। সংশোধন কেমন হয়েছে জানাবেন। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

প্রণত নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

Very good.
(খুবই ভাল হয়েছে।)

II

হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

SHAPER TO SHAPED

In days gone by I used to be
A potter who would feel
His fingers mould the yielding clay
To patterns on his wheel.
But now, through wisdom lately won,
That pride has died away.
I have ceased to be the potter
And learned to be the clay.

In bygone times I used to be
A poet through whose pen
Innumerable songs would come
To win the hearts of men.
But now, through new-got knowledge
Which I hadn't had so long
I have ceased to be the poet
And have learned to be the song.

I was a fashioner of swords,
In days that now are gone,
Which in a hundred battlefields
Glittered and gleamed and shone.
But now that I am brimming with
The Silence of the Lord
I have ceased to be the sword-maker,
I have learned to be the sword.

In other days I used to be
A dreamer who would hurl
On every side an insolence
Of emerald and pearl.
But now that I am kneeling
At the feet of the Supreme
I have ceased to be the dreamer,
I have learned to be the dream.

Harin

রূপান্তরিত রূপকার

দিন গেছে, যেদিন আমার
এজীবন ছিল কুম্ভকার ;
আবর্তিত চক্রপরে অঙ্গুলি দুলিত যার অনুভূত সৃষ্টির লীলায়,
সৌষ্ঠব-সুষমা দিত রূপহীন পিণ্ডমৃত্তিকায়।
মৃত্যু লভিয়াছে মোর সেদিনের সেই অহংকার,
শিখেছি মৃত্তিকা হ'তে, আজি আমি নই কুম্ভকার।

বেলা গেছে, যে বেলায় লভি'
এ জীবন ছিল দৃপ্ত কবি ;
যাহার লেখনী হ'তে অজস্র সঙ্গীতধারা নির্ঝরিয়া উঠিত মর্মরি',—
মানবের মর্মলোকে উচ্ছলিত দিগ্বিজয় করি।
প্রস্ফুট প্রজ্ঞায় মোর অভীপ্সিত উপলব্ধি শোভি'
শিখেছি সঙ্গীত হ'তে, আজি আমি নহি আর কবি।

গেল সেই প্রমত্ত প্রহর...
এ জীবন ছিল অসিধর ;
অসংখ্য সংগ্রাম মাঝে যে মুক্ত কৃপাণখানি ঝনঝনিত ঝলকি' ঝলসি',
তোমার শক্তির করে স্তব্ধ হলো সে অশান্ত অসি।
বজ্রধৃতবাহু তব স্পর্শিয়াছে আমার অন্তর,
শিখেছি কৃপাণ হ'তে, আমি আজ নহি অসিধর।

গেছে সেই দিবস রজনী...
এ জীবন ছিলগো স্বপনী ;
দশদিক বিচ্ছুরিয়া হীরামণিমানিকোর উদ্ভাসিত প্রাচুর্য প্রকাশে
খেলেছি বিহ্বল-খেলা ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল উল্লাসে।
অখিলস্বপ্নের স্রষ্টা সুন্দরের চরণ বরণি'
শিখেছি স্বপন হ'তে, আমি আজ নহি সে স্বপনী।

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য :

Very good indeed. The language perhaps a little too ample and splendiferous for Harin's extreme, sometimes colloquial, simplicity—but that need be not very serious objection.

(বাস্তবিক খুবই ভাল। ভাষা হয়ত হারীনের চরম কখনও কখনও কথ্য সরলতার তুলনায় একটু বেশি প্রাচুর্যময় ও সমৃদ্ধ—কিন্তু তাতে খুব গুরুতর আপত্তির কোন কারণ নেই।)

শ্রীঅরবিন্দকে লিখিত নিশিকান্তর একখানি পত্র

শ্রীচরণেষু

গুরুদেব, "সুবর্ণ-শিখর" vision-এর কবিতা পাঠাইলাম। উক্ত vision-এর আপনি যেরূপ অর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই কবিতাটি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ভাবটি কতখানি ফুটিয়াছে জানাইবেন।

আমি আর একটি vision দেখিয়াছি। ইহা আরো অদ্ভুত। ইহারও একটি কবিতা লিখিব মনে করিতেছি। এই vision-টিও আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন। ইহার কি অর্থ বুঝিতে গিয়া আমি গোলকধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। vision-টি এইরূপ :

দেখিলাম, গভীর অন্ধকার! আকাশ, পৃথিবী কিছুই নাই! সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যদেশে একটি ত্রিকোণমণ্ডলাকার স্ফটিকবর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত ক্ষুদ্র তারকা আবির্ভূত হইল। এই তারকা ক্রমে বড় হইতে লাগিল; অন্ধকার অন্তর্হিত হইল; শেষে এই তারকা ক্রমে তিনটি দীর্ঘ দিগন্ত এবং ত্রিকোণমণ্ডলাকার স্ফটিকবর্ণ বৃহৎ আকাশ ঊর্ধ্বে ধারণ করিল; এমন সময় সেই তারকার মধ্যদেশে হইতে একটি সবুজ বর্ণ অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অতি শীঘ্র বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হইল; এই বনস্পতির মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ড, শাখা, ফুল, ফল, পল্লব সবই সবুজ; বনস্পতির দীপ্তিতে আকাশ এবং সেই দিগন্তবিস্তৃত স্ফটিক-স্বচ্ছ ত্রিকোণমণ্ডলটিও সবুজাভ হইল। এমন সময় দেখিলাম ত্রিকোণমণ্ডলের তিন দিগন্ত হইতে বহুসংখ্যক সবুজবর্ণ প্রজাপতি ও পাখী বনস্পতির নিকট আসিল, প্রজাপতিরা ফুলে ফুলে মধুপান করিতে লাগিল এবং পাখীরা শাখায় শাখায় বসিয়া চঞ্চুদ্বারা ফল খাইতে লাগিল; এমন সময় আকাশে নীলবর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলবিশিষ্ট একটি স্বর্ণ-সবুজাভ পূর্ণচন্দ্র উঠিল, চন্দ্রটি উঠিয়াই মিলাইয়া গেল...সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বনস্পতিটিও ত্রিকোণমণ্ডল প্রান্তরের গর্ভে প্রজাপতি এবং বিহঙ্গদলের সহিত বিলীন হইল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেইরূপে একটি নীলবর্ণ অঙ্কুর বাহির হইয়া নীলবর্ণ ফলপুষ্প সহিত বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হইল; তিন দিগন্ত হইতে নীলবর্ণ পাখী ও প্রজাপতি আসিয়া ফল ভক্ষণ ও ফুলের মধুপান করিতে লাগিল; শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলধারী ইন্দ্রনীল স্বর্ণাভ পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াই পূর্ববৎ মিলাইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতি পাখী ও নীল বনস্পতি ত্রিকোণমণ্ডল গর্ভে মিলাইল। কিছু পরে আবার উক্তরূপে একটি সুবর্ণ অঙ্কুর বাহির হইয়া বিশাল স্বর্ণ-বনস্পতিতে পরিণত হইল; তিন দিগন্ত হইতে স্বর্ণপ্রজাপতি ও পাখীর দল স্বর্ণ-ফুল-ফলের শাখায় আসিল; রজত-দীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলধারী শুভ্র-স্বর্ণাভ পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াই পূর্ববৎ মিলাইল; স্বর্ণবনস্পতি এবং ফুল, ফল, পাখী, প্রজাপতি ধীরে ধীরে স্বর্ণ-শুভ্রতায় পরিণত হইয়া স্ফটিকস্বচ্ছ-ত্রিকোণমণ্ডলের গর্ভে অদৃশ্য হইল; ত্রিকোণমণ্ডলটি ক্রমে পূর্ববৎ ক্ষুদ্র তারকাকার ধারণ করিল এবং অদৃশ্য হইল। এই সময় আমার vision ভাঙিয়া গেল।

এখন আপনি বলুন, এই অতি অদ্ভুত vision-টির কি অর্থ হইতে পারে এবং আমাকে শক্তিমান করুন যাহাতে ইহার ভাব আমার কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হই। ইতি

প্রণত নিশিকান্ত

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর :

It is probably a symbol of three stages or developments or planes of spiritualised life. A star means creation, the triangle a triple principle. The tree is life in a new creation. Green is the colour of the emotional vital, the moon governs a spiritualised emotional life; blue is the colour of the higher mind, the moon there governs a spiritualised higher mind life: the gold colour is that of the Divine Truth, whether intuitive or overmind—the moon here is the spiritualised Truth life. As the star is *sphatika* coloured, the triangle may indicate Sachchidananda principle. The butterflies and birds are, of course, life-forces and soul forces, powers or beings. Probably it indicates three stages of transformation before the supramental can reign altogether or else three that will exist as the steps leading to the supramental.

অনুবাদ :

এ হয় ত' আধ্যাত্মিক জীবনের যে তিনটি অবস্থা বা পরিণতি বা ভূমি তাদের প্রতীক। তারকা অর্থ সৃষ্টি ; ত্রিকোণ হ'ল ত্রি-তত্ত্ব ; বৃক্ষ হ'ল নূতন সৃষ্টিতে জীবনধারা ; সবুজ হৃদয়াবেগময় প্রাণ ; চন্দ্র হ'ল আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আবেগময় প্রাণের অধিপতি ; নীল হ'ল উর্ধ্বতর মনের বর্ণ ; চন্দ্র সেখানে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ উচ্চতর মনোময় প্রাণের অধিপতি ; স্বর্ণবর্ণ হ'ল ভাগবত-সত্যের রঙ, তা অন্তর্জ্ঞানময় হোক বা অধিমানস হোক—চন্দ্র এখানে আধ্যাত্মিকতাময় সত্যরূপী জীবন ; তারকা যখন স্ফটিকবর্ণ তখন ত্রিকোণের অর্থ হতে পারে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব ; প্রজাপতি, পাখী, বলা বাহুল্য, এসব হ'ল প্রাণবল বা অন্তরাত্মার বল, শক্তিস্বরূপ বা সত্তাস্বরূপ ; হয় ত' এখানে দেখান হয়েছে অতিমানসের পূর্ণ-শাসনের পূর্বে রূপান্তরের তিনটি ক্রম অথবা এই তিনটি দেখা দেবে অতিমানসের অভিমুখে তিনটি সোপান হিসাবে।

কবি নিশিকান্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

নিশিকান্তর কবিতা মায়ের বাঙ্ময়ী মূর্তি, ঐশ্বর্যময়ী, মহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। বাক্-রাজ্য থেকে তিনি সকল রকম—যা কিছু সম্ভব—উপাদান সংগ্রহ করেছেন : অক্ষরের, কথার, ধ্বনির স্পন্দন, যত ধরনের রঙে প্রতিফলিত হয়, যত ধরনের রেখায় লীলায়িত হয়ে ওঠে তাদের বহুতর মধুরতর সমাহার দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন মায়ের এই বাক্-শ্রী মূর্তি। এ সব যে মায়ের অলঙ্কার হয়েছে শুধু তা নয়, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা নয়; এ সব হ'ল তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জীবন্ত দেহের প্রতিটি কোষ; এ সব জীবন্ত জাগ্রত হয়ে উঠে মায়ের এক চিন্ময় দেহ গড়ে দিয়েছে। নিশিকান্তর বাক্ বা বাণী বস্তুসত্যের উপর আরোপ-মাত্র নয়, তা কেবল আলেখ্য উপমা প্রতীকমাত্র নয়, তা সত্যের নিজস্ব শরীর, অপরূপ এক সূক্ষ্ম অথচ জীবন্ত শরীর। এ যাদু তিনিই জানেন কি করে আয়ত্ত করেছেন। প্রকৃতির বিচিত্র রং-রূপে ছন্দে-গতিতে, তাদের অন্তরে নিভৃতে তিনি দেখেছেন মায়ের অধিষ্ঠান, অনুভব করেছেন তাঁকেই। আন্তর জগতে মন-বুদ্ধির খেলায়, প্রাণের খেলায়, সর্বত্র মায়েরই শারীর প্রকাশ। মানুষের অন্তরতম অনুভূতি উপলব্ধিতে আশ্বাসে আশায় ফুটে উঠেছে মায়ের হাস্য। কিন্তু এ সবই স্ফুরিত হয়েছে যে ভাষায় তা জীবন্ত জাগ্রত এক মানুষী তনুর স্পন্দনে প্রতিমূর্ত।

বৈদিক ঋষি বলেছেন, কবি তাঁর কবিত্বশক্তি দিয়ে স্বর্গে বেঁধে দিলেন সুন্দর রূপ, নিশিকান্তর কবিত্ব ঐ ধরনের শক্তি—সেই মন্ত্রশক্তি যা উদ্ঘাটিত করে ধরেছে, উদ্ভাসিত করে ধরেছে মায়ের জাগ্রত সান্নিধ্য। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে—

আমার ধূসর ম্লানধূলি
তারার বিবর্তপার হতে লভি জ্যোতির অঙ্গুলি
জননীর স্পর্শ জানে। লভিয়াছি সন্তান-যাত্রার
অনাহত অনুভূতি! কোন ছন্দ, কোন অলঙ্কার
আমারে বাঁধিতে পারে? আমি দীন, আমি অকিঞ্চন
ধরণীর কণা আমি, তৃণপুষ্প, মর্ত্যের জীবন;
আমি দেশকালজয়ী কিরীটের অধীশ্বর নই;
মোর এক মুহূর্তের অনুভবে যে স্পন্দন লই,
* * *
সেথা অধিষ্ঠিত রয় বিশ্ব-বীণাপাণি, তাই জানি:
সে-স্পন্দনে, ছন্দ মোর মন্ত্র হয়, কথা হয় বাণী।

কবি বলেছেন, তাঁর কথা হ'ল কথা নয়, বাণী, মন্ত্র, অর্থাৎ যে ধ্বনি শব্দব্রহ্মের দোসর, যা বোধন করে, জাগ্রত করে, জীবন্ত করে ধরে আমাদের স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে

পরম সত্যকে, মাতৃ-মূর্তিকে—এত জাগ্রত, এত জীবন্ত যে প্রাকৃত চিত্ত আকুতিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—

"মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে"—

নিশিকান্তর বাক্‌প্রাবনে অনর্গল উচ্ছল প্রাচুর্য কিন্তু আশ্চর্য সেখানে অধিকন্তু অনাবশ্যক কিছু নাই—সুচিবদ্ধ নিটোল গঠন এর। এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও এ কবিকন্যা আদৌ ভারাক্রান্ত নয়, এমন কি অলসগমনও নয়, পাখীর মত উড়ে চলে হেলায় অবাধ আকাশে, অথবা তরঙ্গ-মালার মত বয়ে যায় সহজসুন্দর লাস্যে। শরীরে প্রতিটি কোষ যেমন সমগ্র শরীরের পক্ষে অপরিহার্য, স্বাস্থ্যের জন্যে, সৌন্দর্যের জন্যে তেমনি আমাদের এই সাধক শিল্পী কবির এ মাতৃমূর্তিতে বাঙ্ময় গঠনে কোথাও অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় কোন উপাদান নাই। পরিণত চেতনায় কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর অন্তর-রহস্য অপরূপ ভঙ্গিমায় :

চন্দ্রিত মুখ-মধুরিমা, ওগো অমল-আঁখির ধ্রুবতারা !
উদার অলকানন্দার মত বহিব তোমার রূপ-ধারা !
বহিব তোমারে অন্তরতম দেশে
নিভৃত সুরের রজতের স্রোতে ভেসে
নিরালা-নিহার-শিহরিত সরণিতে
ছায়ালোকহীন আবেশের সঙ্গীতে
বহিতে বহিতে তব অবলতা আপনারে আমি হব হারা।
চন্দ্রিত মুখ-মধুরিমা, ওগো অমল-আঁখির ধ্রুবতারা !

কবি বলছেন, পরিবেশ আবেষ্টন পরিচ্ছদ কি রকমে মায়ের অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছে, সেই অঙ্গে আবার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছেন কবি স্বয়ং নিজে, এই রূপান্তরের রহস্য কবি নিশিকান্তের কবিত্বের মর্ম।

নিশিকান্তের কাব্যের, তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র হ'ল মাতৃমন্ত্র—বন্দেমাতরম্। প্রতি নিঃশ্বাসে কবি তা জপ করে চলেছেন ; আর যে অনুষ্ঠানে, যে শারীক্রিয়ায়, যে মন্ত্র আশ্রয় করে এ মন্ত্র সাধিত হয়েছে তা হ'ল ভূলুণ্ঠিত প্রণতি, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। নিরন্তর তিনি বলে চলেছেন "না লহ প্রণাম তব পদ-কমলে" আর যে আদি রসে আপ্লুত প্রাণত সে মন্ত্র তা হ'ল—সা পরানুরক্তি।

(২)

নিশিকান্ত তরুণ বয়সে কতকগুলি কবিতা লিখেছিলেন, খণ্ড কবিতা, নাম দিয়েছিলেন 'টুকরি' অর্থাৎ টুকরোতে ভরা টুকরি—ছাপাও হয়েছিল সে যুগের এক পত্রিকায়, বিখ্যাত পত্রিকাই (আমারও কিছু লেখা হয় ত ঐ সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল ঐ একই পত্রিকায়) 'বিচিত্রা'য়। সে চল্লিশ বছর আগেকার কথা, কবি তখন এখানে আসেন নি। তিনি এগুলির কোন মূল্যই দিতে চান নি, ভুলেই যেতে চেয়েছিলেন, ভুলেই হয় ত গিয়েছিলেন। আমরা সেগুলি উদ্ধার করেছি।

কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক নয়, ধর্মবিষয়ক নয়, সোজাসুজি জাগতিক লীলা, সাধারণ

পাষাণ কেষ্ট স্কেচ উপেন্দ্র

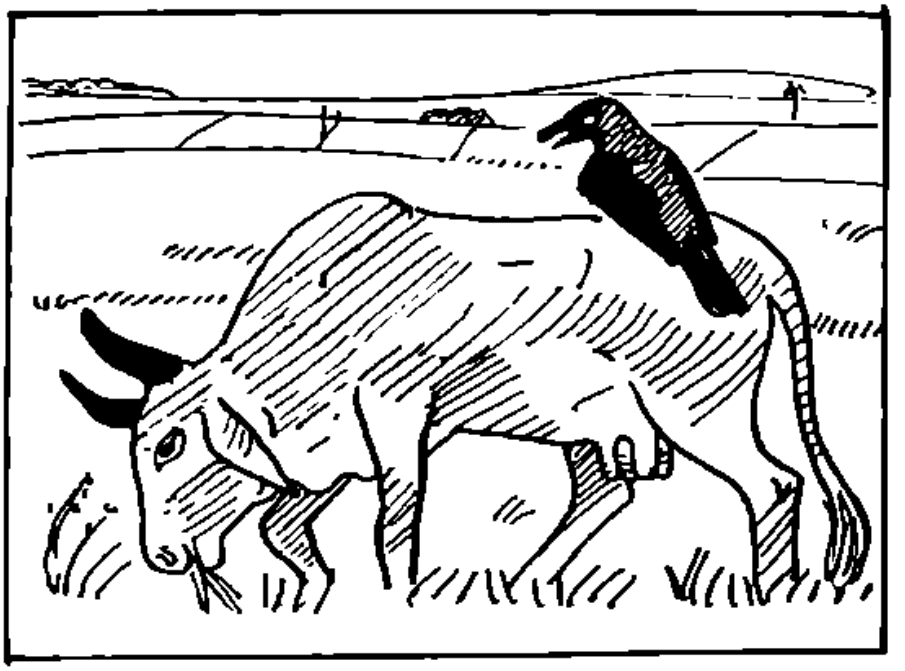

তিন রঙা ছবি স্কেচ উপেন্দ্র

মানুষ জীবনের কথা—অতি সাধারণ, অতি সহজ, অতি সুন্দর। আমি কিছু উদাহরণ দেব, তাই এই বিষয়টির অবতারণা।

নিশিকান্ত কবি ছিলেন, তিনি যে চমৎকার চিত্রকর ছিলেন তা বোধ হয় অনেকেই প্রথম ভুলে গিয়েছেন। যার কবিতার মধ্যেও তিনি তাঁর চিত্রণক্ষমতার অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন—এই টুকরির টুকরোগুলি প্রত্যেকে এক একটি পরিপূর্ণ ক্ষুদ্রচিত্র—যিনি ছবি (Vignette), বলতে পারি সুভাষিত চিত্র।

আমরা গায়ক হেমন্তকুমারের কণ্ঠে শুনেছি এক মধুময় গাথা—সুরে আঁকা করুণ ছবি এক—"রাণার রাণার"—নিশিকান্ত তেমনি আমাদের সম্মুখে তাঁর কথায় এঁকে দিয়েছেন আর এক ধরণের, অলৌকিক 'রাণার'।

পরাণ কেষ্ট

আষাঢ় চলেছে আধার আকাশে
বেণের ঝুলিটা নিয়ে,
বর্ষণ তার পাড়ায় পাড়ায় দিতে।
ঝুলি নিয়ে কাঁধে ঘন্টি বাজিয়ে
নির্জন পথে ছোটে
পোষ্টাপিসের পরাণকেষ্ট রাণার।"

কবি চিত্রকরের চোখে রঙের বৈচিত্র্য—বিরোধ মিলন—রঙের জন্য রঙের খেলা—কত সহজ শোভন সুন্দর হয়ে ধরা দেয়, ধরে দেয় যেন একটা শুদ্ধ ছবি

তিন রঙা ছবি

যতদূর চাই সরস সবুজ মাঠ :
তারি মাঝে চরে অলস পাটল গরু,
দাঁড়কাক তার পিঠে বসে আছে
চিকন কালো।

তবে কবির দৃষ্টি সব সময় এমন অমল ধবল পাল তুলে যাওয়া নয়, শিল্পীর দৃষ্টিতে দুষ্টুমিরও অন্ত নাই—দেখুন তাঁর স্মিত হাস্য একটু অনবদ্য এই ছবিটিতে

উধাও

রাঙা পথখানি ফাঁকাশে হয়েছে চাঁদের আলোয়
ধূ ধূ করে খোলা মাঠ,
একা তালগাছ শূন্যে তাকায়ে রয়।
থেকে থেকে আজ দমকা হাওয়ায়
আঁচলে পাঞ্জাবীতে বাধায় দুলুঝুল।"

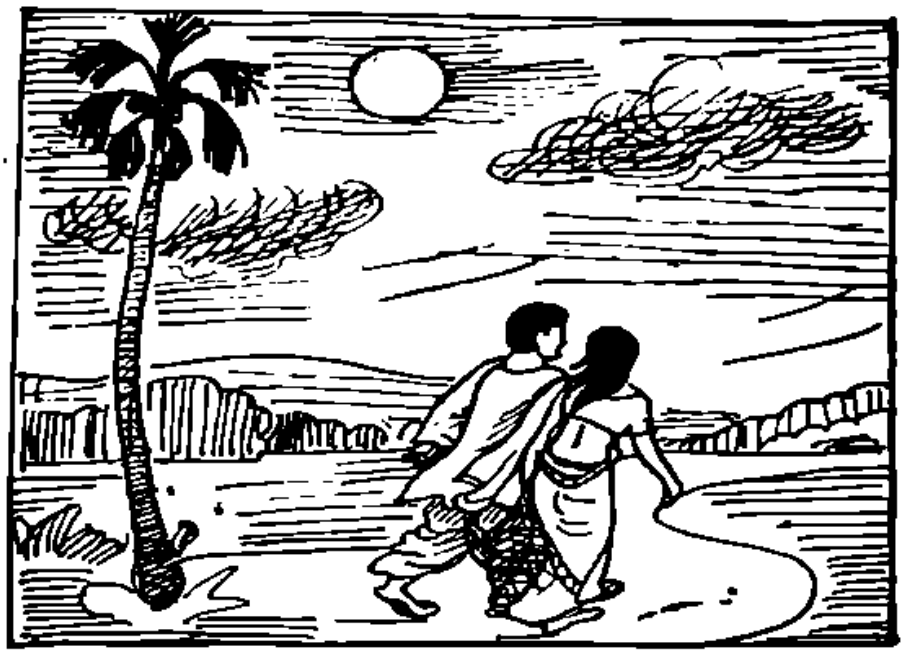

উধাও

স্কেচ : উপেন্দ্র

চর্চ

স্কেচ : উপেন্দ্র

অথবা একটু বা নরম ভঙ্গিতে

চঙ

তখনো অন্ধকার ;
কিসের শব্দ ? বাগানে ঢুকেছে গরু ?
নয়তো বাদুড় এসেছে আমের লোভে।
টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখি,
জামরুল গাছে একটা ছেলে
তলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আঁচল পেতে।"

আরো একটু রসাল বাক্যের দাদু শুনাই

কনে দেখা

ছয় মাস আগে কলেজ ছেড়েছ ?
শেলী পড়েছ তো, কবি ব্রাউনিং ?
ঘরের কোনের হার্মোনিয়াম তোমার বুঝি,
বাজাতে জানোতো ?
গাও তো একটা নজরুল ইস্‌লাম।

তবে এসকল কাকলির অন্তরালে এক অনুক্ত কিছু রয়েছে, অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য কিছু, সেই দিয়েই কবি শেষ করেছেন তাঁর এই পর্যায়টি—

আমার কথাটি ফুরোলো

আমার কথা ফুরায়, তবু
আবার কথা ভবে
নতুন নটে গজিয়ে ওঠে
নতুন শাকের ক্ষেতে।
গরু চরে বুড়িয়ে যেয়
ভাত দিতে বৌ ভোলে
কেন ভোলে সেই কথাটি
বলা রইল বাকি।

মনে পড়ে যায় শ্রীঅরবিন্দের সেই বাক্যটি—A cry that persevered into eternity. এ হ'ল সেই কণ্ঠ যার জের চলে গিয়েছে অনন্তের কোন অবধি।

নিশিকান্তের মধ্যে পূর্বতন নিশিকান্তের এই যা ছিল অনুক্ত, পরে যুক্তি পেয়ে তা হয়েছে উক্ত, উদার উদাত্ত কণ্ঠে ; যা ছিল বোবা তা হয়ে উঠেছে মুখর, প্রায় প্রগলভ—আপূর্যমান নির্ঝরের মত অনর্গল কলোচ্ছল—কোন সোনার কাঠির স্পর্শে ?

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

ভূমিকা

গগনের কথা সূর্যের আলো ;
ধরণীর কথা সূর্যমুখীর বনে।
পাখী কথা কয়, বৌ কথা কও ;
সখীতে সখীতে কানে কানে হয় কথা।
বাজারে বাজারে চলে সারা বেলা
কথার হট্টগোল।
আমি ফিরি তারই মাঝে,
কথা কুড়োনোর ব্যবসা আমার
টুকরি বোঝাই করি॥

দ্বন্দ্ব

ঝড়ের সকালে পাখী পড়ে আছে
আমবাগানের তলে,
মণিতে বিনুতে নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মণি বলে ওকে পুষব খাঁচায়
বিনু বলে, ওকে বাসায় ফিরিয়ে দেব।
এ তর্কে পাখী আপনার শেষ কথা
জানালো দিনের শেষে
বাসা ও খাঁচার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল।

কলাপাতা

তালের পাতা ঘন সোনার মাখা,
শালের পাতা বাজায় করতালি,
খেজুর পাতায় শুনো লড়াই
লক্ষ হাজার বর্শাফলক তুলে।
ঝোড়ো-হাওয়ায় বাঁশের পাতা নাচে,
আমলা পাতায় শামলা নাচের নেশা,
কেবল শুধু কাঁদে কলার পাতা
ছিন্ন ভিন্ন বেশে।

ভরা বাদর

পথের আকাশ মেঘের কালোয়
ভরলো দিকে দিকে।
দত্ত বাড়ীর
মরা দীঘি কানায় কানায় ভরা
কাক-চক্ষু জলে।
আমবাগানে, জামবাগানে, নেবুর বাগানে
চুপে চুপে সবুজ হল ঘন।
আমার মনে উঠ্‌লো ভরে
অকারণের ছায়া।

চোর

কেউ বা বলে—লোকটা পাগল।
কেউ বা বলে—চোর।
কেউ বা বলে—বেজায় রোগা, ম্যালেরিয়ার রুগী।
রুলের গুঁতো দিয়ে পুলিশ বলে—বে বদমাস।
লোকটা বলে—দুঃখী আমি,
তার বেশী দোষ নেই।

জ্যৈষ্ঠ

রক্তজবা ঝাম্‌রে আসে রোদে;
পাপ্‌ড়িগুলি নেতিয়ে পড়ে নুয়ে,
কাঁঠালবনে পাতার আগায় তীক্ষ্ণ আলো
চক্‌চকিয়ে ওঠে।
শুক্‌নো কুয়োর ধারে নামে
জলের আশায় দলছাড়া দাঁড়কাক;
খেঁদু কুকুর নর্দমাতে ঠাণ্ডা কাদায় শুয়ে
চক্ষু বুজে জিভ্ লেলিয়ে হাঁপায় বোসে।

বন-পথে

বনের পথে কঠিন কাঁটা,
একটা বুঝি ফুটলো পায়ে।
চোখ নামিয়ে দেখি
কত চরণ মোহন রঙে ঘিরে
চাইল ফনা কাঁটা-লতার ফুল।

পলাতকা

বুড়ো বরের হাতে আমায় দিলি,
বুড়ো গেল ম'রে।
একলা ঘরে কেমন কোরে থাকি?
মাগো, আমি চলে যাবো তোদের সঙ্গ ছেড়ে
ইষ্টিশনের কলগাড়ীতে চেপে.
রাত্রি যখন নিশুত হবে,
আঁধার হবে বন,
সঙ্গে রবে করিম গাড়ীর ছেলে।
নিয়ে যাবে পদ্মাপারের দেশে;
গড়িয়ে দেবে হাতের বালু,
পরিয়ে দেবে গলায় মটরমালা।

রথ

ছুটে এসে দুয়ার খুলে চাই,
রথ গিয়েছে চলে,
দূরে বাজে রথের শব্দ—শূন্য আঁধার পথ।

শিশির

পথের পাশে ঘুমিয়ে ছিলেম,
কখন এল গোপনচারিণী।
সকাল বেলায়
ললাটে মোর স্বপ্ন শেষের
শিশির ঝরা জল।

শিকারী

ঘুরে ঘুরে পড়ে ধুলায় লুটিয়ে
চঞ্চুর সাথে চঞ্চু মিলায়ে ডাকে,
অবশ ডানায় ডানা ঝাপটিয়া
নীরব নিচল সাথীরে জাগাতে চায়।
যারে মারো নাই,
তাহারে শিকারী
মেরেছ অনেক বেশি।

চাঁপা

এই চাঁপারে চিনিনে তো,
সেই চাঁপাটি কই?
সেই যে তোমার প্রথম চোখের চাওয়া,
খোঁপার থেকে খসিয়ে দেওয়া
প্রথম দোলন চাঁপা।

রক্তজবা

দেখতে পেলেন, বুনোছেলে
রক্তজবা পরিয়ে দিল কালো মেয়ের কানে।
একটু দূরে—আরেক মেয়ে
কেমন করে তাকিয়ে থাকে এই ছেলেটির দিকে।
দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়,
এক পলকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথার জবা
অকারণেই ছুঁড়ে ফেলে ছিন্ন ছিন্ন ক'রে।

সকালবেলা

মাকড়সা-জাল ঘাসের পরে মেলা।
বেলা বাড়ে, শিশির শুকায়,
মাকড়সা-জাল ছিঁড়ে হয় খান খান,
ফুলের ফুরায় পালা।
তৃণবেদিকায় ক্ষণিকের আলপনা,
তারি পর দিয়ে লক্ষ্মীর পা দুখানি
চলে গেল হেরিলান।

খেলা

বৃষ্টির জল ছলো ছলো
শিউলি গাছের পাতায় পাতায়,
টগর গাছে ভিজে ফুলের দল
পূব হাওয়াতে ঘরছাড়া হয় বুঝি।
আজ আমারো বাদল-লাগা মন
আকাশ থেকে পেয়েচে কার দোলা।

মোতিয়া

যে গেছে তাহারই শূন্য পথের পানে
প্রজাপতি, তোর ডানা তোরে নিয়ে চলে।
মোতিয়া কাটালো সারা রাত পথ চেয়ে,
গেল যবে চ'লে
এলি সন্ধানে তারি।

কে

লাল ঠোঁট!
ভাসা ভাসা চোখ!
কালো এলোচুল বাতাসে দুলিয়ে
সকাল বেলায়
চলে গেল ঐ পথের বাঁকে।

শেষের খেয়া

দূর থেকে আবছা আলোয় হাত ছানি দেয়
অস্তাচলের তারা,
শেষের খেয়ার পাল তোলে মোর
পরপারের বায়ু।
তবু আমার মন্থর মনখানি
পিছিয়ে পড়ে রইলো তোমার ঘাটে।

নতুন খেলা

ভাঙাগুলি—নোস্তা—হাড়ুডু,
সব খেলাই তো হচ্ছে পুরোনো।
নতুন খেলা চাই আমাদের
বলছে খেলার দল।
তাই পুরোনো খেলাগুলোর সাজের বদল কোরে
ডাকে নতুন নতুন নামে খেলার দর্শার।

প্রজাপতি

কোন কাজ নেই, নানা-রঙা সাজ প'রে
হোথা হেথা ফেরে কিসের প্রত্যাশা নিয়ে.
আলোয় ছড়ায় ডানা।
চরণে জড়িত চূর্ণ পরাগ,
মধু কণা তার মুখে—
অকারণে বেলা হেলায় কাটায়
মোর মন-প্রজাপতি।

এক পশলা

কেমন কোরে জানবো বলো
মোর আঙিনার কাঙাল টগর গাছ
শুধু কেবল এক পশলা বৃষ্টি জলের তরে
এম্‌নি তরো ছিলো উদাস হয়ে,
যেম্‌নি পেল ঐ টুকু দান পথিক মেঘের হাতে
অমনি যে তার ডালে ডালে ফুলের মাতন লাগে।

জল-বুলা

কচুর পাতায় বুলো ছিলগো
সকালবেলায় আলোয় ঝলমল্;
যেমনি তারে দিলেম নাড়া
ভূষণটি তার হারান সে,
আমি পেলেম ফাঁকি।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্ষিকী

ছবি

মাথার কাছে ঐ যে দেখি
মেঘ, না ওকি চুল,
হাত পা ওকি লতার বাঁকা ডাল,
যায় না বোঝা নারী কিম্বা পরী।
তারো চেয়ে সত্য ওযে
মন আমারে বলে,
ঐ তো ছবির মায়া।

ছবি

আমার মুখের ছবিটি কিনিল
সোনার মোহর দিয়ে ;
মনটি আমার বিনা দামে কেন
কিনিল রাজার ছেলে ?

হরিণী

ফল-জল-পাতা পড়ে থাকে পাশে
আঁখি দুটি তুলে কোন দূরে যেন চায়—
বনের দুলালী ওযে।
ওগো সৌখীন সহরের বিলাসিনী,
ওর মুকঠোর চিরজীবনের দুখে
যেটুকু তোমার সুখ,
যদি তা হারাও পর নিমেষেই
রবে না তাহার স্মৃতি।

ঝড়ের পরে

আজ সন্ধ্যায়
ঝড়ে উড়ে পড়ে জানালায় বারবার
মোর আঙিনার মধুমল্লিকা শাখা।
নিজন রাতের বেলা,
আমার শূন্য বুকে
বারবার কোরে উড়ে উড়ে পড়ে
কার সে মুখের স্মৃতি।

শ্রাবণ পূর্ণিমা

আকাশ ভ'রে জমে আছে
শ্রাবণ মাসের কাজল-কালো জল :
সেই জলেতেই বারেক ডুবে,
বারেক ভেসে উঠে
কোন রূপসী পঞ্চদশী
সাঁতার কাটে আজ।

ভালুক নাচ

তোরঙ্গ তোল মাথার উপরে,
এবার তোমার শ্বশুরবাড়ীতে যাও।
দেখাও তো লাল, শাশুড়ীকে তুমি প্রণাম কোরেছ কেমন করে।
বৌটি তোমার প্রথম তোমাকে দেখেছিল যেই দিন
কতখানি ঘিব বার কোরেছিল দেখাও দেখি।
—না না, হলো নাতো,
পাজী বেহাদব! দেখা, ভালো করে দেখা।
নাকের ঘড়িতে টান পড়ে যেই—
দারুণ যন্ত্রণায়
ভালুকের জিভ্ খুলে পড়ে মুখ থেকে।
দর্শকদল তাই দেখে দেখে হাততালি দিয়ে হাসে।

ভালোবাসা

বধূ বলে এসে সখিরে তাহার,
"ওকি যাদু জানে সই,
কী মন্ত্রে ওরে কেড়ে নিল প্রাণধন।"
বর বলে তার বন্ধুরে ডেকে,
"বুঝি ও বাসেনা ভালো,
ভালো কোরে কথা বলে না আমার সাথে।"

আনমনা

"আনমনে কোন ভাবনা তোমার
বকুল বনের নির্জনে?"
ভাবনার তার সরনা যে আর
তাই এসেচি—
ঝরিয়ে দেবো ঝড়ে-পড়া বকুল ফুলের মতো।

নিশিকান্ত ও কাব্যে নবধারা

সমীরকান্ত গুপ্ত

ভোরবেলাকার পাখির যে-গান একটুকু যায় শোনা
সেই সুরেতেই এই নিখিলের উদয়স্বপ্ন বোনা ;
(ভোরের পাখি)

এই একটা সরল সজীবতা মুক্তির উদার মাঠ থেকে নূতনত্বের হাওয়া নিয়ে এল। স্বপ্নের ভাবনগ্নতায় নিশিকান্ত তারপর কি রকম গাঢ় ভাষায় প্রাণোদ্বেল হয়ে উঠেছেন—

কেঁপে কেঁপে ওঠে নিশীথ-নিচোল, বুকের কাঁচুলি কাঁপে—
রাতের রাধিকা আকাশে চাহিয়া চলে কার অভিসারে,
(ভোরের পাখি)

এই হল জগতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়—প্রাণের সূত্র ধরে নর্ত্যকে আলিঙ্গন। তবে তার ভিতরেও যাত্রার প্রারম্ভেও, একটা উন্মুখ চেতনা নিয়ে এসেছেন। তাতে মর আধারের মধ্যে অমরত্বের সুর শোনাতে পেরেছেন। এই অনর্ত্য-অভিসার এই গহনচারিতা কবির দৃষ্টির সম্মুখে খুলে দিয়েছে আর এক জগৎ—সূক্ষ্মলোক (Occult world)। সেই জগতে এই জগতের বস্তু অন্য অর্থ বহন করে প্রায় রূপান্তরিত মূর্তি লাভ করে। এই কাব্যে (Occult) দুই জগতের ব্যঞ্জনার, দুই ভাবরূপের এক আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে তাই তার অর্থগ্রহণও দুরূহ। শুনুন তবে—

বহ্নিকলি বিকশি' ওঠে পলে বিপলে,
সূর্যশশি পড়িছে খসি' বিকাশে তার,
জ্যোতির্লোকে তাহারে চাহি' প্রদীপ জ্বলে
লক্ষ নক্ষত্র চালে দীপন-সার। (দিগন্ত)

অথবা,

পুচ্ছে ধ্বংস ধূমকেতু দোলে, কেশরে গরল ফণী,
নয়ন তারায় ঠিকরিয়া যায় অমঙ্গলের মণি (দিগন্ত)

প্রচ্ছন্নলোক অতীন্দ্রিয় দর্শন নিশিকান্তে সহজেই স্থান পায়। সেই সুরটি উচ্চকিত হলেও কবির বাণীবহন একমাত্র একতারা বলা চলে না, তাকে বরং বহুতন্ত্রী বীণার সঙ্গে উপমিত করা যায়। তিনিই যখন মিষ্টিকের দুয়ারে গিয়ে হানা দিয়েছেন তখন তা কেমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—

অরুণবর্ণ কমলের তরী
মরাল তাহারে বাহে সন্তরি'
ময়ূর তাহার শিখরে বসিয়া
মেলেছে পাখার পাল ;
নেচে নেচে ওঠে আলোর তটিনী বাজে তরঙ্গ তাল। (দিগন্ত)

মিষ্টিকের ধর্মই এই রকম। সাদা অর্থে সাধারণভাবে কথাটা বলতে হেঁয়ালি বোঝায়। ইংরাজী Parables এর অর্থ সহজবোধ্য—সেই রূপকের সাদামাটা রূপটা আমাদের যাত্রার নটনটীদের মতো, মঞ্চে এবং মঞ্চের বাহিরে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা নেই। The Facrie Queeneএই জন্যই সরল। কাব্য যেখানে প্রতীকী হয়ে উঠেছে সেখানে মূল অর্থকে গোপন করে আর এক অর্থের ইঙ্গিতকে উজ্জ্বলতর পরিস্ফুট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতীকের রহস্যটি সূত্রটি ধরতে পারলেই বাণীর মর্মোদ্ধার করা যায়। বৈদিক কাব্যের অনেকাংশ প্রতীক-নির্ভর। মিষ্টিক কবিও রূপক প্রতীক প্রতিমার সাহায্য নেন কিন্তু তাঁর কবিচেতনায় এবং কবি-দৃষ্টিতে ভাবের প্রতিমূর্তি ও চিত্রাপিতের রূপ অচ্ছেদ্য প্রতিভাত, তারা শুধু মিলেমিশেই যায়নি—অনুভূতির এক অপরূপ রসায়নে অভিনাদ্র দোসর হয়ে উঠেছে। Occultist যদি হন দৃষ্টি বা দর্শনভিত্তিক—অকালেই অদৃশ্যের দুয়ার অকস্মাৎ উন্মোচিত—মিষ্টিক অন্তর্লোকের অতলান্ত হতে উৎসারিত—

পাষাণের বৃষনুও অধিষ্ঠিত শ্মশানের 'পরে
নির্জন প্রান্তরে।...
পাষাণের বৃষনুও এক চক্ষু মেলিয়া সদাই,
দুই চক্ষু নাই। (দিগন্ত)

কিম্বা,

পৃথিবীর বুকে প্রোথিত দণ্ড 'পরে
একি অদ্ভুত দোলা দোদুল্যমান।
(ঐ)

অথবা এই আরো একটুখানি,

আমি জানি, আমার মৃণাল
শ্বাসভ-সলাটবর্ণ বারিবিরঞ্জিত সরোবরে
কপিশ কুম্ভীর সম কর্দমের কুটিল-করাল
জড়িবার জিহ্বালীন ; তবু জানি, আমার মূর্ধায়
পদ্ম যদি জাগিয়াছে, একদিন মোর চরণের
উৎপল উঠিবে ফুটি...
(ঐ)

অভিন্ন পথের যাত্রী আর এক কবির কণ্ঠে এই সুরই কেমন ফুটে উঠেছে—

ওই যে কালের অন্তিম ভালে প্রতিবিম্বিত রাকা,
ওই যে বিশাল রাজকঙ্কাল নিশার কেশরে ঢাকা,
ওই যে নিখিল পাপের কামনা,
ভাসায় জীবন ভাসায়ে আপনা,
আঁধার-অন্তরতলে মর্মের বাঁশি ডাকা,
শিখরে দীপ্তশিখার শিখীর পুচ্ছ আঁকা।
('নীরাজনা'—সাহানাদেবী)

কবির এই দৃষ্টি ও অনুভূতির অন্তরালে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ ও বহন করছে কবি-চেতনা। এই চেতনার পর্দা বা উচ্চতাই মান ও মূল্য নির্দেশ করে কাব্যসৃষ্টির। শুধু দক্ষতা, একমাত্র কারুকার্যের গুণপনা, উপাদান ও উপকরণের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য এনে দিতে পারে সাফল্য—একটা শ্রুতিমধুর বা নয়নমনোহর রূপাকার, কিন্তু মহত্তম যে-সৃষ্টি ইন্দ্রিয়োত্তর লোকে গভীরে আনে বৃহতের ভূমার দোলা, নিবিড় স্পন্দন, ধ্বনির সূক্ষ্ম অনুরণন তার মূলে এই লোকাতীত চেতনা—এটিতে আশ্রয় নির্ভর করেই বিশ্বলীলার তরঙ্গ জেগে ওঠে, বিশ্বব্যাপী সংগীতের ভঙ্গিটি প্রবর্তিত হয়—হঠাৎ আধারের মধ্যে পাই আলোকের স্পর্শ, অন্তরাত্মার তৃপ্তি, অন্তরে এক অপার্থিবের উন্মেষ ও অলৌকিক সৌন্দর্যের বোধন—যেমন হোমরে,

Bē de kāt oulumpois kerēnōn chōomenos kēr
(অলিম্পাস-শিখর থেকে ক্রোধের আবেগে সে নেমে চলল)

ভার্জিলে,

Sunt lacrime rerum et mentem mortalia tangunt.
(মর্তজিনিসে লেগে রয়েছে অশ্রুর প্রলেপ)

শেক্সপীয়রে,

In the dark backward abysm of time

মিলটনে,

Those thoughts that wander through eternity.

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে,

The winds come to me from the fields of sleep.

কিম্বা এই আধুনিকে,

A world of power hushed into symbols of hue,
silent unendingly,
Over its head, like a gold ball the sun tossed
by the gods in their play
Follows its curve,—a blazing eye of Time
watching the motionless day.

অথবা অতি-পরিচিত রবীন্দ্রনাথে,

সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরান্তরে।

আর অন্যত্র,

ছন্দে ছন্দে নাচি ওঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—

পাশ্চাত্য রসবিশ্লেষক সমালোচক এরই মূল ব্যাপারে আসল চেতনার সত্যটিকে ধরতে চেয়েছেন 'গ্র্যাণ্ড টাইল' অভিধার মধ্যে। কিন্তু টাইল বা রীতিরও মর্মস্থলে কবিচিত্তের বা কবিচেতনার এই রহস্যটি সক্রিয়।

মানসোত্তর চেতনার বা অতিমানস কাব্যের যে দৃষ্টান্ত দেখলাম তার সঙ্গে ও পাশাপাশি চলেছে আর এক ধারা। য়ুরোপের মেটাফিজিক্যাল কাব্য (John Donne যার পুরোধা) যেমন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিল এখন তা নয়, তবে অন্তরনুখী হবার ধারা—আকূতি ও অভীপ্সার ধারা—যার সুর ইংরাজী দিয়েই ধরতে আরম্ভ করি.

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

ব্যাখ্যাতারা এর নাম দিয়েছেন psychic poetry, অন্তরাত্মার কাব্য। বাংলার ভক্তিমূলক কাব্যে এর প্রবাহ লক্ষণীয়। তবে এই কাব্যধারার মধ্যেও ভাবের একটা বিবর্তন চলেছে। যা ছিল একদা আবেগাপ্লুত তা এখন উত্তরাত্মের আলোক-স্পর্শে হয়ে উঠল স্বচ্ছ—শেলীর প্রায় অশরীরী বিহঙ্গের মতোই হাল্কা। তারই পরিস্ফুট রূপ এখানে—

বহিব তোমারে অন্তরতম দেশে
নিভৃত সুরের রজতের স্রোতে ভেসে
নিরালা-নিহার-শিহরিত সরণিতে
ছায়ালেশহীন আবেশের সঙ্গীতে

এ কবিতা ছড়িয়ে দেয় আলো ঝরিয়ে যায় মাধুর্য—এই আলো মাধুর্যই তো অন্তরাত্মার দীপ্তিস্বরূপ। একেই প্রসঙ্গান্তরে ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছিলেন—'sweetness and light', সুকুমার প্রতিভার বা সংস্কৃতির মর্মস্থলে নির্যাস হয়ে থাকে।

এই ধারাটি ধরে পৌঁছে যাই আর এক কাব্যে যার ভাষা স্পষ্ট ঋজু, প্রায় অনাবৃত সত্যের মতোই—এত অনায়াসকৃত যে সহজেই যেন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,

অনেজদেকম্ মনসো জবীয়ো নৈনৎ দেবাপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ...

কিম্বা ঋগ্বেদের সেই যাদুকরী ভঙ্গিতে—

তমো আসীৎ তমসা গূঢ়ম্

যার প্রতিধ্বনি ভেসে এসেছিল রামায়ণে—

বনং তদ্বং প্রতিভয়ং ঝিল্লিকাগণনিনাদিতম্

অথবা কালিদাসের সূচীভেদ্য অন্ধকারের যাদুময় ভাববিগ্রহে।

আধুনিক ঋষিকবির কণ্ঠে শুনুন এই নূতন সুর—

Still like a statue on its pedestal,
Lone in the silence and to vastness bared,
Against midnight's dumb abysses piled in front
A columned shaft of fire and light she rose.

এই ধারার অনুসরণে কবি নিশিকান্ত বলতে পেরেছেন—

এই দুরাশা ধূলার পরে
দুলায় তারা

কিম্বা আরো বিস্ময়করভাবে—

তারি বক্ষ আলোড়িয়া তরল তুলিয়া
গোপন শুক্তির মর্ম খুলিয়া খুলিয়া
আনিয়া সৃষ্টির মুক্তা গেলাভরে ডুবায়, উঠায়,
সূর্যরে চরণে চাপে, চন্দ্র কাঁপে হাতের মুঠায়
ঘনে উল্কা জানু-জড়ুয়া ঘিরে।

কবি-চেতনা এখানে অধ্যাত্মের আলোয় উদ্ভাসিত। বাণী আর ছন্দ এক অতিনুভূতায় মিশে গিয়েছে। প্রাচীনেরা তো এরই নাম দিয়েছেন মন্ত্র—তার মধ্যে সিদ্ধির বীজ নিহিত—মন্ত্র উচ্চারণে অভীষ্ট সত্য জাগ্রত হয়ে ওঠে, রূপে রূপে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। অতি আধুনিক পর্যন্ত দিগন্ত পর্যটন করে একটা যুগ অতিক্রমের পরে এই নবসিদ্ধিতে ফিরে আসতে পারেন—

পৃথিবীর ধূলিকণা
সে অদৃশ্য অধরের
দৈব-মন্ত্রবলে
হয়ে যায় সূর্য-বিন্দু;
চাঁদের হরিণ খেলে পৃথিবীর শান্ত তপোবনে
ক্ষুরে ক্ষুরে ওড়ে সূর্যকণা
প্রভাতের উজ্জ্বল আশ্বাসে। (রণজিৎ সরকার)

কিম্বা,

সে তখন ধীরে ধীরে অত্যন্তের নির্মোক খসায়
ছলনার আবরণে যে-রূপ গোপন অন্তরালে
হঠাৎ তখন তার কঠিন বন্ধন ঘুচে যায়
নিদ্রামগ্ন নিশীথিনী যেন জাগে আশ্চর্য সকালে। (সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত)

এখানে রয়েছে পরিপূর্ণ ভাষণ, সর্ববাহুল্যবর্জিত অথচ অব্যর্থ প্রয়োগ, মন্ত্রেরই সগোত্র বাণী—

The wide sable expanse of infinite skies
From north to south is unfurled by giant hands;
And a new moon is cradled in swaddling bands
Somewhere beyond; and the winds hush in surprise.
(Arjava)

মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি ধরে ভবিষ্যতের কাব্য উত্তীর্ণ হতে চলেছে একটা বৃহত্তর সিদ্ধিতে—বর্তমানের সাফল্য সেদিকে নিঃসংশয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

কবিদা'র জীবনের কিয়দংশ

স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়

আমার মা-বাবা মারা যান যখন আমি খুবই শিশু। আমি আমার দাদার হাতেই মানুষ হয়েছি। আমার যখন ১৪ কি ১৫ বছর বয়স তখন আমি কালাজ্বরে আক্রান্ত হই। আমার দাদা বীরভূম জেলায় নাম করা ধনী লোক ছিলেন। তিনি সেখানকার সবচেয়ে বড় এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু দিনের পর দিন রোগ আরও গুরুতর হয়ে উঠল; ক্রমে আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হলাম। জানিস তো সুকুমার রায় কালাজ্বরেই মারা যান। এই রকম অবস্থায় একদিন স্বপ্নে আমার বাবা এসে আমাকে বলেন, "ওরে তুই তোর দাদাকে বলগে এ্যালোপ্যাথি করলে তোর মৃত্যু নিশ্চিত। কাল থেকেই যেন তোকে হোমিওপ্যাথির এই ওষুধটা খাওয়ায়।" বাবা আমাকে ওষুধটার নাম পর্যন্ত বলে যান। পরদিন সকালে দাদাকে সব বৃত্তান্ত বললাম। শুনে তো দাদা কিছু বিশ্বাসই করলেন না। ইতিমধ্যে দাদার এক বন্ধু লক্ষ্ণৌ থেকে দাদাকে চিঠিতে জানায় সেও এক স্বপ্ন দেখেছে—বাবা তাকে এসে বলে গেছেন যে আমাকে যেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান হয়। তখন দাদা বিশ্বাস না করে পারলেন না। হোমিওপ্যাথির সেই বিশেষ ওষুধটার গুণে শীঘ্রই রোগের উপশম হল। ঘর অনেক কমে এলো কিন্তু কিছুতেই ৯৯ ডিগ্রীর নীচে এল না। আমি উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে বিছানায় দিনের পর দিন শুয়ে থাকতাম। জানিস তো ছোটবেলা থেকে আমি খেতে খুবই ভালবাসতাম, খেতেও পারতাম খুব। রান্না করাও আমার ছোটবেলা থেকেই শখ। আমার ঘরের পিছনেই দাদা একটি poultry করেছিলেন। রোজ আমাকে একটু করে chicken soup দেওয়া হত। একদিন সন্ধ্যেবেলায় যখন দাদারা কেউ বাড়ীতে ছিলেন না, আমার বেশ ঘুত করে খাওয়ার খুবই লোভ হল। বিছানা থেকে উঠে একটু হাঁটতে চেষ্টা করলাম, দেখলাম আস্তে আস্তে কষ্ট করে হাঁটতে পারছি। ব্যস সোজা চলে গেলাম poultry-তে এবং পাঁচটা ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। তারপর ভাঁড়ার ঘর থেকে অন্য সব দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে পোলাও এবং পাঁচটা ডিমের তরকারী করে অনায়াসে উদরস্থ করলাম। বললে বিশ্বাস করবি না যে পরের দিন কোন রকম শরীর খারাপ তো হলই না বরং শরীর অনেক তাজা বোধ হতে লাগল। এইরকম করে রোজ রোজ সন্ধ্যেবেলায় এই আহার চালাতে লাগলাম—খাওয়া শেষ করেই অবশ্য ভালছেলের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়তাম, দাদা কিছুই জানতে পারতেন না।

একদিন শুয়ে শুয়ে শুনছি আমার দাদা ও দিদিমা আমার বিয়ের আলোচনা করছেন। যে মেয়েটার সঙ্গে দিদিমা আমার বিয়ে দেবার সাব্যস্ত করেছেন সে মেয়েটাকে আমি একদিন দেখেছিলাম—গাছে বসে পাকা আম চুষছে আর সারা মুখ আর গা দিয়ে আমের রস ঝরছে। এদের আলোচনা শুনে তখনই আমি মনে মনে স্থির করলাম যে এই আম-চোষা মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। আমি বাল্যকালেই রামকৃষ্ণ কথামৃত ও আরও অনেক

সাধু-সন্ন্যাসীর বই পড়েছিলাম—খুবই ভাল লাগত। তখনই আমি সংকল্প করেছিলাম যে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। এই পরিস্থিতিতে পড়ে আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে গেল। সেই রাত্রেই আমি একটা পুঁটলিতে কিছু জামাকাপড় ও সন্ন্যাসীদের মত একটা লাঠি নিয়ে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁ। একটা জিনিস তোকে বলতে ভুলে গেছি : আমি স্কুলে-টুলে বেশী যেতাম না—গাছের উপর বসে কবিতা লিখতাম। সেই ১৪।১৫ বছর বয়েসেই তিনটি খাতা কবিতা লিখেছিলাম। এই তিনটি খাতাও আমার সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলাম। মনে রাখবি তখনও আমার গায়ে একটু জ্বর ছিল। একটু শীত-শীত করছিল বলে গায়ে বেশ একটা মোটা কম্বল জড়িয়ে ঘন অন্ধকারে পথ অতিক্রম করতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে পুঁটুলি নিয়ে কি করে সন্ন্যাস গ্রহণ করব? তখনই আবার বাড়ী ফিরে এলাম ও পুঁটুলিটা ঘরে রেখে দিলাম, কম্বলের বদলে একটা সাধারণ চাদর গায়ে দিলাম। তিনটি কবিতার খাতার উপর খুবই মায়া লাগল, কিন্তু সেটাও আসক্তি বিবেচনা করে আমার প্রাণের ঐশ্বর্য তিনটি খাতা কুয়ার জলে বিসর্জন দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার সন্ন্যাস জীবন আরম্ভ হল।

সন্ন্যাসীদের জীবনীতে পড়েছি যে তাঁহাদের আহারাদি ভগবানই জুটিয়ে দেন। এই জিনিসটি আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখলাম। যেমন ধর, প্রথম দিনই যখন সারারাত হেঁটে ভোরবেলায় নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম, তখন এক দোকানদার তার দোকান খুলেই আমাকে দেখতে পেয়ে খুবই খুশী হয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করল। যখন শুনলো যে আমি একজন সন্ন্যাসী তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলল "বাবা, আমি যখন আজ দোকান খুলেই তোমার মত এক নবীন সন্ন্যাসীর মুখ-দর্শন করেছি তখন আজ তোমাকে আমার এখানে তৃপ্তি ভরে খেতে হবে।"

আমার তো তখন পেট খিদের চোঁ চোঁ করছে; মনে মনে তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলে বসে পড়লাম। প্রচুর পরিমাণে রসগোল্লা পান্তুয়া ইত্যাদি খেলাম। আবার দ্রুত-বেগে পথ হাঁটতে শুরু করলাম—পাছে দাদা আমার সন্ধান পেয়ে যান, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে দাদা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছেন।

আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে কোন এক সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই সিদ্ধ পুরুষের দর্শনের জন্য আমি অনেক নদী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে ঘুরেছি। আমার মনে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প ও আস্পৃহা না থাকলে কিছুতেই এই কষ্ট সহ্য করতে পারতাম না। কয়েকমাস এই রকম করে ঘোরার পর শেষে কাটোয়ার কাছে লোকালয়ের কিছু বাইরে এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। প্রথমে তো শিষ্য-সামন্তরা আমার মত এক ছোকরাকে সাধুবাবার সঙ্গে দেখাই করতে দেবে না। যখন তাদের সঙ্গে আমার বেশ গোলযোগ বেধে গেল, তখন সাধুবাবা নিজেই বের হয়ে আমাকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। সাধুবাবার চেহারা আমার খুবই সুন্দর লাগলো, সত্য সত্যই মনে হল যেন এক সিদ্ধ পুরুষ। সাধুবাবারও আমাকে খুবই পছন্দ হল। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "আরে তুই জ্বর নিয়েই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিস?" আমি তো শুনে অবাক; সাধুবাবা আমাকে দেখেই

সব বুঝে গেলেন। তখন আমি আমার কালাজ্বরের সকল বৃত্তান্ত বললাম। শেষে বললাম যে আমার একটু জ্বর সব সময়েই থাকে, কিছুতেই নামে না। তিনি বললেন "তোর কোন চিন্তা নেই। তোর যতদিন ইচ্ছা আমার কাছে থাক, আমার যখন ইচ্ছা হবে চলে যাস। তোর এই জ্বরটুকু আমি কিছুদিনেই সারিয়ে দেব। কিন্তু তুই একটা জিনিস জানিস : তোর শরীরের ওপর দিয়ে সারা জীবন দারুণ ভোগান্তি আছে।" সাধুবাবা রোজ আমাকে কি সব পাতা ও শিকড়ের রস খেতে দিতেন। এতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার সেই জ্বর একেবারে সেরে গেল।

সাধুবাবা আমাকে খুবই ভালবাসতেন ও তাঁর নিজের অনেক কাজ আমাকে দিয়েই করিয়ে নিতেন। এই আশ্রমে থাকতে থাকতে আমার ক্রমশ সাধুবাবার উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মাল। একদিন আমি তাঁকে গিয়ে বললাম যে আমি আপনার শিষ্য হব, আপনি আমায় দীক্ষা দিন। সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ জোর গলায় বললেন, "না তোকে আমি দীক্ষা কিছুতেই দেব না। জানিস তোর পিছনে আমি কাকে দেখতে পাচ্ছি? তোর পিছনে আমি দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ। তোর পিছনে আমি জাগ্রতভাবে দেখতে পাচ্ছি মহেশ্বর ও মহেশ্বরী—এঁরাই তোর জীবনের গন্তব্য স্থান। আমি তোকে দীক্ষা দিচ্ছিনা।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে কারা এই মহেশ্বর ও মহেশ্বরী? তিনি কিন্তু এই সম্বন্ধে আর কিছুই বললেন না।

একদিন সাধুবাবা ভোরবেলায় এসে বললেন, "আজ রাত্রে আমাদের এক বিরাট উৎসব আছে। তুই সহরে গিয়ে এই এই সব জিনিস নিয়ে আয়।" খাবারের ফর্দ দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! প্রায় ৩০০ লোকের খাবার! জিলিপি, রসগোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার অবশ্য আনন্দও খুব হল। কিন্তু টাকা কই? সাধুবাবা বললেন, "তুই গিয়ে আমার নাম করলেই হবে।" হলও তাই! যখনই দোকানদাররা জানলো যে সাধুবাবা চেয়েছেন তখনই তারা অন্য সব কাজ ফেলে সাধুবাবার জন্য নিজেদেরই লোক দিয়ে সব খাবার আশ্রমে পাঠিয়ে দিল। আমাকেও প্রচুর খাওয়াল। সন্ধ্যাবেলা থেকে সাধুবাবার আশ্রমে অনেক শিষ্য জড় হতে লাগল। ক্রমে প্রায় তিনশ শিষ্য সমবেত হল। অনেক রাত পর্যন্ত নাচ ও কীর্ত্তন চলল। কীর্ত্তনের সময় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলাম। কীর্ত্তন শুনতে শুনতে সাধুবাবা যেন অন্য এক জগতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন—যেন সমাধিস্থ। তাঁর চোখে পলক পড়ে না, তিনি ভাবরসে মগ্ন। যতক্ষণ ধরে কীর্ত্তন চলতে লাগল ততক্ষণ ধরে তাঁর স্থির চক্ষু দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে লাগল। এই অশ্রুর ধারা তাঁর সারা শরীর ও বস্ত্র পরিপূর্ণভাবে সিক্ত হয়ে গেল। মনুষ্য-চক্ষু দিয়ে যে এত পরিমাণে অশ্রু ঝরতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। উৎসব যখন শেষ হল তখন গভীর রাত—একটা কি দুটো। আমি সাধুবাবাকে গিয়ে বললাম এখনও পঞ্চাশজনের মত খাবার আছে, কালকের জন্য রেখে দিলে হয় না? সাধুবাবা বললেন, "তুই জানিস না, আমাদের বৈষ্ণবদের কিছুই বাসি রাখতে নেই? আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। ঠিক পঞ্চাশটা কলাপাতা নিয়ে, ওই রাস্তার দুধারে পঁচিশটা পঁচিশটা করে বিছিয়ে দিয়ে খাবারটা ভাগ করে রেখে আয়। একটুও যেন বাকি না থাকে বুঝলি?" পরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ্ঞামত কাজ করলাম।

আমি কিন্তু কৌতূহলবশত: খাবারের কিছুদূরে গিয়ে একটা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম যে কি হয়। দশ-পনের মিনিট অপেক্ষার পরই দেখলাম ঠিক পঞ্চাশটা শিয়াল এসে এক একজন এক একটি পাতার খাবার আত্মসাৎ করে চলে গেল।

রোজ ভোরবেলায় আমি সাধুবাবার জন্য ফুল পাড়তাম। একদিন আমি ফুল পাড়তে পাড়তে হঠাৎ দেখি বাগানের দরজার কাছে দুইজন দিব্যপুরুষ। তাদের বৈষ্ণব বেশ ও সারা শরীর দিয়ে যেন জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। আমি তো খানিকক্ষণ হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ও তারপরই ছুটে গিয়ে সাধুবাবাকে ডেকে আনলাম—"দেখুন আপনার কাছে দুইজন অত্যন্ত সুপুরুষ অতিথি এসেছেন।" সাধুবাবাকে ডেকে এনে দেখি বাগানে কেউই নেই। আমি জোর গলায় বললাম যে আমি নিশ্চিত তাঁদের এইখানেই দেখেছি। তখন সাধুবাবা আমায় জড়িয়ে ধরে আমার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলেন। পরে তিনি গদ্গদ কণ্ঠে বললেন, "ওরে তুই জানিস কাকে দেখেছিস? তুই শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও নিতাই-কে দেখেছিস।" আমি যখন প্রথম পণ্ডিচেরী আসি, জানিস তো শ্রীমাও আমাকে দেখে বলেছিলেন, "He has got the eyes of a visionary." এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর দুইজন স্বদেশী সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সাধুবাবা তো প্রথমে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেলেন। বললেন "এখনকার রাজনীতি বিষাক্ত পরিপূর্ণ—আমি কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারব না।" সেই সময় গান্ধীজীর non-cooperation movement প্রবল বেগে চলেছে। সাধুবাবা যখন শুনলেন যে এই দুইজনের মধ্যে একজন তাঁর পরম ভক্ত, তখন তাঁদের আসতে অনুমতি দিলেন। তাঁরা দুইজন এসে এটা ওটা জিজ্ঞাসা করার পরে জিজ্ঞাসা করলেন "এখন যে আমরা সারা দেশে গান্ধীজীর এত প্রভাব দেখতে পাচ্ছি, আপনার তাঁর সম্বন্ধে কি অভিমত?" সাধুবাবা যেন খানিকক্ষণ অন্তর্মুখী হলেন; অতঃপর ধীরে, স্পষ্ট গলায় জোর দিয়ে বললেন "গান্ধীজীকে নিয়ে যে দেশ এমন মেতে উঠেছে, তাঁর যে এখন এত প্রভাব তা সবই অত্যন্ত সাময়িক, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তিনি আর যাই হোন, মোটেই যথার্থপুরুষ নন।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে তিনি বললেন, "একটা জিনিস তোমরা মনে রেখো—ভারতের স্বাধীনতা আনবার শক্তি যদি কারো থাকে তো সে হল মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষ।" যখন ভদ্রলোক দুইজন চলে গেলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে এই অরবিন্দ ঘোষই কি সেই মহেশ্বর যাঁকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমার পিছনে মূর্ত দেখেছিলেন? তিনি বললেন "দেখ, তুই আগেও জানতে চেয়েছিলি কে এই মহেশ্বর—তখন আমি তোকে বলিনি। আমরা সাধুরা ভূত-ভবিষ্যতের অনেক কিছুই জানতে পারি কিন্তু তা আমাদের অন্যদের বলা নিয়ম নেই এবং সেই জন্যই আগে তোকে বলিনি। কিন্তু আজ যে তোকে আমি তোর মহেশ্বরকে চিনিয়ে দিলাম তারও একটা কারণ আছে। তোর জীবনে এমন এক সংকটজনক সময় আসবে যখন এক ধাঁধায় পড়বি—জীবনে কোন পথ বেছে নিতে হবে বুঝতে পারবি না। আমি এখন তোকে যা বললাম তা তুই কিছু দিন পরেই ভুলে যাবি কিন্তু সেই বিপদের সময় তোর আমার এই কথা মনে পড়ে যাবে—মনে পড়ে যাবে যে আমি তোকে বলেছিলাম যে অরবিন্দই তোর জীবনের গন্তব্যস্থান এবং তুই ঠিক পথ বেছে নিবি। তোকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবার

জন্যই তোর সামনেই আমি অরবিন্দের নাম করলাম।" একদিন একদল সন্ন্যাসী এসে সাধুবাবাকে বললেন, "আমরা হিমালয়ে যাব, আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন? সাধুবাবা সম্মত হলেন। আমি সাধুবাবাকে বললাম আমিও যাব।

তিনি বললেন, "তুই গাঁজা খাস না, মদ খাস না, তুই ওখানকার শীত সহ্যই করতে পারবি না। তুই এইখানেই যতদিন ভাল লাগে থাক, তারপর যখন ইচ্ছা হবে চলে যাস।" এর কিছু দিন পরেই সাধুবাবা হিমালয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আমার আশ্রম-জীবনের দুএকটি ঘটনা বলে আজ শেষ করি। আমি যখন প্রথম আশ্রমে আসি, মা-শ্রীঅরবিন্দ একরকম জোর করেই বললেন যে এ জীবন আমার জন্য নয়, আমার শান্তিনিকেতনেই ফিরে যাওয়া উচিত, সেখানে আমি খুবই প্রসিদ্ধ কবি হতে পারব। একটা জিনিস মনে রাখিস যে আমি এত কবিতা লিখেছি কিন্তু কোনদিনই আমার মধ্যে এ ভাব ছিল না যে খুব বড় কবি হব, দেশে দেশে আমার নাম ছড়িয়ে যাবে ইত্যাদি। আমার প্রেরণা এসেছে ও আমি লিখে গেছি, লেখার পিছনে আমার খ্যাতিলাভের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মা-শ্রীঅরবিন্দ আরও বললেন যে এখানে থাকলে আমার শরীরের উপর দিয়ে ভীষণ suffering যাবে। আমি কিন্তু তাতে দমে যাইনি—অনেক কষ্ট সহ্য করে এখানেই থাকতে লাগলাম। অগত্যা একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে তাঁরা আশ্রমে থাকবার অনুমতি দিলেন। আর এ suffering তো সবার জীবনেই আছে—এই যে ডাক্তাররা এত রোগের চিকিৎসা করছে আবার নিজেরাই সেই রোগেই আক্রান্ত হচ্ছে, যে heart-specialist সে হয়ত heart attack এই মারা যাচ্ছে—suffering-কে ভয় পেলে তো চলবে না। আমি অবশ্য এখন মাকে প্রার্থনা করছি, "মা, শ্রীঅরবিন্দের Centenary তো দেখলাম এইবার তুমি আমায় টেনে নাও; তোমার Centenary আমি ওই আশ্রমের Service গাছে উঠেই দেখব।" বুলা কিন্তু ঠিক তাক করে আমায় গুলতি দিয়ে মারবে কিন্তু আমিও প্রস্তুত থাকব। মাকে যখন এমন প্রার্থনা করছি তখন মা আমাকে কি দেখালেন জানিস? দেখালেন যে শ্রীঅরবিন্দেরও অসুখের সময় তাঁর পা দুটি আমারই মত ফুলেছিল কিন্তু তিনি তো নিঃশব্দে সহ্য করেছিলেন আর আমি এইটুকুতেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?

যাই হোক আশ্রমে থাকার অনুমতি পাওয়ার পর দুএক বছরেই মর্মে মর্মে বুঝলাম যে মা শ্রীঅরবিন্দের কথা কতদূর সত্যি। এই প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই আমি কয়েক-বার বেশ গুরুতর ভাবেই রোগে আক্রান্ত হই। একবার যখন শারীরিক যন্ত্রণা অত্যন্ত অসহ্য বলে বোধ হচ্ছিল, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম যে আর নয়, এত কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব, মা-শ্রীঅরবিন্দ তো বলেইছেন যে এ পথ আমার জন্য নয়, আমি এখান থেকে সত্যি সত্যি চলেই যাব। তখন দুপুর দুটো। যখন আমি এইরকম চিন্তা করছি, হঠাৎ নীরদ আমার ঘরে এসে উপস্থিত, "কবি, শ্রীঅরবিন্দের টনক নড়েছে, তুমি কি সব ভাবছ শ্রীঅরবিন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি বলে পাঠালেন যে তুমি ওসব চিন্তা দূর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি এখানেই থেকে যাও।" এই ঘটনার পর আমি আর কোনদিন আশ্রম ছাড়ার কথা ভাবিনি।

১৯৫৬ সালে আমার একবার ভীষণ অসুখ হয়। আমার সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা করতো—আমি যেন ২৪ ঘন্টা আগুনে শুয়ে আছি মনে হত। তখন দর্শন আসন্ন। ডাক্তারবাবু তো সব আশা ছেড়ে দিয়ে মাকে গিয়ে বললেন যে আমার জীবনের আর কয়েকদিনই বাকি, কিছুই করার নেই। মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন যেমন করেই হোক আমাকে দর্শন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি নিজেও মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে দর্শন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবই। আমি মাকে জানালাম যে দর্শনের দিন আমি যেন তাঁর দর্শন পাই। মা আমায় অনুমতি দিলেন। দর্শন পর্যন্ত কোন রকমে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেলাম। দর্শনের দিন Stretcher-এ করে আমায় আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হল। অমৃতের ঘরের সামনে উপরে উঠবার যে সিঁড়ি আছে, সেইখানে মাটিতে আমায় রাখা হল ও মাকে খবর দেওয়া হল যে নিশিকান্তকে আনা হয়েছে। মা আমায় দেখবার জন্য উপর থেকে নেমে এলেন। নেমে এসে মা স্ট্রেচারের কাছে দাঁড়ালেন। আমার ব্যাধিগ্রস্ত দেহ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন। তখনও আমার শরীর একেবারে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম যে মাকে বল মায়ের চরণ আমার বুকের ওপর রাখতে। মা জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি কি চাই। যখন মাকে আমার মনস্কামনা জানান হল, তাঁর একটি চরণ সোজা আমার বুকের উপর রাখলেন—দেখতে দেখতে আমার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা কোথায় মিলিয়ে গেল, আমার সারা শরীর বরফের মত শীতল হয়ে গেল। আমি যেন এক আনন্দ জগতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম।

আমাদের এ সম্পর্কে কবিদা'রই লেখা একটি লাইন মনে পড়ে :

"কোন স্বর্গনে সোনা হয়ে গেল মনের প্রতিটি কণা।" কবিদার এই অভিজ্ঞতায় আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর দুটি লাইনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই—

"All Nature dumbly calls to Her alone
To heal with Her feet the aching throb of life."

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১১১১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo		
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		১·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শতাব্দীর প্রণাম	,, ,,	৩·৫০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা	পশুপতি ভট্টাচার্য	৩·৫০
দিব্য জীবনের সন্ধানে	,, ,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Paddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলাস্মরণ

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা–১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা–৯

ওতো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মারাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এই জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ UIB ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পর আপনি পাবেন ২১,২৫০৲ এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা করা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি ?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-১৭৮৪-৫-৬

অথবা যেকোনো শাখা

চেয়ারম্যান : শ্রী এন. এল. চ্যাটার্জি • জেনারেল ম্যানেজার : শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	...	৫
ঋগ্বেদ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৮
কাকা-নওলী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১৫
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...	...	২১
নামের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	...	২৫
প্রেমায়ণ	শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৩৩
টুকরি (কাব্য-সংগ্রহ)	নিশিকান্ত	...	৪৩

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	,,	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	,,	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	,,	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

There is no existence without labour - If you want to get out of labour you must get out of existence - The only way to accomplish that, is the way to Nirvana - and that way, to follow it is of all labour the greatest

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—দশম সর্গ

(৪)

ত্রিদেহী বামন এক ক্রীতদাস তাঁর।
প্রথম, ত্রয়ীর ক্ষুদ্রতম কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ অঙ্গ,
কপাল সংকীর্ণ, চোয়াল তার চতুষ্কোণ গুরুভার,
হ্রস্বকায় চিন্তা, বাসের জন্য দৃঢ় ঘের,
নিরন্তর আনত সে স্থানে হাতুড়ি তার ঘটনার আর রূপাবলীর উপরে।
নিবিষ্ট সে, নিবদ্ধ বাহ্যদৃষ্টির মধ্যে :
দাঁড়িয়েছে প্রকৃতির নিখেট প্রতিষ্ঠার 'পরে।
নিপুণ কারিগর, চিন্তায় অপরিণত,
জীবনধারাকে অভ্যাসের রেখায় বেঁধে রেখেছে,
স্থূল জড়ের ক্ষুণ্ণ শাসনের অনুগত সে,
যে ছাঁচ ধরে কাজ করে সে তারই মধ্যে বন্দী,
বন্দী করে সে আপনারে আপনার সৃষ্টি দিয়ে।
নিত্যকার অতল পুঞ্জীভূত নিয়মাবলীর দাস,
তার চোখে ধর্ম্মবিধি হ'ল জগতের অভ্যাস যত,
সত্য হল মনের এই অভ্যাসমাত্র।
রাজ্য তার স্থূল দৃশ্য আর ঘটনারাজি,
ঘুরে ফিরে চলে সে মানস ধারণার প্রাচীন আবর্ত্তে,
নিরন্তর পুনঃপুনঃ করে যায় পুরাতন পরিচিত কর্ম্মাবলী,
সন্তুষ্ট থেকে যায় সে পরিচিত জানা যা তাই নিয়ে।
প্রিয় তার সেই অতীতের ভূমি যেখানে ছিল তার নিবাস ;
নূতন যা কিছু ত্যাজ্য তার কাছে দুঃসাহসী পাপরূপে,
নব আবিষ্কার মাত্রই অবিশ্বাস্য তার,
অগ্রসর হয় সে পদে পদে অতি সন্তর্পণে,
অজ্ঞাতে ভয় তার যেন কালান্তক পাতাল।
আপন অজ্ঞানের সাবধানী ভাণ্ডারী সে,
শংকিত সে নব অভিযানে, চক্ষু তার সয় না খরোজ্জ্বল আশা,
বরণ করে সে নির্ব্বিঘ্ন দৃঢ়স্থিতি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ;
চায় না বৃহত্তের সমুচ্চের বিপদসংকুল আনন্দ।

জগতের বস্তুর আলেপ তার শ্রুবব্রত মনের উপরে ;
যাঁরে অনুলেখন যত সহজে যায় না মুছে,
তাদের দৈন্যই তাদের মূল্যকে বাড়িয়ে দেয় ;
মূলধন তার হ'ল পুরাতন সুনিশ্চিত স্মৃতি যত,
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা তাই শুধু নিত্য-বস্তু,
যাহা ঘটনাই সে ধরে দেয় একমাত্র সত্য বলে,
জ্ঞান হ'ল শুধু পৃথ্বীমুখী দৃষ্টি,
যে জিনিষ জানা চিরকাল, যে কর্ম্ম করা হয় চিরকাল
তাদেরই সে আঁকড়ে ধরে থাকে আশ্রয়দণ্ড যেন,
তাদের উপর ভর করে মহাকালের সোপান-শ্রেণী নির্ব্বিঘ্নে উঠে চলবার জন্য।
ভগবানই তার হাতে তুলে দিয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন ধারা সব :
তারাই অচল বিধি, মানুষের অধিকার নাই তাদের পরিবর্ত্তন করে,
তারা হল সুমহান মৃত অতীত হ'তে পুণ্য উত্তরাধিকার
অথবা একেই ভগবান গড়েছেন জীবনের একমাত্র পথরূপে,
প্রকৃতির চিরস্থির রূপ, দ্বিতীয় রূপ নাই যার,
বিশ্বের যে বিপুল নিত্যকর্ম্মসূচী তারই অংশরূপে।
বিশ্বপালকের মুখে স্মিতহাস্য এক
মনোময় সত্তাকে সেই আদিকালে এই পৃথিবীর উপরে প্রেরণ করেছিল
তার অধিকর্ত্তা করে

প্রত্যেকেই যেন ধরে তার অপরিবর্ত্তনীয় মূর্ত্তি,
প্রত্যেকেই যেন সরে না দাঁড়ায় তার লৌকিক স্থিতি হ'তে।
তাকে দেখি আমরা নিষ্ঠাভরে তার কর্ম্মের আবর্ত্তনে ঘুরে চলেছে,
শ্রান্তিহীন চিরাচরিত তার ব্রতের ঘূর্ণিচক্রে ;
কালের জীর্ণ ভগ্ন কর্ম্মজালে
সে রয়েছে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত শুল্ক-বাটির সম্মুখে,
অথবা সে যেন সুপ্রাচীন রাত্রির অস্ফুট পরিবেষ্টনে,
সঙ্কীর্ণ এক আঙ্গিনায় অর্দ্ধশায়িত নিদ্রাঘোরে
ডেকে ওঠে অপরিচিত আলোকরেখা দেখামাত্র,
শত্রু বুঝি আসে ওই, ঘর তার ভেঙ্গে দেবে :
প্রহরী-সারমেয় যেন আমার এই ইন্দ্রিয়াবলী ঘেরা ঘরখানির,
অদৃশ্য হতে অজানা আগন্তুকদের বিরুদ্ধে ;
আহার্য্য তার প্রাণধারার উচ্ছিষ্ট কণিকারাশি আর জড়সত্তার শুষ্ক অস্থিসব,
রয় সে স্থূল অনিশ্চয়তার এই তার গৃহকোটরে।
কিন্তু তারই পিছনে রয়েছে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-বল এক :
সুপরিমিত মহিমা এক ধরে রেখেছে তার বৃহত্তর পরিকল্পনা,

অতল সবার এক ছন্দায়িত করে প্রাণের পদক্ষেপ।
তারকারাজির নিত্যকার পরিক্রমা-পথ নিষ্প্রাণ আকাশ খুঁড়ে চলেছে,
লক্ষ লক্ষ গোষ্ঠিসব অনুসরণ করে একই মূক বিধি,
বিপুল এক জড়তা হ'ল জগতের রক্ষণবর্ম,
পরিবর্তনের মাঝেও ধরা রয়েছে অপরিবর্তন,
জড়ত্বের গর্ভে ডুবে যায় পরাবর্তন যত,
নূতন সজ্জায় পুরাতন পুনরায় শুরু করে তার অভিনয়,
মহাশক্তি হ'ল কর্ত্রী, স্থিরসত্তা অনুমন্তা :
শিবের বক্ষ ধারণ ক'রে রয়েছে বিপুল বিশ্বমৃত্যু।

ঋগ্বেদ

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—ষাদশ সূক্ত

১। প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।
ঘৃতং ন যজ্ঞ আসো সুপূতং গিরঃ ভরে বৃষভায় প্রতীচীম্ ॥ ১ ॥

প্র (+ভরে)—প্রতি, অভিমুখে
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য, অগ্নির প্রতি বা অভিমুখে
বৃহতে—বৃহতের প্রতি
যজ্ঞিয়ায়—যজ্ঞসাধকের বা যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতৃর প্রতি
ঋতস্য—সত্যের
বৃষ্ণে—বর্ষকের প্রতি
অসুরায়—শক্তিমানের প্রতি
মন্ম—মনকে, মতিকে, চিন্তাকে
ঘৃতম্—ঘৃত, তেজ-নৈবেদ্য
ন—যেমন
যজ্ঞে—যজ্ঞে, যজ্ঞকর্মে
আস্যে—মুখাভ্যন্তরে
সুপূতম্—সম্যক্-শুদ্ধ, পূর্ণ শুদ্ধ
গিরম্—বাক্যকে
(প্র+) ভরে—নিয়ে এসেছি
বৃষভায়—গণাধিপতির জন্য, পুরুষপ্রবরের জন্য
প্রতীচীম্—অভিমুখী (সাধন)

বৃহৎ যে অগ্নি, যজ্ঞাধিপতির সত্যের বর্ষক, বলরূপী, তার কাছে মনকে আমি ধরে দিয়েছি যজ্ঞে অনলমুখে যেমন পরিশুদ্ধ তেজধারা, নিয়ে এসেছি পুরুষ-প্রবরের জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে বল্গাবলী ॥১ ॥

২। ঋতং চিকিত্ব ঋতমিচ্চিকিদ্ধ্যতস্য ধারা অনু তৃন্ধি পূর্বীঃ।
নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সপাম্যরুষস্য বৃষ্ণঃ ॥২ ॥

ঋতম্—সত্যকে
চিকিত্বঃ—জান (তুমি)

ঋতম্ ইৎ—সত্যকেই
চিকিদ্ধি—জেনে রাখ
ঋতস্য—সত্যের
ধারাঃ—ধারা সকল
অনু—একে একে, পরপর
তৃন্ধি—কেটে মুক্ত করে দাও, পথ কেটে দাও
পূর্ব্বীঃ—বহুল
ন—না
অহম্—আমি
যাতুম্—যেতে
সহসা—বলের সহায়ে
ন—না
ধয়েন—মৈত্রের সহায়ে
ঋতম্—সত্যকে
সপানি—জানি
অরুষস্য—দীপ্তিময়, জ্যোতির্ম্ময়
বৃষ্ণঃ—পুরুষরাজের

সত্যের জ্ঞান তোমার, সত্যেরই জ্ঞান তোমার হোক, সত্যের বহুল ধারার জন্য তুমি একে একে পথ কেটে দাও। আমি জানি না বলের সহায়ে অথবা মৈত্রের সহায়ে কি রকমে পৌঁছিব দীপ্যমান পুরুষ-প্রবরের সত্যের কাছে॥ ২॥

৩। কয়া নো অগ্ন ঋতয়ন্নুতেন ভুবো নবেদা উচথস্য নব্যঃ।
বেদা মে দেব ঋতুপা ঋতূনাং নাহং পতিং সনিতুরস্য রায়ঃ॥৩॥

কয়া—কোনটি দিয়ে
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
ঋতয়ন্—সত্যের সন্ধান করে
ঋতেন—সত্যের দ্বারা
ভুবঃ—তুমি হয়েছ
নবেদাঃ—জ্ঞাতা (সায়ণ)
উচথস্য—বাক্যের
নব্যঃ—নব্য, নূতন
বেদ—জানে, জানা আছে
মে—আমার
দেবঃ—দেবতার

ঋতূপাঃ—কালচক্রের রক্ষক
ঋতূনাম্—সকল কালের
ন—না
অহম্—আমি
পতিম্—অধিপতি, অধীশ্বর
সনিতুঃ—সর্ব্বজয়ী
অস্য—তার
রায়ঃ—আনন্দের

হে অগ্নি, আমাদের কোন সত্যকে আশ্রয় করে সত্যের দিকে চলেছ তুমি আর হয়েছ এক নব্য বাক্যের ভ্রাতা। হে দেবতা, তুমি আমাকে জান, সকল ঋতুর ঋতুক্রম রক্ষা কর তুমি, আমি কিন্তু জানি না এই সর্ব্বজয়ী আনন্দের অধিপতিকে ॥৩॥

৪। কে তে অগ্নে রিপবে বন্ধনাসঃ কে পায়বঃ সনিষন্ত দ্যুমন্তঃ।
কে ধাসিমগ্নে অনৃতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ ॥৪॥

কে—কারা
তে—তারা
অগ্নে—হে অগ্নি
রিপবে—রিপুদের
বন্ধনাসঃ—বন্ধনকারী
কে—কারা
পায়বঃ—রক্ষাকর্ত্তা
সনিষন্ত—জয় করে, অধিকার করে
দ্যুমন্তঃ—দ্যুতিমান, দীপ্তিমান
কে—কারা
ধাসিম্—প্রতিষ্ঠা
অগ্নে—হে অগ্নি
অনৃতস্য—মিথ্যার, অনৃতের
পান্তি—রক্ষা করে
কে—কারা
অসতঃ—অসত্য
বচসঃ—বাক্যের
সন্তি—হয়েছে
গোপাঃ—রক্ষক

হে অগ্নি, তারা কে, শত্রুদের বন্ধন করে, দীপ্তিমান কে তারা যারা জয় করে, অধিকার করে? হে অগ্নি, কারা মিথ্যার প্রতিষ্ঠাকে ধরে আছে, কারাই বা অসত্য বাক্যের রক্ষক? ৪॥

৫। সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে শিবাসঃ সন্তো অশিবা অভূবন্।
অধূর্ষত স্বয়নেতে বচোভির্ঋজূয়তে বৃজিনানি ব্রুবন্তঃ ॥৫॥

সখায়ঃ—সঙ্গিসব, সহচরসব
তে—তোমার
বিষুণাঃ—বিমুখ, অপসৃত
অগ্নে—হে অগ্নি
এতে—এরা সব
শিবাসঃ—মঙ্গলময়
সন্তঃ—হয়ে
অশিবাঃ—অমঙ্গলময়
অভূবন্—হয়েছে
অধূর্ষত—ধর্ষণ করে
স্বয়ম্—নিজেদের
এতে—এরা
বচোভিঃ—বাক্যের দ্বারা
ঋজূয়তে—ঋজুপন্থীদের
বৃজিনানি—কুটিলসব
ব্রুবন্তঃ—কথা বলে

হে অগ্নি, তোমার সহচর ছিল যারা তারা এখন তোমার বিরোধী, এই যারা ছিল মঙ্গলময়, তারা হয়েছে অমঙ্গলময়। তারা নিজেদেরই উপর ধর্ষণ হানে, যারা ঋজুপথে চলে তাদের কাছে বলে কুটিল কথা ॥৫॥

৬। যস্তে অগ্নে নমসা যজ্ঞমীট্টে ঋতং স পাত্যরুষস্য বৃষ্ণঃ।
তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুরা সাধুরেতু প্রসর্স্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ ॥৬॥

যঃ—সে
তে—তোমার, তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
নমসা—প্রণতি দিয়ে
যজ্ঞম্—যজ্ঞ
ঈট্টে—কামনা করে
ঋতম্—সত্যকে
সঃ—সে
পাতি—রক্ষা করে
অরুষস্য—তেজময়
বৃষ্ণঃ—পুরুষপ্রবরের

তস্য—তার
ক্ষয়ঃ—আবাস, গৃহ
পৃথুঃ—বিস্তীর্ণ, বিশাল
আ—কাছে
এতু—আসে যেন
সাধুঃ—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
আ-এতু—আসে যেন
প্র+সর্ম্পণ্য—অগ্রসর হয়ে চলেছে যে, প্রগতিশীল
নহুষস্য—মানুষের
শেষঃ—শেষ, পরিণতি

হে অগ্নি, প্রণতির সহায়ে যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে যে সে দীপ্তিমান পুরুষবরের সত্যকে রক্ষা করে। তার আবাসস্থল হয় যেন বিপুল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, প্রগতিশীল মানুষের শেষ পরিণাম ॥ ৬ ॥

৫ম মণ্ডল—ত্রয়োদশ সূক্ত

১। অর্চন্ত্বা হবামহেঽর্চন্তঃ সমিধীমহি।
অগ্নে অর্চন্ত উতয়ে ॥ ১ ॥
অর্চন্তঃ—অর্চনা করে, জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র পাঠ করে
ত্বা—তোমাকে
হবামহে—আহ্বান করি
অর্চন্তঃ—অর্চনা করে, জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র পাঠ করে
সম্+ইধীমহি—সমিদ্ধ করি
অগ্নে—হে অগ্নি
অর্চন্তঃ—অর্চনা করি
উতয়ে—অভিবৃদ্ধির জন্য

আমাদের জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র দিয়ে তোমাকে আহ্বান করি, জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র দিয়েই তোমাকে প্রজ্বলন্ত করি, হে অগ্নি, জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র দিয়ে আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য ॥১॥

২। অগ্নেঃ স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ।
দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥২ ॥
অগ্নেঃ—অগ্নির
স্তোমম্—প্রতিষ্ঠামন্ত্র

মনামহে—মনন করি, মনের মধ্যে ধারণ করি
সিধ্রন্—সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিকারক
অদ্য—আজ
দিবিস্পৃশঃ—স্বর্গস্পর্শীর
দেবস্য—দেবতার
দ্রবিণস্যবঃ—সম্পদকামী, পদার্থকাঙ্ক্ষী

সত্যপদার্থকামী আমরা, মনের মধ্যে আজ আমরা ধারণ করি স্বর্গস্পর্শী দেবতা অগ্নির সিদ্ধিপ্রদ প্রতিষ্ঠানম্ ॥২॥

৩। অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা।
স যক্ষদ্দৈব্যং জনম্ ॥৩॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
জুষত—সাদরে গ্রহণ করে যেন
নঃ—আমাদের
গিরঃ—বাক্য
হোতা—আহ্বানকর্তা
যঃ—যিনি, যে
মানুষেষু—মানুষের মধ্যে
আ-যক্ষৎ—যজ্ঞসাধন করেন
স—তিনি, সে
দৈব্যম্—দিব্য
জনম্—জনের জন্য

অগ্নি আমাদের বাক্যকে সাদরে গ্রহণ করে, মানুষের মধ্যে এখানে যেন সে আহ্বানকর্তা। দিব্যজনের জন্য সে যজ্ঞ উদ্‌যাপন করে যেন ॥৩॥

৪। ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ।
ত্বয়া যজ্ঞং বি তনুতে ॥৪॥

ত্বম্—তুমি
অগ্নে—হে অগ্নি
সপ্রথাঃ—বিশাল, বৃহৎ
অসি—হও
জুষ্টঃ—প্রীতিকর, প্রেয়
হোতা—আহ্বানকারী
বরেণ্যঃ—বরণীয়
ত্বয়া—তোমার দ্বারা

যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
বি তনুতে—প্রসারিত ক'রে ধরে

হে অগ্নি, বৃহৎ বিশাল তুমি, সর্ব্বপ্রিয় বরেণ্য আহ্বানকারী হোতা তুমি। তোমার সহায়ে যজ্ঞকে তারা বিপুল প্রসারিত ক'রে ধরে ॥৪॥

৫। ত্বামগ্নে বাজসাতবং বিপ্রা বর্দ্ধন্তি সুষ্টুতম্।
স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্ ॥৫॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
বাজসাতবম্—পরমপূর্ণতাবিজয়ী
বিপ্রাঃ—জ্ঞানদীপ্তেরা
বর্দ্ধন্তি—বৃদ্ধিসাধন করে
সু-স্তুতম্—সুনয়ে সম্যক্ স্থাপিত হয়েছে যে
সঃ—সেই তুমি
নঃ—আমাদের
রাস্ব—দান কর
সু-বীর্য্যম্—পূর্ণ বীর্য্য

হে অগ্নি, তুমি পূর্ণতাকে পূর্ণ জয় করেছ, তুমি সুনয়ে সম্যক প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান-দীপ্তেরা তোমার বৃদ্ধিসাধন করে। তাই তুমি পূর্ণবীর্য্যে আমাদের ভরে দাও ॥৫॥

৬। অগ্নে নেমিরয়া ইব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি।
আ রাধশ্চিত্রমৃঞ্জসে ॥৬॥

অগ্নে—হে অগ্নি
নেমিঃ—চক্রবলয়
অরান্-ইব—চক্রদণ্ডের যেমন
দেবান্—দেবতাদের
ত্বম্—তুমি
পরিভূঃ—চারিদিকে ঘিরে
অসি—রয়েছ
আ ঋঞ্জসে—আনয়ন কর, নিয়ে এস
রাধঃ—আনন্দ
চিত্রম্—বহুবিধ

হে অগ্নি, চক্রের বলয় যেমন চক্রদণ্ডের চারিদিকে ঘিরে রাখে, তুমিও তেমনি দেবতাদের ঘিরে রয়েছ। তুমিই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ বহুবিধ আনন্দ ॥৬॥

বলাকা-মণ্ডলী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

সাগরের উপকূলে পাহাড়-পর্ব্বতের প্রস্তর-স্তূপের মাঝে বসবাস করত একদল বলাকা অর্থাৎ সাগর-হংস—একদল নয়, বলতে হয় বহুদল কারণ সংখ্যায় তারা প্রায় অগণিত, শত শত, সহস্রও হ'তে পারে। স্থানটি অপরূপ, দৃশ্যও মনোলোভা, সম্মুখে শুভ্র ফেনায়িত অপার সাগর, উপরেও অপার সুনীলিমা। এর কোলে ধবলরঙের মেলা বসেছে। সাগর-গামী শ্বেতহংস দেখেছ তোমরা? উড়ে চলে যখন এই সাগরিকা হংসমালা ডানা মেলে, একপক্ষের প্রান্ত হ'তে অপর পক্ষের প্রান্ত অবধি নিকলঙ্ক শ্বেত-আভা, দুগ্ধফেননিভ। মনে পড়ে যায় "কুন্দেন্দুশেখরা তুষারহারধবলা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা" দেবী-বন্দনা। বলাকাদল উড়ে চলে যখন, এই ধবলিমার গতিভঙ্গ কি স্বাচ্ছন্দ্য-সুষমা, কি লীলাভিরাম!

এদের দৈনিক কর্ম্মসূচী তোমরা জান? বলা বাহুল্য সকালে উঠে তাদের প্রথম কাজ আহারের অন্বেষণ, তাই তারা দলে দলে উড়ে চলে সাগরের দিকে সাগরের উপর দিয়ে; দেখে নীচের দিকে তাকিয়ে মাছের ঝাঁক বা ছুটো মাছ কোথাও চলেছে কিনা, জলের ভিতরে—সানুদ্রিক মাছই ত' এই পাখীদের খাদ্য, উপর থেকে যখনই নজরে পড়ে জলের মধ্যে তাদের শিকার তখনই তীব্র বেগে নেমে আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর, প্রায় অব্যর্থই হয় তাদের লক্ষ্য। শিকার নিয়ে ফিরে চলে যায় তাদের আবাসে, সদ্ব্যবহারের জন্য। এই আহার্য্য নিয়ে তাদের মধ্যে হয় বিলক্ষণ রেশারেশি, কলহ-কোলাহল, লড়াই পর্য্যন্ত। বাকী সময়টা তারা থাকে ঝিমিয়ে বা ঘুমিয়ে, প্রয়োজন বোধ হ'লে আবার একবার টহল দিয়ে আসে সমুদ্রের উপরে যদি কিছু অধিকন্তু শিকার যোগাড় হয়। তারপর অবশ্য রয়েছে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। তাদের জীবন এইভাবেই চলেছে, একইভাবে, কোনরকমে নিয়মভঙ্গ না ক'রে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগ-যুগান্তর ধরে। এতই অভ্যস্ত তারা এই জীবনে যে তাদের ক্লান্তি আসে না, বরং তারা পরিতৃপ্তই—আনুষঙ্গিক-ভাবে সাময়িক কলহ-লড়াই, নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও।

কিন্তু একদিন এরই মধ্য হ'তে একটি পাখী অন্যমনা হয়ে সরে দাঁড়াল, কিছু পৃথক হয়ে। এক চিন্তা তার মাথায় প্রবেশ করেছে; পাখীর মাথায় চিন্তা প্রবেশ করবে না কেন? মানুষের মধ্যে এক বালকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করেছিল উপনিষদে বলছে। তাই নূতন ভাবটি নিয়ে পাখীটির হঠাৎ বোধ হ'ল, এই যে জীবন তারা যাপন করে তার কোন অর্থ নাই, তাতে কোন রস নাই—এমন জীবন আর নয়, জীবনের ধারা বদলাতে হবে, কারণ ইতঃমধ্যেই অনেক সময় তার বোধ হয়েছে, চারিদিকে এ অবাধ অনন্ত প্রসার, কিন্তু তারা ত' উড়ে বেশিদূর যায় না। তার মনে হ'ল আরও দূরে চলে যেতে সক্ষম তাদের ডানা, বহুদূর

অবধি উড়ে যেতে পারে, তাতে রয়েছে এক নূতন আনন্দ। তাই এই পাখীটি সবে এল তাদের দল থেকে কিছু দূরে এবং সুরু করে দিল তার ইচ্ছামত উড়ে চলবার চেষ্টা। দেখল সে যতই এ রকমে যতদূর চলে যায় আনন্দও তার তত বেড়ে যায় আর দেহটাও তার সবল সুস্থ ও আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। ক্ষুধা মিটাবার, শুধু মৎস্য শিকার করে চলবার প্রবৃত্তি আর দেখা দেয় না। তার এই যে নূতন দৈনন্দিন কসরৎ-প্রয়াস তা আরও দুই-তিনটি সহচর বিহঙ্গের নজরে পড়ে গেল। তারা একদিন এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল তার জীবন-রহস্যের কথা। সে খুলে বলল সব—পুরাতন একঘেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবনে সে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় উদার প্রসারিত জীবন-ক্ষেত্র যেখানে সে অর্জন করতে পারে জীবনের নূতন সার্থকতা, অভিনব আনন্দের উৎস। এরপর থেকে এই চারজন সঙ্গী মিলে তাদের নবজীবনে নূতন উৎসাহে এবং নূতন ধারায় নিযুক্ত হ'ল। মুখ্য পাখীটি, তার নাম আমরা দেব 'শোভনক' কারণ দেখতে সে বিশেষভাবেই সুন্দর-শোভন ছিল। নামটি পঞ্চতন্ত্রের নামাকরণের অনুসরণে: যথা, দমনক, করটক, ভাসুরক ইত্যাদি। শোভনক তার সঙ্গীদের বলল, "দেখ, প্রথমে আমরা শিখব দূরে উড়ে চলা। পুরাতন জীবনে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম কয়েক মাইল মাত্র উড়ে চলায়, তার বেশি দরকার হত না। এখন আমরা উড়ব যতদূর আমাদের সামর্থ্যে কুলায় এবং প্রাণ চায়।"

এইভাবে অভ্যাস ক'রে তারা দেখল একশ' দুশ মাইল, শেষে তারা মাইল পর্যন্ত তারা উড়তে পারে এবং তাতে কি আনন্দ, কি উল্লাস। তার কিছু পরে একদিন শোভনক বললে তার সঙ্গীদের, "আমরা সামনে বরাবর সোজা উড়তে শিখেছি, এখন আমাদের শিখতে হবে উড়ে উপরে উঠতে। উপরে ওঠা কিছু কঠিন, বেশিদূর যাওয়া—কারণ উড়তে হয় পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে, তবুও আমরা চেষ্টা করব।" এইভাবে ক্রমে তারা শিখল সোজা উপরে উঠে যেতে, প্রায় বায়ুমণ্ডলীর শেষপ্রান্ত অবধি। এও নূতন শিক্ষা, প্রাণে এনে দেয় নূতন স্বাচ্ছন্দ্য-পুলক, দেহ ভরে ওঠে নূতন সামর্থ্যে। কিছুদিন পরে শোভনক আবার তার বন্ধুদের ডেকে বললে, "আমাদের আরও একটা জিনিষ শিখবার আছে। আমরা বহুদূর যেতে পারি সোজাসুজি, আমরা উর্দ্ধে উঠে যেতে পারি যতদূর সম্ভব, এখন আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে বেগের দিকে, অততর বেগ আমাদের অর্জন করতে হবে। এর জন্য আমার মনে হয় যদি আমরা একেবারে উপরে উঠে নীচের দিকে ধেয়ে চলি তবেই আমাদের বেগ বেশি বেড়ে যাবে।" এই প্রস্তাব অনুসারে তারা অভ্যাসে লিপ্ত হ'ল, দেখা গেল শোভনকের গতিবেগ অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে—বলতে গেলে সত্যসত্যই বিদ্যুৎ-গতি। শব্দের যে গতি তাকেও সে ধরে ফেলেছে, অতিক্রম করে গিয়েছে। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। শব্দতরঙ্গের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চললেও দেহ তার অটুট রয়েছে, অতিরিক্ত চাপ যেন অনুভব করে নি, তার শরীর যেন নূতন একটা প্রাণ-সামর্থ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে, তার শরীরকে এনে দিয়েছে অদ্ভুত সহ্যগুণ, নমনীয়তা, একটা লোকাতীত আভা। অন্যেরাও শোভনকের সঙ্গে সঙ্গে চলল এই অনুশীলনে, যার পক্ষে যতদূর সম্ভব।

এইসঙ্গে তারা অন্যান্য গতিভঙ্গীও অভ্যাস করে চলল, দ্রুতবেগে চলতে চলতে দেহকে যে কোন ভঙ্গিতে চালাতে পারা, যেমন কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে, ওলট-পালট করে,

ডিগবাজি খেয়ে নানারকমে ঘুরে ফিরে, ঠিক যেমন মানুষী বৈমানিকেরা তাদের বাহনটি নিয়ে কারসাজি দেখায়। এই উড়ে চলার সবরকম কৌশল ও ধারাই তাদের আয়ত্তাধীন হয়ে গেল।

(২)

এইরকমে একদিন যখন তারা দূর আকাশে অসীম প্রসারে তাদের কৌশল অনুশীলন করে চলছিল হঠাৎ দেখল তারা কোথা হ'তে আর একটি পাখী এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে, তাদেরই গোত্র কিন্তু কেমন পৃথক। সে আসছে তার এক আন্তর মহিমা ছড়িয়ে দিয়ে যেন। শোভনাক তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তখন এই নবাগত পাখীটি তাকে বলল, "আমি দেখছিলাম তোমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, তোমাদের শারীর দক্ষতা ও নৈপুণ্য। সত্যই সে সব মহৎ গুণ এবং তার জন্য তোমরা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু আমি এখানে তোমাদের প্রশংসা করবার জন্য আসি নি, আমার এখানে আসবার এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অনুশীলনের আর এক ধাপে তোমাদের উঠে যেতে হবে, তোমাদের শিখতে হবে, অর্জন করতে হবে একটা নূতন ধরনের গুণ বা বৃত্তি। এতদিন তোমাদের শারীর-অনুশীলন অর্থাৎ উড়ে চলা হয়েছে একই সমতল আশ্রয় করে। এই যে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ দিয়ে ঘেরা একটা দেশ বা প্রসার তাকেই ধরে তোমাদের সমস্ত অঙ্গ-সঞ্চালন চলেছিল। এখন এই চারিটি দিক নয়, এ ছাড়া অন্য একটা দিকে দিগন্তরে তোমাদের যেতে হবে। এতদিন তোমাদের ওড়া ছিল সচল চলন্ত ওড়া, এবার শিখতে হবে অচল বা স্থির ওড়া। তা কি করে সম্ভব? এটা কি স্ব-বিরোধী কথা নয়? না, তা নয়। আমি যে দিগন্তরের কথা উল্লেখ করলাম তার প্রকৃতি তার ধর্ম্মই হ'ল স্ববিরোধের সমন্বয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মের বৃত্তি বা বস্তু এখানে মিলিত হবে একটা অপরূপ ঐক্যে বা একত্বে। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন, শোনা নয়, আমি যা করছি, করে দেখাব তাই মনোযোগ দিয়ে দেখ। এস আমার কাছে, এসে পাশে দাঁড়াও, স্থির হয়ে, দৃঢ় পদে, সকল অঙ্গ প্রশান্ত করে। শোন, যখন তুমি উড়তে চাও, প্রথমে তোমার মনে উড়বার সঙ্কল্প জাগে। সেই সঙ্কল্পের সঙ্গে জাগে ইচ্ছা-প্রবেগ। তাতে সাড়া দিয়ে ওঠে তোমার দেহের নাড়ি-স্নায়ু এবং পেশীসব—তারা সচল হয়ে ওঠে। একটা বেগ, একটা শক্তির ধারা তোমার মনের সঙ্কল্প থেকে উঠে ক্রমে বাইরে চারিয়ে ছড়িয়ে যায় তোমার ডানার শেষপ্রান্ত অবধি। তারই ফলে পরিণামে ডানা খুলে যায়, তুমি উড়ে চলতে থাক যেখানে তুমি রয়েছ সেখান থেকে অন্যত্র। এই হ'ল চলন্ত ওড়া। এই ক্রিয়ায় সকলেই অভ্যস্ত এবং তোমরা একেই আশ্রয় করে, এরই অনুশীলন করে পারদর্শী হয়েছ। কিন্তু এখন এই ধারার মুখ ফিরিয়ে ধরতে হবে। বলেছি এর গতি হ'ল ভিতর থেকে বাইরে চলে যাওয়া—মনের সঙ্কল্প থেকে ধাপে ধাপে ডানার প্রান্তে বেগ চারিয়ে দেওয়া। তা না করে সঙ্কল্পের বেগকে ভেসে উঠতে দেওয়া নয়, বাইরে আপনাকে ছড়িয়ে দেওয়া নয়, ভিতরেই সংহত সংযত করে ধরে রাখা। প্রথম যে সঙ্কল্পের কথা বলেছি সে সঙ্কল্পেরই অন্তরে ইচ্ছাশক্তিকে প্রবেগকে

একত্রিত করে একমুখী করে স্থির করে রাখা। এর নাম মনঃসংযোগ, একাগ্রচিত্ততা। এই একাগ্রতা যত তীব্র হবে, নিঃসংশয় হবে তত সে হয়ে উঠবে স্বয়ংক্রিয়, তখন তুমি তোমার দৃষ্টি যেদিকে বা যেখানে নিবদ্ধ করবে তৎক্ষণাৎ দেখবে তুমি সেখানে পৌঁছেছ গিয়ে সশরীরে। দেখ আমার দিকে তাকিয়ে"—এই বলে জ্যেষ্ঠ পাখীটি স্থির হয়ে সংহত হয়ে রইল, সেই মুহূর্তেই শোভনক দেখতে পেলে সঙ্গী তার সঙ্গে নেই, দূরে এক পর্ব্বতশিখরে বসে আছে, পরমুহূর্তেই দেখতে পেল আবার ফিরে এসে বসেছে তার পাশে। বলা বাহুল্য শোভনক স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে রইল কিছুকাল। জ্যেষ্ঠ বিহঙ্গটি বললে, "আমি যে শিক্ষা তোমাকে দিলাম, ক্রমে তা অভ্যাস করে চল, তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসবে এ ক্ষমতা। আমার পক্ষেও এই সাধনা একদিনে পূর্ণ হয় নি, বেশ কিছু সময় লেগেছে। যা হোক তোমাকে আমার শেষ কথাটি বলি—যাকে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন উত্তম রহস্য। এই যে স্থূল শরীর দেখছ, তোমাদের মনে হয় তা একটা কঠিন পদার্থ, দৃঢ় গঠন তার, অন্য জিনিষ সব তাতে প্রতিহত হয়ে চলে যায়, তাকেও অন্য জিনিষ হ'তে প্রতিহত হতে হয়। কিন্তু এই যে কাঠিন্যের স্পর্শ বা বোধ এ একটা বোধ মাত্র, অভ্যাসের ফল। আমি আমার দেহকে স্পর্শ করি, মনে হয় তা শক্ত পদার্থ; কিন্তু এটি আমার মনে হওয়া মাত্র, এই মনে হওয়ার বাইরে আর কিছু আছে কি না আমরা জানি না, সুতরাং তোমার এই যে অঙ্গ, মাথার চূড়া থেকে তোমার ডানার পালকের শেষ কণা অবধি হ'ল তোমার প্রত্যয়ের সমষ্টি-মাত্র, চিন্তাবিন্দুর সমষ্টি বলতে পার। তাই যদি হয়, তবে চিন্তাকে অব্যর্থভাবে যথেচ্ছ চালিত করা যেতে পারে চিন্তা দিয়ে। যে মুহূর্তে তোমার চিন্তা হয়েছে "উড়ে যাব" সেই মুহূর্তেই তুমি উড়ে গিয়ে পৌঁছেছ লক্ষ্যস্থানে—অন্তর্বর্তী কোন ক্রমাবলীর আর প্রয়োজন নাই। এ হ'ল ইচ্ছার অব্যবহিত ক্রিয়া। প্রয়োজন শুধু ইচ্ছাশক্তির আদিমূলে পৌঁছে তাতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, সেই আদি উৎসের প্রেরণায় চালিত হওয়া। এ সব কথা তোমাদের কাছে এখন কিছুটা হেঁয়ালী বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধার ফলে, অনুশীলনের ফলে এ বস্তু তোমাদের বোধগম্য হবে, আয়ত্তের মধ্যে আসবে। আমি এখন তবে বিদায় গ্রহণ করব। আমার যা শিক্ষা দেবার ও তোমাদের যে শিক্ষা গ্রহণ করবার ছিল তা আমি দিয়েছি, তোমরাও তা পেয়েছ। আমাকে যেতে হবে, কারণ অসমাপ্ত কর্ম্ম আমি ফেলে এসেছি। আমাদের ঊর্দ্ধযাত্রা ত' শেষ হয় না, পারান্তরের পর পারান্তর, দেশান্তরের পর দেশান্তর, দিগন্তরের পর দিগন্তর। চেতনার যে স্থিতিতে আমি উঠেছি তার ওপারে যেতে হবে আরও নূতন চেতনার জন্য। সময়ে অবশ্য সে সবই বর্ষার মত ঝরে নামবে এই পৃথিবীর উপরে তোমাদেরই মধ্যে।

সর্ব্বশেষ কথা বলি এই—মনে রাখবে তোমরা যে বিদ্যা যে সামর্থ্য অর্জন করেছ তা তোমাদের নিজস্ব গৌরব বা মহিমার জন্য নয়, তোমাদের ফিরে যেতে হবে তোমাদের নিজস্ব দেশে ও সমাজে এবং তোমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারাও তোমাদের এই জীবনের অংশ কিছু গ্রহণ করতে পারে, তাদেরও জীবন যাতে তোমাদের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে।" এই বলে বিহঙ্গ-জ্যেষ্ঠ উড়ে গেল ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধতর আকাশের দিকে—যতই সে দূরে চলে গেল ততই সে হয়ে উঠল এক উজ্জ্বল আলোকবিন্দু যেন—

পরিশেষে সুদূর সুদূরতর আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সে মিলিয়ে গেল। এই দৃশ্যটি স্মরণ করিয়ে দেয় পৃথিবী হতে স্বর্গে দেবর্ষি নারদের যে প্রত্যাবর্তন-চিত্র শ্রীঅরবিন্দ এঁকে দিয়েছেন তাঁর এই অপরূপ ক'টি কথায় :

He turned towards his far-off blissful home.
A brilliant arrow pointing straight to heaven,
The luminous body of the eternal seer
Assailed the purple glory of the noon
And disappeared like a receding star
Vanishing into the light of the unseen ;

ফিরে চলে যায় সে তার আনন্দময় ভবনের দিকে,
ঋজু তীর যেন ঋজুগতি স্বর্গের লক্ষ্য করে ;
চিরন্তন দেবর্ষির জ্যোতির্ময় দেহ
সবেগে প্রবেশ করে সূর্যের রক্তিম মহিমায়,
ক্ষীণতর হয়ে চলে ক্রমে দূরগামী তারকার মত,
লুপ্ত হয়ে যায় অগোচরের আলোক-আঁধারে ;

(৩)

পরে এই পূর্বগামীদের সঙ্গে তাদের পুরাতন আবাস থেকে দু'চারজন এসে যোগ দিয়েছিল। এখন তাদের মনে হ'ল, সময় হয়েছে, তাদের জ্যেষ্ঠের বিদায়-বাণী পূরণ করতে হবে, অর্থাৎ পুরাতন সঙ্গীসাথীদের দিকে ফিরে যেতে হবে। আশঙ্কার হেতু অবশ্য আছে কারণ এদের কাছ থেকে কোন অনুমোদন বা সহানুভূতির আশা করা যায় না। তবুও এই অতীত সহচরদের সম্মুখীন হ'তে হবে। তাই তারা চলল আকাশ-পথে উড়ে সুন্দর সারি দিয়ে। কিন্তু দূরে থেকে পুরাতন দল যেই দেখল প্রত্যাখ্যাত পথভ্রষ্টরা ফিরছে অমনি তাদের মধ্যে পড়ে গেল সাড়া : এই যে শত্রুরা আসছে, কি উদ্দেশ্য তাদের ? সদলবলে ধেয়ে এল তারা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, প্রহারে তাড়িয়ে দিতে হবে এই সব বিধর্মী নবাগতদের। কিন্তু মারমুখী হয়ে উঠলেও কার্যতঃ তারা কিছু করলে না। কি একটা অনিশ্চয়তার বশে, হয় ত' একটা সূক্ষ্ম প্রভাবের কল্যাণে তারা বিস্ময়ে থেমে রইল, তাকিয়ে দেখল উড়ে চলেছে তাদের মাথার উপর দিয়ে এই নূতন বলাকাদল—নূতনই বটে, কি সুন্দর শৃঙ্খলায় চলেছে তারা, কি শোভন গতি তাদের, সুগম ছন্দের তালে তালে, তাদের শুভ্রপক্ষে কি একটা জ্যোতি, একটা প্রশান্তির ঝলক ছড়িয়ে দিয়ে। এই যে অতীতের দল তারা যেন অভিভূত হয়ে রইল, নিরস্ত্র হয়ে পড়ল যোদ্ধৃস্পৃহা, সন্দেহ নাই।

এরপরে রাস্তা সহজ হয়ে গেল, একটি দুটি নয়, দলে দলে, পুরাতনের তরুণেরা এসে যোগ দিতে চাইল এই নূতন জীবনের অনুশীলনে। এর মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটল

যার ফলে সকলের মধ্যেই এই নূতন জীবনের জন্য উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা সত্যকার প্রয়াস অসম্ভব রকমে বেড়ে গেল। ঘটনাটি এই—

চারিদিকে পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝখানে অনেকখানি খোলা জায়গা ; সেখানে শোভনক তার দলটি নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের কলাকৌশল দেখাচ্ছিল উদাহরণ দিয়ে। শোভনক দেখাচ্ছিল তার গতিবেগের মাত্রা। সুদূর আকাশের এক কোণ হতে সে ছুটে আসছে সত্যসত্যই বিদ্যুৎ-বেগে। কিন্তু হঠাৎ সেই খোলা জায়গাটির উপরে একটি পাখী কোথা থেকে এসে পড়েছে শোভনক যে পথে চলেছে ঠিক সেখানে। শোভনক তেমনি বিদ্যুৎ-বেগেই তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল যাতে সেই বেগের ধাক্কা পাখীটিকে স্পর্শ না করে। এড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তেমনি বেগেই পড়ল গিয়ে—সর্ব্বত্র একটা কোলাহল ও হাহাকার-ধ্বনি উঠল, পাখীটিকে বাঁচাতে গিয়ে শোভনক পড়েছে গিয়ে পাথরের গায়ে দারুণ সংঘাতে—সকলেই নিশ্চিত, শিক্ষাগুরুর এই শেষ, শোভনক নিশ্চয় দলিত পিষ্ট হয়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ কি? কি আশ্চর্য্য। ঐ যে শোভনক অক্ষত শরীরে, ধীরে ঘুরে এসেছে, তার দেহে কোথাও কিছু হয় নি, তেমনি সুস্থ, প্রশান্ত, শোভন। শোভনকের দেহ এমন একটা পরিণতি লাভ করেছে, তাতে জড়ের আকার রয়েছে বটে কিন্তু নাই জড়ের জড়ত্ব বা কাঠিন্য। এর দেহে ঠিক সেই গুণই সব রয়েছে, যা মানুষে পেয়েছে আত্মায়, যার স্তুতিগানে সে মুখর হয়েছে :

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥* —গীতা

ক্রমে এইভাবে নূতন একটা বলাকা-সমাজই দাঁড়িয়ে গেল। তাদের জন্য নূতন পাহাড়-পর্ব্বতের কোল আধিকার করতে হ'ল, তারপরে আরও একটি—আরো একটি বৃহত্তর দল—এইভাবে নূতন জীবন ছড়িয়ে গেল।

আমার গল্পের এইখানেই শেষ। আসল গল্পটি হ'ল একটি বৈমানিকের আত্ম-কাহিনী—একজন সত্যকার বৈমানিক এবং তিনি যে বিমান চালাতেন তা সত্যকার বিমান। আকাশপথে এই জড়যানটি চালাতে চালাতে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, প্রাণে যে আস্পৃহা জেগেছিল তারই একটা রূপ তিনি গড়ে দিতে চেষ্টা করেছেন এই কাহিনীতে।

---

* কোন অস্ত্র তাকে ছেদন করে না, অগ্নি তাকে দহন করে না,
জলরাশি তাকে ক্লিষ্ট করে না, বায়ু তাকে শুষ্ক করে না।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৩২০—মানুষের শাসনবিধি, সংঘগঠন, রাজার রাজত্বগঠন, পুলিশ ব্যবস্থা, বিচারালয়, নানা প্রতিষ্ঠানাদি, গির্জা ও মন্দির, আইনকানুন তৈরি, নীতি নিয়মাদি, সৈন্যশাসন রাখা, এ সবকিছুই হয়েছে উপর্যুপরি কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজনের ফলে, যেহেতু ভগবান আমাদের কাছে তাঁর মুখ লুকিয়ে আছেন। আবার যখন আমরা তাঁর সেই দীপ্তিপূর্ণ পরমসুন্দর মুখ দেখতে পাবো তখন সেই আলোতে এ সমস্ত কিছুই বিলুপ্ত হবে।

৩২১—বিদ্রোহ ভাবই মানুষের প্রকৃত দিব্য ভাব, প্রথমেও তাই এবং শেষকালেও তাই ; কিন্তু মাঝামাঝি অবস্থাতেই আমাদের থাকতে হয় একেবারে সয়তানের রাজ্যে।

মা : বিদ্রোহের অবস্থা মানে নিজের মধ্যে নিজেকে শাসনে রাখা। এ অবস্থার পূর্ণতা হবে তখনই যখন প্রত্যেকে তার আপন অন্তরস্থিত ভগবান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কেবল তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে। ৫-২-১৯৭০

৩২২—সমাজের কম্যুনিষ্টধর্মী নীতি ব্যক্তিত্বধর্মী নীতির চেয়ে এই হিসাবে সার্থকরূপে উন্নত হতে পারে—যেমন পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি করার চেয়ে ঈর্ষাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব ভাব থাকা উন্নত। কিন্তু ইউরোপে আবিষ্কৃত যে এখনকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা যেন জোর ক'রে ঘাড়ে জোয়াল দেবার মতো এবং তা কারাগারে থাকার সামিল।

৩২৩—প্রকৃত কম্যুনিজম্ যদি কখনো পৃথিবীতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয় তবে তা হবে কেবল মানুষের অহংজ্ঞানের মৃত্যুতে এবং আত্মায় আত্মায় ভ্রাতৃভাব জন্মানোর উপর। জোর ক'রে গড়ে তোলা একটা যান্ত্রিক সখ্য দাঁড় করানো শেষ পর্যন্ত জগৎব্যাপী ব্যর্থতাই আনবে।

৩২৪—বেদান্তের উপলব্ধির সাহায্যেই কার্যকরী কম্যুনিষ্ট সমাজ ঠিকভাবে গড়তে পারে। সাধু মনীষীরা তেমনই রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন খ্রীষ্টিয় ধর্মে, ইসলাম ধর্মে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মে।

মা : শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই এখানে সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাদের ব্যক্তিত্ববাদিতা হলো একরূপ আইনসম্মত ঈর্ষাবাদিতা, অর্থাৎ কেবল আপনার রাজ্য আপনারই কাছে। কিন্তু এর প্রকৃত প্রতিবিধান হলো একমাত্র ভগবানের সর্বময় আধিপত্য, যিনি সর্বদাই

সকলের মধ্যে চেতনভাবে বিরাজ করছেন, আর তার মধ্যবর্তী অবস্থার কালে কেবল তাদেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকা যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থেকে তাঁরই কাছে পূর্ণ সমর্পিত হতে পেরেছে। ৭-২-১৯৭০

৩২৫—ফরাসী বিপ্লবীরা চেয়েছিল "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী," কিন্তু আসলে যা হয়েছিল তা কেবল খানিকটা সাম্য নিয়ে সেই স্বাধীনতা। আর ভ্রাতৃভাব বা মৈত্রী যা হয়েছিল তা কেইনের (Cain) মতো, বারাব্বাসের মতো (Barabbas) সে জিনিসকে কখনো বলা হয় ট্রাই, কখনো বলা হয় কম্‌রাইন, কখনো ইউরোপের একটা কনসার্ট।

৩২৬—ইউরোপের জ্ঞানী চিন্তকরা বলে—"বাস্তবিকের স্বাধীনতা যখন হলো না তখন সাম্যের সঙ্গেই স্বাধীনতা ছুড়ে দাও, কিংবা তাও যখন কঠিন তখন কেবল সাম্যই বজায় রাখো। কারণ সঠিক ভ্রাতৃত্ব যখন সম্ভব নয় তখন তার বদলে হোক শিল্প-কেন্দ্রিক সম্মিলন।" কিন্তু এতেও ভগবানকে প্রতারিত করা চলবে না।

মা : আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী কেবল কথার কথা মাত্র—বাস্তবে তা সফল হয়নি ; যতদিন মানুষ এমনভাবে তার অহংকে বড়ো ক'রে থাকবে ততদিন তা হতেও পারবে না, যতদিন মানুষ তার কামনা বাসনাকে ছেড়ে একমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্য নেবে তাঁরই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে না চলবে। ৮-২-১৯৭০

৩২৭—ভারতের ছিল তিন রকমের সামাজিক কাঠামো—পল্লীসমাজ, বৃহত্তর যৌথ পরিবার, এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ; কিন্তু এখনকার অহংজ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই তিন-রকমই ভেঙে গেছে বা ভাঙছে। কিন্তু এই ভাঙা রকমের ব্যাপারগুলি কি অতঃপর কোনো বৃহত্তর ও দিব্য সমাজ স্থাপনের প্রস্তুতিস্বরূপ নয়?

৩২৮—ব্যক্তিসত্তার অপূর্ণতা কখনই যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে সর্বতোভাবে ভগবৎ-সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ না করছে। তেমনি এই মানবজাতিও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয় তাহলে তাঁর সর্বপূর্ণ সমাজ গড়বে না।

মা : শ্রীঅরবিন্দ এখানে স্পষ্টই বলছেন, যে কথা আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ভগবানেরই রাজত্ব এ কথা যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বত্র সর্বতোভাবে স্বীকৃত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জগতে কোনো পূর্ণতা আসবে না।

মানুষের স্বাধীনতা তখনই পুরো অভিব্যক্ত হবে যখন সকল মানুষ ভগবৎ স্বাধীনতাকে হৃদয়ঙ্গম করবে। প্রকৃত সাম্য তখনই অভিব্যক্ত হবে যখন মানুষ জানবে ভগবানকে। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী তখনই জন্মাবে যখন সকলে জানবে যে একই পরমপিতা থেকে সকলে জন্মেছে এবং তাঁর মধ্যে সকলেই এক এবং অভিন্ন।

৯-২-১৯৭০

৩২৯—ভগবানের চোখে কোনো কিছুই ছোটো নয় ; তোমারও চোখে যেন কোনো কিছু ছোটো না থাকে। তিনি একটা ঝিনুক গড়ে তুলতে যতটা শক্তি ও শ্রম প্রয়োগ করেন, একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলতেও ততখানি তাঁর দিব্যশক্তি প্রয়োগ করেন। তোমার পক্ষে একজন বিলাসী অকর্মণ্য রাজা হওয়ার চেয়ে একজন কর্মপটু নুচি হওয়া অনেক ভালো।

৩৩০—তোমার পক্ষে কোনো কাজে কৃত্রিম কৃতিত্ব ও ধারকরা সাফল্যলাভের চেয়ে অকৃত্রিম রকমের অপূর্ণ প্রয়াস ও অপূর্ণ সাফল্যলাভ করাও অনেক ভালো।

৩৩১—কাজের উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ নয়, তার মধ্যে থাকে ভগবানেরই হওয়া এবং দেখা এবং করার আনন্দ।

মা : অর্থাৎ কাজের গুরুত্ব তার মাত্রার উপর নির্ণীত হয়না, এবং তার পূর্ণতাও তার ঘটনাবলী ও বাহ্য বিষয়ের দ্বারা নির্ণীত হয়না, তা হয় কেবল তার ঐকান্তিকতা ও নিবেদনের মাত্রার উপর।

ভগবান তোমাকে দিয়ে যা করাতে চান তা নিষ্ঠা ও নিবেদনের ভাব নিয়ে করাই হলো আসল কথা ; তার বাহ্যমাত্রার উপর তা নির্ভর করে না।

১০-২-১৯৭০

৩৩২—ভগবানের জগৎ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়, প্রথমে ছোটোর দিক থেকে ক্রমশঃ বড়োর দিকে। আগে নিজেদের জাতীয়তাকে গড়ে সফল ক'রে তোলো, পরে হবে বৃহত্তর এক জাতীয়তার জগৎ।

৩৩৩—কোনো একটা জাতীয়তা গড়ে ওঠেনা সেই দেশের মানুষদের একরূপ রক্ত, একরূপ ভাষা, একরূপ ধর্ম নিয়ে। ওতে কেবল তার একটা সুবিধা ও আনুকূল্য নেলে। কিন্তু মানুষ যেখানে সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক ঐক্যের দ্বারা না হয়ে একটা বিশেষ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া একই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লক্ষকে ধরে মিলিত হয়, সেখানেই সূচিত হয় জাতির জাতীয়তার প্রকৃত অস্তিত্ব।

৩৩৪—জাতীয়তা মানে ভগবানের ক্রমিক উন্নয়নের পথে পারিবারিক ধরনের ঐক্যবোধকে ছাড়িয়ে যাওয়া ; সুতরাং একটা জাতির গঠন হতে হলে তার গোষ্ঠিগত ও সাম্প্রদায়িক ভাবকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

মা : শ্রীঅরবিন্দ এখানে রাজনৈতিক গুহ্যসত্যের কথা বলছেন, যার পথ অনুসরণ করলে শেষে সকল জাতির মিলনে এক মহাজাতি তৈরি হতে পারে।

১১-২-১৯৭০

৩৩৫—পারিবারিকতা, জাতীয়তা ও মানব-ঐক্য হলো বাননাবতার শ্রীবিষ্ণুর ত্রিপাদ পদক্ষেপ, ছোটো ঐক্য থেকে সামগ্রিক ঐক্যের দিকে। তার প্রথম পদক্ষেপ হয়েছে সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার সম্পূর্ণতার দিকে, যার এখনও আমরা চেষ্টায় আছি তৃতীয়টির দিকে হাত বাড়িয়ে তার সম্পূর্ণতার দিকে।

৩৩৬—মানুষের বর্তমান নৈতিকতার সাহায্যে মানব ঐক্য আনতে পারা এখনও সম্ভব হয়নি; তথাপি সেইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা অন্তত সাময়িক রকমের আপসকেও আপাতত মোটামুটি সফল বলে করা উচিত। এইরূপ আংশিকও সাময়িক সাফল্যের পথেই প্রকৃতি অগ্রসর হয় তার পূর্ণতার দিকে।

মা: শ্রীঅরবিন্দ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তারই দিকে অগ্রগতি তাড়াতাড়ি হয়ে চলেছে; শ্রীঅরবিন্দ যখন থেকে সূক্ষ্মজ্ঞানের ক্রিয়া শুরু করেছিলেন তখন থেকে মানব-জাতির অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে; সাধারণ মানুষ এখন জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে মানব ঐক্য সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করতে পারছে। *

১২-২-১৯৭০

---

* অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

প্রশ্ন : মায়ের "Education" থেকে—"চিত্তের ব্যাপকতা ও বিস্তার ঘটাবার" কি উপায় ?

উত্তর : ওখানে আমি বলতে চেয়েছি নানারূপ বিষয়ে শিক্ষা নেবার কথা। যেমন, স্কুলে যদি পড়ো তবে অনেকগুলি বিষয়কে বেছে নেবে। যদি বাড়িতে পড়ো তবে কেবল এক বিষয়ে নিয়েই নয়, যতগুলি পারো ততগুলি বিষয়ে শিখবে।

প্রশ্ন : কিন্তু না, স্কুলে তো ইচ্ছামত বেছে নেওয়া যায় না। যে বিষয়ে শিখতে চাইব কেবল সেইটি বেছে নিতে পারব।

উত্তর : হাঁ হাঁ, সে কথা আমি শুনেছি, বিশেষত তোমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে। জানি যে এইরকমই নিত্য বলা হয়, যে বিষয়ে ভালো ক'রে শিখতে চাও সেটি আলাদা ক'রে বেছে নিতে হবে। খেলার বেলাতেও একই রকম কথা। জীবনের সকল ব্যাপারই তাই। বারবার এই এক কথাই বলা হয় এবং অনেকে তার সুফল প্রমাণ করেও দেখায়। একটা বিষয় নিয়ে তাতেই একাগ্র হতে হবে। ফিলজফি চাইলে কেবল সেই ফিলজফিই শিখবে, কেমিস্ট্রি চাইলে কেবল কেমিস্ট্রি, টেনিস খেলতে চাইলে কেবল টেনিসই খেলবে। আমি কিন্তু ওরূপ মনে করিনা, আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আমার বিশ্বাস, সাধারণভাবে সকল জ্ঞান সকলেই পেতে পারে, কেবল একটা বিশেষ জ্ঞানলাভের পরিবর্তে,—অবশ্য মঁসিয়ে কুরি ও মাদার কুরির মতো লোকের কথা স্বতন্ত্র। যারা বিশেষ জ্ঞান নিয়ে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে চায়, সে ক্ষেত্রে কেবল বিজ্ঞান নিয়েই তাদের থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তেমন আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তারপরে তারাও অন্যান্য দিকে মনের প্রসার ঘটাতে পারে।

এ কথা আমি বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, পিতামহ প্রপিতামহেরা পর্যন্ত এই কথাই বলতেন যে জীবনে সাফল্য আনতে হলে কেবল একটা জিনিসই নিয়ে থাকতে হবে। অথচ আমি কিন্তু থাকতাম নানা বিষয় নিয়ে। সকলে তাই বলতো যে আমার দ্বারা কোনো কিছুই হবে না। আমি লেখাপড়াও করতাম, ছবিও আঁকতাম, গানও শিখতাম, এবং আরো কিছু। সকলে তাই বলতো যে আমার গানেও উন্নতি হবে না, ছবি আঁকাতেও হবে না, লেখাপড়াতেও কাঁচা থাকব। হয়তো সেটা ঠিক কথা, কিন্তু আমি দেখেছি যে ওর ফলে মনের বিস্তার হয়, মনের বোধশক্তি ও সাবলীলতা বাড়ে, যে কথা আগেই বলেছি। অবশ্য আমি যদি প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হতে চাইতাম তাহলে সেইরকম করাই উচিত ছিল। যদি বড়ো চিত্রকর হতে চাইতাম তাহলেও তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি

তেমন বড়ো কিছু হতে চাইনি। তাতে ক্ষোভ করা হয় নয় করি। অবশ্য এটা মতান্তরের প্রশ্ন।

অবশ্য একরকম ক্ষেত্র আছে যেখানে কেউ বিশেষ কোনো দিকে আবিষ্কার করতে চায়, সেখানে সেই একটি নিয়েই তাকে লেগে থাকতে হয়। কিন্তু কুবি সম্পত্তি যেমন কঠিন জিনিস নিয়ে কাজ করেছে তেমন কিছু ছাড়া কেবল এক জিনিস নিয়েই সারা জীবন কাটানো কিছু নয়। ওরা ওদের কাজের শেষে অন্যান্য দিকেও যেতে পারতো।

নিজেদের জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেকেই একটা নির্দিষ্ট বিষয় থেকে বিশ্রাম নেবার জন্য অন্য বিষয়ের দিকেও ঝোঁক দেয়। বড় বড় শিল্পী অথবা বিজ্ঞানীদের প্রায়ই নিজের বিষয়টি ছাড়া আরো অন্য কিছুর দিকে টান থাকে। ইংগ্রেসের (Ingres) বেহালার কথা তোমরা শুনে থাকবে। তিনি ছিলেন চিত্রকর, খুবই দক্ষতা ছিল তাঁর। কিন্তু অবসরকালে তিনি বেহালা বাজাতেন, যদিও খুব ভালো বাজাতেন না, কিন্তু সেইদিকে একটা ঝোঁক ছিল। ছবি খুব ভালো আঁকলেও সেদিকে তেমন আগ্রহ ছিল না। ভারসাম্য বজায় রাখতে তাঁর বেহালা ধরার প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য মানুষের মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ ঘটাবার পক্ষে একটা বিশিষ্ট দিকে একাগ্রতা থাকা চাই, কিন্তু জীবনের আরো সূক্ষ্ম ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য অন্য দিকেও মন দেওয়া চাই। তবে জীবনের সময় সংক্ষিপ্ত, তাই পরিনিত দেশকাল অনুযায়ী একটা বিষয়েই একাগ্রতা রাখতে হয়। তথাপি কিছু উচ্চতর ও গভীরতর জীবনবিকাশের জন্য সেটি ছাড়া অন্যান্য দিকেও মনোযোগ দিলে মানুষের মনের ক্ষমতা বাড়ে। একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সীমা উত্তীর্ণ ক'রে যেতে পারলে অন্ততপক্ষে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও কিছু চেতনা মিলতে পারে।

প্রশ্ন : মা, আমরা প্রায়ই অনেক কিছু ভুলে যাই কেন?

উত্তর : ও! তার অনেক কারণ থাকে। প্রথমত, কিছু মনে রাখবার জন্য তুমি তোমার স্মৃতিশক্তিকে প্রয়োগ করো। এই স্মৃতিটি হলো মনের যন্ত্র, যা নির্ভর করে মস্তিষ্কের গঠনের উপর। সে মস্তিষ্ক ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে, দেহের বৃদ্ধির চেয়েও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি আরো দীর্ঘকাল চলে। আর সেই কারণে সেখানে আগেকার পুরানো জিনিস লোপ পেয়ে তার স্থানে নিত্য নতুন নতুন জিনিস গাজিয়ে ওঠে। তাই মনোময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার আগেকার অবস্থাতে সাময়িকভাবে যে সকল জিনিসের দ্বারা ক্রিয়া চলছিল তা ক্রমশ মুছে যায়, কেবল তার পরিণাম ফলটাই থেকে যায়। তখনকার স্মৃতির যে সব ধাপগুলির ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ তার দাগ মুছে গেলেও তার ফলটা যা হয় তা জীবন্ত থাকে। তখন কেবল সেটাই স্মরণে থাকা দরকার, তবেই তার চেয়ে আরো নতুন গঠনের দিকে তুমি এগোতে পারবে। তাই অতঃপর মনের মধ্যে আগেকার সব নিখুঁত স্মৃতিগুলি বজায় থাকার বদলে নতুন জিনিস আসাই জরুরী।

এতে অন্য একটা দিকের কথাও আছে। মনের স্মৃতি প্রায়ই ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখনকার চেতনার অবস্থাবিশেষ অনুযায়ী। সেই চেতনা অনুযায়ী সেই মুহূর্তের স্মৃতিটা চেতনাতে

মুদ্রিত হয়ে থাকে। তোমার চেতনা যদি বিশেষ মজবুত ও সাবলীল হয়, তাহলে পরে যেকোনো সময়ে তোমার সক্রিয় চেতনাকে একাগ্র ক'রে আগেকার সেই সময়টিতে কি করেছিলে, কি ভেবেছিলে ও কি দেখেছিলে সবকিছুই বর্তমানে এনে ফেলতে পারো, আগেকার সেই চেতনাটিকে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে। সেই চেতনার জিনিস কখনো লোপ পায়না, হাজার বছরেও না। সুতরাং সে জিনিস তুমি ভুলতে চাও না, তা তোমার মনের স্মৃতিতে নয় কিন্তু চেতনাতে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। মনের স্মৃতি মুছে যাবে, তার বদলে আসবে নতুন স্মৃতি, কিন্তু চেতনাতে যার দাগ পড়েছে তা কখনো মুছবে না। কেবল সেই পূর্বচেতনার অবস্থাটি ফিরিয়ে আনতে পারলেই হলো। তা যদি সার্থকভাবে করতে পারো তাহলে হয়তো হাজার বছর আগের ঘটনাও তোমার মনে পড়ে যেতে পারে। এই ভাবেই কখনো কারো গতজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। যদিও তুমি এজন্মের ছেলেবেলাতে কি করেছিলে তা এখন আর মনে নেই, হয়তো সে কথা অন্যের মুখে শুনতে পাও, কিন্তু এইরকম জিনিস তুমি ভুলবে না। কারণ মস্তিষ্কের বেলাতে সেখানে নিত্য নতুন কোষ জন্মাচ্ছে, পুরোনো দুর্বল কোষগুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন মস্তিষ্কক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে তার আগেকার স্মৃতিও মুছে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : হাজার বছর আগের কথাও কি মনে করা যায়?

উত্তর : হাঁ, যদি হাজার বছর আগে কোনো বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ কিছুর সংস্পর্শে এসে থাকো। তা ছাড়া (আমি তা আগেও কোথায় লিখেছি যে) পার্থিব চেতনার একটা রেকর্ড থাকে। যদি তার মধ্যে তুমি যেতে পারো তাহলে কেবল তোমার গতজীবনের কথাই নয়, কিন্তু তখন পৃথিবীতে কি কি ঘটেছিল তাও তুমি জানতে পারো। চেতনার ভাণ্ডারে সবই রাখা থাকে।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, আগেকার জন্মের দেহ মন সবকিছুই যখন বদল হয়ে যায়, তখন সেই সময়কার জিনিস কেমন ক'রে এখনকার মনে আসবে?

উত্তর : সেই কথাই আমি বলেছি গো ছেলে, তুমি ভালো করে শোনোনি। আমি বলেছি যে মনের যা কিছু স্মৃতি সবকিছুই মুছে যায়; এমন কি তোমার এই বর্তমান জীবনেই ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে কি ঘটেছিল তা এখন আর কিছুই স্মরণ নেই। কিন্তু চেতনার বেলা সে কথা নয়, চেতনার জিনিসের সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত দেহলোপের সঙ্গে মনও লোপ পায়, যদি সে মন বিশেষ রকমের গঠন নিয়ে স্থায়িত্বলাভ না করে, যদিও তা হওয়া খুবই বিরল, দৈবাৎ তা হতে পারে। কিন্তু চেতনা হলো আলাদা কথা, চেতনা হলো চিরন্তনের জিনিস। চেতনা থাকে শাশ্বত। চেতনার দ্বারাই সৃষ্টির কাজ হয়, চেতনা ভিন্ন সৃষ্টিই হবেনা। সেই চেতনার সঙ্গে সংস্পর্শ যদি তুমি ঘটাতে পারো তাহলে সৃষ্টির ইতিহাস সবই তুমি জানতে পারবে, কারণ সব কিছুই হয়েছে চেতনা থেকে, এবং তা শাশ্বত।

প্রশ্ন : না, মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কুচিন্তা এসে আমাদের অস্থির ক'রে তোলে। সেটা কেমন ক'রে এড়ানো যাবে?

উত্তর : তার অনেক উপায় আছে। সাধারণত সব চেয়ে সহজ উপায় হলো অন্য বিষয়ে চিন্তা শুরু করা, কিন্তু এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মনকে তখন এমন বিষয়ে নিবিষ্ট করা যায় যার সঙ্গে ঐ চিন্তার কোনো সম্পর্কই নেই। যেমন হয়তো কোনো বই পড়তে বা কিছু রচনা করতে লেগে গেলে। যদি কেউ লেখক হয় (যেমন গল্প লেখক) তাহলে সেরূপ কিছু লেখার সময় তার অন্যসব চিন্তাই চলে যাবে, তাতেই সে নিবিষ্ট হবে। লেখা শেষ হয়ে গেলে আবার হয়তো সেই কুচিন্তা ফিরে আসতে পারে, যদি তোমার সংযম না থাকে। কিন্তু তেমন কিছু চিন্তা এলে কোনো সৃষ্টিকার্য শুরু করা, বিজ্ঞানী হলে বিজ্ঞানেরই কাজে লাগা এ হলো সব চেয়ে সহজ উপায়। তবে যারা চিন্তাসংযম করতে পারে তারা তাকে ঠেলে সরাতে পারে, যদিও ক্ষমতা ছাড়া তা করা কঠিন। কিন্তু তা করতে পারলে যথেষ্ট সুফল মেলে, তাকে বারে বারে ঐভাবে প্রত্যাখ্যান করতে থাকলে সে চিন্তা আদৌ আর আসতেই পারে না। নতুবা আবার তা আসে। এই হলো দুইরকম উপায়।

তৃতীয় উপায়, উপরের সুতীব্র আলো তার উপর এনে ফেলা, যা সম্পূর্ণভাবে তাকে ঢেকে দেবে। কুচিন্তা নিশ্চয়ই কালো রকমের (বিশেষত যদি তা আসে অবচেতন বা নিশ্চেতনা থেকে ও প্রবৃত্তির দ্বারা সরবরাহ হয়)—আর উপরের প্রজ্ঞা ও উচ্চশক্তির আলো বা জ্যোতি সেই কালো চিন্তাকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেবে, কিংবা পরিবর্তিত রূপান্তরিত ক'রে দেবে। এই হল মোক্ষন উপায়। অবশ্য কঠিন বটে কিন্তু করতে পারলে কুচিন্তা দূর হবেই, তার হেতুও দূর হবে।

প্রথমে কেবল দরকার অন্য কিছু ভাবতে শুরু করা। বারে বারে সে চেষ্টা করা চাই। দ্বিতীয়ত তার বিরুদ্ধে লড়া চাই; তৃতীয়ত তাকে রূপান্তরিত করা চাই। এতে কৃতকার্য হলে তখন স্থায়ী রকমের সাফল্য মিলবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪

প্রশ্ন : একবার চৈত্যসত্তার সংস্পর্শ ঘটলে আবার কেন তা লুকিয়ে যায়?

উত্তর : চৈত্যসত্তা নিজে লুকোয় না, কিন্তু ব্যক্তিসত্তাই আবার তার সেই বাহ্যিক চেতনাতে ফিরে যায়।...সে তার উচ্চ অবস্থাতে স্থায়ী হতে পারেনা, নিচে নেমে যায়। কিন্তু পরের বারে ওটি আরো সহজ হয়ে আসে। প্রত্যেক দফায় রাস্তা পরিষ্কার হতে হতে শেষে আর তখন নিচে নামেনা।

প্রশ্ন : বাইরের "Education" থেকে—না, এটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, "শাশ্বত আদর্শের উপলব্ধি হতে পারে কোনো অগমপন্থী (mystic) ভাবধারা অনুসারে, বা কোনো ধর্মীয় জীবনের সাহায্যে, কারণ বিশেষভাবে ধর্মগুলিই জীবনের এই দিকটায়

চর্চা করে। কিন্তু তারও প্রয়োজন না হতে পারে : ভগবান সম্বন্ধে মিস্টিক মনোভাবের পরিবর্তে সত্যের দার্শনিক অনুভূতিও ঘটতে পারে, তার ফল মূলতঃ একই রকম হবে, তবে যারা গোঁড়া প্রত্যক্ষবাদী তাদের পথ হবে ভিন্ন।"

উত্তর : এর কোনটা বুঝতে পারোনি ? অর্থাৎ যেমন ভাবেই তুমি চিন্তা করো তাতে বিশেষ কিছু যায় আসেনা, কারণ চিন্তার ধারা তৈরি হয় জন্মপরিস্থিতি ও শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে, কেবল পার্থক্য ঘটে তা ব্যক্ত করবার বেলাতে। তুমি কথাটা যেমন ভাবেই বলো, জিনিসটা সেই একই। এর কোন্ কথাটা বুঝলে না ?

প্রশ্ন : ভগবান সম্বন্ধে মিস্টিক ধারণার বদলে যদি দার্শনিক মনোভাব...

উত্তর : "ভগবান" কথাটির কী অর্থ করছ তারই উপর সব নির্ভর করে। আমি প্রায় চার পাঁচ স্থানে এ কথা বলেছি যে ওর মানে "এমন কিছু" যাকে তুমি জানোনা কিন্তু জানবার চেষ্টা করো। যদি ধর্মীয়ভাবে শিক্ষা পেয়ে থাকো তাহলে সেই প্রকারের ধারণা-কেই বলবে "ভগবান"। আর যদি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক শিক্ষা হয় তাহলে ঐ ধারণাকে নানারূপ নাম দেবে, কিন্তু ভিতরে জানবে যে তা পরমতম সত্য। যদি ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলতে বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করো তাহলে তা এমনভাবে বলতে হবে যে তা সাধারণ চেতনার বহির্ভূত, আমরা যা কিছু জানি বা ধারণা করি সে সকলেরই উপরে, যতটা বুঝতে পারি তার বাইরে, তাকেই বলি ভগবান। কোনো ধর্মে তাকে একটা বিশেষ রূপ দেয়, কোনো ধর্ম তাকে নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপদান করে, আবার কোনো ধর্মে বলে যে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবান। কিন্তু সে সবগুই মানুষের গড়া জিনিস। আসলে সে হলো "এমন কিছু" যা সম্পূর্ণ বাস্তব কিন্তু প্রকাশসাধ্য নয়, তথাপি সাধনার দ্বারা তার সংস্পর্শ মিলতে পারে। একবার যদি তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারো, তাহলে সে কী এবং কে তা অনুভব করতে পারো, কিন্তু তাকে ব্যক্ত করতে পারবে না, কারণ সে বাক্যের অতীত। যদি একটা মানসিক ধারণা জন্মায় তাহলে যে ভাষাতে তুমি রপ্ত সেই ভাষাতে তা বলবে। যদি অন্যরূপ ভাষা জানো তাহলে অন্যভাবে বলবে,—সেই ভাষাতেই তাকে ডাকবে, এমন কি সেই ভাষাতেই তাকে চিন্তাও করবে। আমি কথাটা এই ভাবে বললাম, তোমাদের বোঝাবার জন্য, যে এমন কিছু আছে যাকে ধরা যায়না—চিন্তার দ্বারাও নয়—কিন্তু সে আছে। তাকে যে নামই দাও তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সে আছেই। সুতরাং আসল জিনিস হলো তার সংস্পর্শলাভ করা— কোনো নাম দিয়ে তাকে বলতে বা ব্যাখ্যা করতে যাওয়া নয়। কেবল এই চেষ্টাই করতে হবে, তার সংস্পর্শে আসতে, তার দিকে একাগ্র হতে, তার মধ্যে অবস্থান করতে, এবং পরে যখন তার অনুভব পাবে তখন তাকে যে নামই দাও তাতে কোনো ইতরবিশেষ হবে না। অনুভব করাটাই আসল কথা। যারা সেই অনুভূতি কথার দ্বারা ব্যক্ত করতে যায়, তখন তা এমন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ করে ফেলে যেন সেই নামটি ছাড়া আর কিছু নেই—তাতেই তখন তা নিচে নেমে যায়। তোমাকে কেবল তারই মধ্যে ঢুকতে হবে—সকল পন্থা সকল অবস্থা, সকল সংগঠনের ভিতর দিয়ে। তোমাকে তারই মধ্যে বাস করতে হবে, কারণ সেই হলো একমাত্র পরম সত্য, পরম মঙ্গল,

সেই হলো সর্বশক্তিময়, সর্বজ্ঞ...হাঁ, তারই মধ্যে তুমি বাস করতে থাকবে, কিন্তু তবু তার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না। যদি বলতে যাও, সে বলার কোনো মূল্য থাকবে না। কেবল তা কোনোমতে কিছু বলাই হবে। অনেকে নানারকম দর্শনতত্ত্বে ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা দিতে বলে নির্ব্যক্তিক পরাৎপর, অথবা চরম সত্য বা প্রজ্ঞা, বা অনন্ত চিরন্তন অগ্রগতি, কিন্তু যে তার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে তার পক্ষে ওতে কিছুই যায় আসে না। আবার কেউ হয়তো সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ঘেঁটে শেষ ক'রে ফেলেও এক পা এগোতে পারেনা। কেউ বা কোন ধর্মের একান্ত ভক্ত হয়েও কিছু এগোয় না। অনেকে সারাজীবন ধ্যান করেও কোনো বিশেষ কিছু পায়নি। আবার এমন মানুষও আছে (যার দৃষ্টান্ত আমরা জানি) যারা হাতে অতি তুচ্ছ কাজ বা পুরানো জুতোসেলাইয়ের কাজ নিয়ে থাকে, অথচ ভগবৎ অনুভূতি পেয়েছে। কিন্তু তার সম্বন্ধে যে যত কিছু বলে বা ভাবে, সে হল তার সব কিছুরই অতীত। তাকে জানতে পারা এক বিশেষ রকমের প্রাপ্তি। সেজন্য দরকার কেবল তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারা, তারই মধ্যে বাস করতে পারা। এমনও ব্যাপার কখনো হয় যে কেউ হয়তো কোনো বইতে লেখা একটা বিশেষ লাইন পড়ে আলো পেয়েছে, তার থেকেই সে ওতে পৌঁছে গেল। আবার এমনও হয় যে দর্শনের বা নানা ধর্মের নানা বই পড়া সত্ত্বেও কোনো কিছু বিশেষ লাভ হলোনা। কেবল ঐ সকল বই পড়ার ফলে তাকে খানিক পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তবে তা সবই গৌণ। আসল দরকার একটিমাত্র জিনিস— একান্ত ঐকান্তিক দুর্দমনীয় ইচ্ছা, কারণ এ কাজ এক মুহূর্তে হয়ে যাবার নয়, এতে সর্বক্ষণ লেগে থাকতে হয়। যখন দেখবে যে একটুও অগ্রসর হওনি তখনও নিরাশ হওয়া চলবে না; খুঁজে দেখতে হবে যে তোমার প্রকৃতির মধ্যে কোন্ জিনিসটা তাতে বাধা দিচ্ছে, তা বুঝে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এমনি যেতে যেতে হঠাৎ একদিন তুমি এগিয়ে যাবে। শেষে তোমার মধ্যে তার অনুভূতি আসবে। আর এর মধ্যে আশ্চর্যের কথা এই যে সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের রাস্তা যারা নিয়েছে, মনের গঠনে যারা হয়তো অতি বিশ্বাসী অথবা ঘোর অবিশ্বাসী ও কঠিন বাস্তববাদী, তারা সেই অনুভূতি যখন পায় তখন দেখা যায় যে সেটা একই রকমের, সকলের পক্ষেই সমান। কারণ তাই হলো একমাত্র সদ্বস্তু, যেদিক দিয়েই দেখ, সোজাসুজি কথা হলো এই। আমি এর চেয়ে আর কিছু বলতে চাই না, কারণ আর যাই কেন বলি তার কোনো মূল্য নেই। একমাত্র দরকার কেবল আপন পথে তারই দিকে চলা, তোমার পথ যেমনই হোক।

প্রশ্ন : মা, চৈত্যসত্তা সম্বন্ধে আপনার বইএর এই কথাটি আমি বুঝতে পারিনি— "একটা কোনো ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয় আদি উৎসের মধ্যে যে অনন্ত রকমের অদৃশ্য সম্ভাবনা রয়েছে তারই একটির বাহ্য স্থানকালের মধ্যে প্রক্ষেপের দ্বারা তারই ফলে একই বিশ্বচেতনা একটা বস্তুরূপ নেয় তার আপন সত্তা বা নিয়মে এবং ক্রমিক উন্নতির পথে তার ভিতরকার জিনিস আত্মা বা চৈত্যসত্তায় পরিণত হয়।"

উত্তর : এটি হলো কিছু দার্শনিক কথা।...ভাবগত ও বিষয়গত জিনিসে তফাৎ কি তা বোঝো তো? বোঝো! তাহলে একথা বুঝবে, আমি এইমাত্র যে বস্তুরূপের কথা

বললাম তা তার আদি ভাবগত অবস্থা থেকে যাহা বিষয়গত অবস্থায় এসেছে প্রক্ষিপ্ত হয়ে এসে একই ব্যাপার হচ্ছে, ক্রমশ তার আরো অবস্থান্তর হচ্ছে। সুতরাং তার সেই অবস্থার মধ্যে তার আদি উৎসের সকল সম্ভাবনাই রয়েছে, যা ছিল অপ্রকাশিত, অনভিব্যক্ত ; বাইরে তা ক্রমশ প্রক্ষিপ্ত হয় যেমন ক'রে সিনেমার ছবি তার পর্দাতে প্রক্ষিপ্ত হয়, যেমন আমরা দেখি। তখন তার প্রত্যেকটি সম্ভাবনা ফুটে ওঠে তার আপন নিয়মে, তার বিষয়গত অস্তিত্বের মধ্যে। এই নিয়মেই তার মধ্যে চৈত্যসত্তার কেন্দ্রের উৎপত্তি। এই নিয়মকে বুদ্ধ বলতেন "ধর্ম"। সেটি হচ্ছে সত্তার ভিতরকার সত্য, যা অবিনশ্বরভাবে তার মূলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ভাবেই চৈত্যসত্তার বিকাশ শুরু। তারপর যখন ক্রমশ তা আরো স্ফুরিত হতে থাকে সিনেমার ছবির মতো, তখন সেই অভিব্যক্তির মধ্যে সে একটা পরিস্ফুট ও জটিল রূপ নেয়। কিন্তু মূলতঃ সে একই জিনিস, আদি হতে অভিন্ন। সমস্ত চৈত্যসত্তা মিলিয়ে সে সেই একই হয়ে দাঁড়ায়।...কথাটা কি সহজবোধ্য হলো না?... (প্রশ্নকারীর দিকে) এখনও কঠিন মনে হচ্ছে? আমি এই কথাটাই কিন্তু বলেছি।

প্রশ্ন : মা, আপনি বলেছেন—"নিজের ব্যক্তিগত আরাম, সুখ, উপভোগ ও সন্তুষ্টির কামনা ত্যাগ করো। কেবল তোমার মধ্যে জাগিয়ে রাখ এগিয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছা। যাই কেন আসুক, তাকেই সহায় করে এগিয়ে যাও।"

উত্তর : হাঁ, এ তো সোজা কথা। খুবই স্পষ্ট।

প্রশ্ন : কিন্তু আমি যদি খেলার দিকে অগ্রগতি চাই, তা কি ব্যক্তিগত জিনিস হয়না?

উত্তর : ও! খেলাতে? না, তোমার লক্ষ্যের উপর তা নির্ভর করে, তোমার ইচ্ছার উপর তার মূল্য। যদি চাও খ্যাতি, অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া বা ঐ ধরনের কিছু, তাহলে তা হয়ে পড়ে নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অহংকারগত,—তাতে হয়তো তুমি সফল হবে কিন্তু আসল লক্ষ্যে পৌঁছবে না। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে খুলে রাখো, এমন কি দৈহিক ব্যাপার হলেও যদি ভগবৎ প্রভাবের দিকে মন রেখে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে ওর মধ্যে তাঁকেই অভিব্যক্ত করতে চাও, তাহলে তা ঠিক কাজ হবে। বুঝলে কি?

প্রশ্ন : হাঁ।

মা : দৈহিক বিষয় হলেও তা যে অহংঘটিত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন মনের বেলাতে বা হৃদয়ের বেলাতেও তা নয়। একেবারেই তা নয়, বরং আরো কম। এর উপর কোনো স্বার্থভাব বা অহংভাব নির্ভর করেনা, সব কিছু নির্ভর করে তোমার আভ্যন্তরীণ মনোভাবের উপর। যে কোনো ক্ষেত্রেই তুমি একাগ্রতা আনো, সেখানে তোমার ভিতরকার মনোভাব কেমন তারই উপর সব কিছু নির্ভর করবে। কোন্ বিষয়ে প্রয়াস করছ তাই নয়, কোন্ ভাব থেকে করছ তারই মূল্য আসল।

প্রশ্ন : স্নেহময়ী মা, আপনি বলেছেন—"স্থূল বাহ্য ঘটনাকে বাইরের থেকে দেখার কোনো মূল্য দিও না, কারণ তা হয়তো এমন কোনো সত্যকে প্রকাশ করবার অপরিণত ব্যর্থ প্রচেষ্টা যে সত্য তোমার বাহ্যবুদ্ধির বাইরে।"

কিন্তু মা, সবাই বলে যে সন্দেহবাদী বা নিরাশাবাদী হতে নেই, কিন্তু আপনি এখানে বলছেন যে বাহ্য ঘটনাকে সর্বদাই বেঠিক মনে করতে...

উত্তর : বর্তমানের যে বস্তুজগৎ তা যে বরাবরই ভিতরকার সত্যকে বিকৃত করে এতে কোন ভুল নেই। এ কথার প্রমাণের জন্য বেশিদূর যেতে হয় না,—অবশ্য এমন মানুষ যদি থাকে যার সম্বন্ধে আমি বলেছি "The Four Austerities"তে, যারা সব কিছুকেই ঠিক ঠিক এবং ভালো চোখে দেখে, তাহলে সে কথা আলাদা, কিন্তু তেমন মানুষ আমি বেশি দেখিনি যারা চিরজীবন সে মত বজায় রাখতে পেরেছে। আমি বলছি আশাবাদীদের সম্বন্ধে, তারা যতক্ষণ সুস্থ, সবল ও যৌবন তেজে বলীয়ান থাকে ততক্ষণ যথেষ্ট আশাবাদ পোষণ করে, কিন্তু যখন তারা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল, অসুস্থ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন তাদের সেই বিশ্বাসের জোর চলে যায়। কিন্তু তা হলেও যার কিছু বোধশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে সে চারদিকে চেয়ে অনায়াসেই দেখতে পাবে যে জগতের সব কিছুই যে ভালো এবং সুন্দর এবং শুভ, তা নয়; তুমি নিজে যদি সচ্ছল অবস্থাতে আরামের মধ্যে থাকো আর তোমার কোনো অভাব না থাকে, তার মানে এই নয় যে তুমি ছাড়া পৃথিবীতে দারুণ দুঃখজনক ও অভাবগ্রস্ত অবস্থাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করছে না। অবশ্য কেবল নিজের দিক থেকে ভাবাই তোমার পক্ষে সহজ, কিন্তু তা উচিত নয়। আমি অনেক ধনী লোককে জানি যারা কখনো নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সংস্পর্শে আসেনি, তারা এমন অবস্থার কথা ভাবতেই পারে না। এক মহিলাকে জানতাম (আরো অনেককেই জানি) যিনি দাসদাসী পরিবৃত সুন্দর প্রাসাদে চিরদিন বিলাসের মধ্যে থেকেছেন,—একদিন তাঁকে বলেছিলাম একটি গুণবতী গরিব মেয়ের সম্বন্ধে, সে এমন অভাবী যে ভালোমত খাওয়া জোটেনা, বলেছিলাম তাকে সাহায্য করতে। অর্থের সাহায্য সে নেবে না, কিন্তু তাকে কোনো কাজ দিতে কিংবা নিজের কাছে এনে রাখতে (কারণ তার যথেষ্ট দার্শনিক জ্ঞান ছিল, তার সঙ্গে আলাপে সময় কাটতো ভালো)। আমি বিশেষ ক'রে বলেছিলাম যে বেচারা পেট ভরে খেতে পায়না। এ কথার অর্থ সে বুঝতে না পারাতে আমি বললাম—"অর্থের অভাব, তাই যথেষ্ট রুটি বা খাবার জিনিস কিনতে পারেনা"। মহিলাটি অবাক হয়ে বললে—"কেন, রান্নাঘরে তো রুটি আর খাবার যথেষ্টই থাকে! (হাস্য) এমন কথাটা সে অনায়াসেই বললে!*

—শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রেমায়ণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[ধন্যজন্মা প্রতিভাধর কবি নিশিকান্তের শেষ কবিতা "লীলায়ন" শুধু বাণীশিল্প নয়, তাঁর ইষ্টদর্শনের উদ্দীপক ইতিহাস। তাই তাঁর এই পুণ্য সাকোর প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ "প্রেমায়ণ" তাঁকেই উৎসর্গ করছি—গলাপুজা গঙ্গাজলে। এখানে শুধু একটু ভূমিকা করবার আছে। "লীলায়ন" বিশেষ্যটি তিনি ঠিক কী অর্থে প্রয়োগ করেছেন তাঁকে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, কারণ "অয়ন"-এর নানা আভিধানিক অর্থ আছে : গতি, বিকাশ, মুক্তি, শাস্ত্র, আশ্রয়, গৃহ ইত্যাদি। আমি গৃহ বা নিলয় অর্থেই এর প্রয়োগ করেছি : প্রেমায়ণ—প্রেমের নিলয়, দোলায়ন দোলা ওরফে অনৈশ্চিত্যের আবাস...। নিশিকান্ত সম্ভবত: দুটি অর্থে লীলায়ন শব্দটি বরণ করেছেন : লীলার রংমহল, বিকল্পে লীলার বিকাশ। ইতি। ভাদ্র, ১৩৮০ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) শ্রীদিলীপকুমার রায়।]

প্রথম বল্লী

(১)

শুনেছি—অন্তরে তোমার আরাধনা
যে করে সঙ্গীতে ছন্দে সুরে,
সাধনা হয় সেই পরম প্রার্থনা
চাহিলে কৃপা তব মর্মপুরে।
শুনেছি—প্রার্থনা যন্ত্র হয় তার
কবিতা গীতিকার গাঁথে যে প্রেমহার,
প্রদীপ জ্বালো তার মনের মন্দিরে
জ্যোতির ওগো চিরজন্মভূমি :
মধুস্রবণি ! দাও মর্তা নয়নেও
দিব্যদৃষ্টির বর যে তুমি।

(২)

শুনেছি—সাধনায় করিতে হয় বহু
যতনে এ-দীপালি লালন প্রাণে,
যখন ভালোবেসে সাধকে আলোহেসে
বরণ করো তারে শাশ্বত তানে।
আমার আরাধনাদীক্ষা তরে চাই
তোমার প্রেমায়ণ-চরণে পেতে ঠাঁই,
চাই—আমার হৃদে ফুলের মত ফুটি'
নুয়ে করি' তায় রূপে আমায়
গাহিবে : কেহ নাই এমন আপনার
তোমার মত আর এ-বসুধায়।

(৩)

জানি না আমি—হয় কেমনে আলাপিতে
তোমার প্রার্থনা নিখুঁৎ তানে,
শুনেছি শুধু—দাও উদ্দীপনা তারে
তোমারে আবাহন যে করে গানে।
আমার আছে শুধু একটি সম্বল
গাহিতে আগমনী তোমার হে শ্যামল :
বেদনা-অশ্রুর সুরেলা নিবেদন,
এ-ছাড়া আর কোন্ মন্ত্রে আমি
ডাকিব বলো ? প্রাণে ফুটালে যে-কুসুম
তারি তো মালা গাঁথি দিবসযামী !

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে নাথ,
শুনেছি—নাই যার কেহই—তারি
স্বজন-রূপে আসো মুছাতে আঁখিনীর
প্রণয়ে—হ'য়ে তার হৃদিবিহারী।
দিনের পরে দিন কাটে—আঁধার ছায়।
বিধুর আশাকলি আকোচা ঝ'রে যায়।
তোমার পথ চেয়ে যে আছে—কবে ফুটি'
উঠিবে তুমি তার তৃষা-নয়নে ?—
যে-গণে দিন—শুধু তোমার কিঙ্কিণী
শুনিতে তার হৃদিবৃন্দাবনে ?

(৫)

দয়াল তুমি—জানি, বরদ তুমি—বাণি,
দিয়েছ কত বর অশেষ দানে :
কখনো জপে ধ্যানে, কখনো কলগানে,
কবিতা-আবেশের কান্ত তানে।
কখনো, অন্তর আমার চঞ্চল
হয়েছে প্রলোভনে যখন দুর্বল,
পড়ার মুখে তুমি সাঁজোয়া হ'য়ে এসে
দাঁড়াও নি কি প্রেমে—আলোয় পলে
বিবেকতারা—যার প্রসাদে পারাবার
হয়েছি পার শুধু তোমার বলে !

(৬)

কখনো আনমনা চিত্তে অকারণ
জাগায়ে শিহরণ বাঁশির ডাকে
আমারে চিন্ময় ! করেছ ঝন্ময়
তোমার আরাধনা-উছল রাগে।
আজিও আসে ভেসে কত মধুর স্মৃতি,
কত অচিন্তিত গাঢ় কলগীতি !
কত সে হাসি—যার কাঁপনে গেছে কেটে
আমার কত সে-বিমণ্ ব্রাতি !
করুণ নিরাশার নিশীথে ঝরায়েছ
অরুণোদয় কত হে চিরসাথী।

(৭)

করেছি অভিমান আমি ক্ষণে ক্ষণে :
নিঠুর ! কেন থাকো অন্তরালে ?
আড়ালে প্রতিহত হ'য়ে তোমায় চাই
আরো—দেখাতে বুঝি জাগো আড়ালে ?
ঝরালে কতবারই কণ্ঠে তুমি নাথ,
বন্দনার কলনিঝরসম্পাত !
অবোধ আমি যবে আপন প্রতিভার
কীর্তি বলি' তারে নিয়েছি বরি'—
তখনো তুমি দিক্-ভ্রান্ত গর্বীরে
করোনি বঞ্চিত প্রসাদে, হরি !

(৮)

হে সুগোপন! কত দৈব বরদান
দিয়েছ অফুরান সৌরভের!
অন্ধ আমি, তাই তখন দেখি নাই—
সে-সবই ছিল দেবগৌরবের:
যেখানে যাহা কিছু ধরে অনিন্দিত
তোমারি অলখিত চরণচিহ্নিত,
যেখানে তুমি নাই, সেখানে শুধু হায়
দূরভিমান ছায় অর্থহীন,
যেখানে তুমি রাজো, সেখানে নরকে
কালো জলেও তব নীল নলিন।

(৯)

সুদূর বিদেশেও কত না সখাসখী
এসেছে হাতে রাখী পরাতে, অরি!
নিঃস্ব হয়েও এ-বিশ্বে কতবারই
পেয়েছি বরমালা সুখে শিহরি'।
বিদেশী ভাষা সুরে তোমারি ঝঙ্কার
নিতালি গীতালিতে শুনেছি বারবার,
তোমারি ধ্রুবতারা-প্রসাদে কালোঝড়ে
পেয়েছি তব আলোতটের দিশা।
তোমারি করুণায় দেখেছি অরুণার
তরসা জ্বলে দলি' নিরাশানিশা।

(১০)

তবুও চাই আরো শুনিতে ঝঙ্কারে
তোমার ওঙ্কারমন্ত্রবাণী,
নয়ন ভরি' চাই দেখিতে রূপ তব
ঝলকে যার হয় ধন্য প্রাণী।
আমায় নিয়ে তুমি চলেছ প্রতি খনে
মিলন-মোহানায় তোমার প্রেমায়নে,
যেখানে অনাবিল তোমার রাসলীলা
বিপুবুকে দোলে সিন্ধুসুরে:
যতই পাই দান ততই চায় প্রাণ
শুনিতে তব তান বাঁশিনূপুরে।

দ্বিতীয় বল্লী

(১)

"চাই গো দেখা" বলি' ভাসাই কেঁদে কত।
শুধু, সে-পিপাসা কি লালন করি হায়?
গাহিতে পারি কি—যে-তৃষা উষায় ফোটে
হয় না ম্লায়মান নিশার তমসায়?
বাঁধা যে নাগপাশে লক্ষ কর্মের
পারে কি রাখিতে সে তার স্বধর্মের
জ্বালিয়া নিষ্কাম দীপ অনির্বাণ,
বলিতে পারে কি সে—মনপ্রাণ তার
কর্মফল সবই তোমার রাঙা পায়
করিতে নিবেদন উছলে অনিবার?

(২)

ভয়ের মুখে আজো তাই কি মানি হার—
শুনেও শুনিতে না চেয়ে অকূলবাঁশি?
জড়ায়ে পড়ি তাই আপন উর্ণায়,
পারি না বলিতে যে, তোমায় ভালবাসি
প্রাণেরো চেয়ে চুপি' তোমার মধুরিমা
তরিব তরিব এ-ধূসরতার সীমা?
দেখি না তাই কি গো তোমার চাহনির
চমকবিদ্যুৎ প্রতিটি ফুলনরে?
তাই কি যবে প্রাণে জাগাও আকুলতা
মর্মদীপনে সে ওঠে না আলো ম'রে?

(৩)

তোমার বাঁশি ডাকে কত না মুরছনে:
"আয় রে যমুনায় প্রেমের স্নান-ব্রতে:
যেখানে প্রেমলের চরণপাতে কাঁপে
পুলক নিরুপম দুকূলভাঙা স্রোতে:
যেখানে নীলমণি-পরশে সব নীল,
মলিনা মুখ ঝাঁপে আলোকে অনাবিল,
যেখানে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলিলে গা ভাসায়ে
প্রতিটি জলকণা অপারে করে পার,
যেখানে কান পেতে শুনিলে—শোনা যায়
প্রেমায়ণের মধু-প্রেমের ঝঙ্কার।"

(৪)

সেদিন কবে বলো আসিবে এ-জীবনে
যেদিন নয়নের পড়িবে খসি' ঠুলি ?—
যেদিন প্রতি ধূলিকণায় নিরখিব
নয়নতারা তব পুলকে উঠি' দুলি' ?
যেদিন রোমে রোমে ঝঙ্কারিবে তব
নাম-জয়ধ্বনি পুলকে নব নব,
অঁাখরে কলতানে উছসি' ধূলিধামে
রচিব শুধু তব শ্যামল প্রেমায়ণ,
ধন্য চিদাকাশে আমার ঋতুরে
নিরন্তরই তব মহিমাবন্দন ?

(৫)

জানি গো জানি—তুমি করুণাময়, নাথ,
যখন পড়ি টলি' তখনো হাত ধরে
থাকো অকিঞ্চন আমার, জানি আমি—
আমায় ঘিরে রাজো বাহিরে অন্তরে।
তবু জানার মত আজিও জানি না যে—
এ-গ্লানি যেন বুকে শেলের মত বাজে,
শুধাই তাই—বলো তোমার চরণের
চিহ্ন দেখি' পাব তীর্থ দিশা কবে,
প্রতিটি ফুলে তব সুরভি-আশ্বাস
মিলিবে—কবে কোলে আমায় টেনে লবে ?

(৬)

যে বলে—"এ সকলি শুধু স্বপনডোরে
কথার মালা গাঁথা, যা চাই তারে নানা
সত্য বলি', শুধু উচ্ছ্বাসের ডালা
সাজানো তারি তরে যায় না যারে জানা ;
নয় তো কল্পনা সুরধুনীর দূতী,
যে নাই—মিলে কবে তার প্রতিশ্রুতি ?"—
যে বলে একথা—সে শোনেনি রাধাবাঁশি,
যে শোনে—ঘরছাড়া হয় সে চিরতরে
মনের ব্রজে রচি' তোমার প্রেমায়ণ
বরণ ক'রে শুধু মুরলীমনোহরে।

(৭)

কবির প্রেম নয় জলেতে আলপনা
রঙ-আকরের ডুবারি শুধু সে-ই—
দিব্যদৃষ্টির পরিধি মাঝে যার
অধরা দেয় ধরা তোমার প্রসাদেই।
পূজিতে শেখে জীব তাই তো সদাশিবে
চাহনি যাঁর অলে কবির শুভদীপে ;
দর্শনের এই দীক্ষাতরে হিয়া
চির-উদাসী, তাই গাহিয়া তাঁর গান
উধাও যুগে যুগে চারণী নীহারিকা—
বহিয়া তাঁর কবি-গরবী অভিযান।

(৮)

তামস-তন্দ্রার বিলাসমোহে মজি'
আমরা চাই ভুলে থাকিতে সে-অপারে,
সীমার মাঝে তাই পাই না অসীমায়,
অরুণবাণী ছেড়ে রহি যে তমসারে।
বেদনা তাই আসে জাগাতে চেতনায়,
বেদনা বিনা জানা যেত না যে কৃপায়।
বেদনা আসে তাই উঠাতে ধরি' হাত
আমরা ডুবি যবে অতল রসাতলে,
এ-দীক্ষাও তুমি দাও যে করুণায়—
জানাতে ঘরো বুঝি বিধুর আঁখিজলে ?

(৯)

জেনেও তবু হায় একথা জানি না যে !
তোমাকে দুষি তাই ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে,
আড়াল থেকে তুমি শোনো সে-অনুযোগ
হাসিয়া করুণায় তোমার লীলায়নে।
বেদনা ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথায় নিয়ে যায়,
কী যাদুমন্ত্রে সে জাগায় চেতনায়—
আমরা জানি না তো সে-মহাপরিণতি
পূরায় সব ক্ষতি যে তার অবদানে
অভাবনীয় এক বিকাশ-গরিমায়
গলায়ে নিরাশারে দুরাশা-কলতানে।

(১০)

শিখর-আরোহীর যখন মাঝপথে
রুদ্ধ হয় শ্বাস ঘূর্ণাবর্তনে,
অশেষ কালীদল প্রাচীর অগণন
দাঁড়ায় রচি' পথ—তখন খনে খনে
শঙ্কা সংশয় ক্লান্তি ছেয়ে ধরে,
গৃহের সুখতরে মন কেমন করে ;
তখন কে সে গায় : "অধ্রুবের আশে
কে-মূঢ় ধ্রুবধন ঠেলিয়া পায়ে ধায়
শিখর-আলেয়ার মায়াডাকের পিছু
পায় না কিছু, শুধু শান্তি সে হারায়।"

(১১)

মুরলীমনোহর শিখর-আলাপিনী
মূর্ছনায় গায় উছলি' : "নয় নয়
মৌলি মায়া—দলি' পথের শত বাধা
চলে যে-শিখরাশী হবেই তার জয়।
বেদনা বিনা জানা যেত না যেত না যে
নীলিমা-নন্দিনী অসীমা-চেতনারে,
আলেয়া মনে হয় অর্ধপথে যারে
কনককৈলাসে হয় হিরণ্ময়,
দুরাশা অমরার অভয় আশ্বোহিণী,
হতাশা জপে যে সে দুরভিসারী নয়।"

(১২)

জেনেও জানে না যে, দেখেও দেখে না যে
শিখর-আলাপিনী মুরলী তার কানে
ওঠে না বেজে হায় ! দুঃসাহসী শুধু
শোনে সে-ডাক বরি' প্রেমবলে তার প্রাণে।
অকূলবিহারীর বাঁশরী একবার
শুনেছে যন্তরে সে—নাই নিস্তার
জীবনে তার আর—সর্বহারা হ'য়ে
বরিতে হবে তাকে শিখর-অভিসার,
কোমল দীপ-জ্বালা আরাম-দোলায়নে
রহিতে পারে না তো দুলাল অসীমার।

(১৩)

নিরাশা তবু তাকে ফিরাতে গৃহে তার
হৃদয়ে দেয় হানা জাগায়ে সংশয়,
বলে সে : "নিষ্প্রাণ শিখর—সেথা নাই
বীথিকা বল্লরী কুসুম কিশলয়।
সত্য সংসার, বৈরাগীর বাণী
সোনার হরিণের রঙিন হাতছানি,
আঁধার গুহা নয় আলোর নিকেতন,
সুধার রাজধানী কামনানন্দনে,
যে চায় নির্বাণ পাবে না লভিতে সে
নূপুরীবনোহরে কুরূপ কাঁটাবনে।"

(১৪)

ফিরায় ধীরে প্রেমপথী পিছুডাকে,
অমনি বাঁশি গায় : "পেয়েছে কে ধরায়
সে-বহুদূরতে নিষ্কামনা বিনা
পিপাসা যার জপে ত্রিলোক বেদনায় ?
কামনা কুহকিনী—নয় সে প্রেমায়ণ,
শ্যামল সুন্দর প্রণয়-নন্দন
ডুবিতে ডাক দেয় প্রেমের যমুনায়,
প্রাণেশ শ্যাম যার—বাসে সে বাসে ভালো
ধনা ধরণীরে নিরখি' সব আগে
প্রতি প্রেমাঙ্কুরে তাবি প্রেমের আলো।

(১৫)

"কামনাবাসনার জগতে পায় ভোগী
ক্ষণিক বিলাসের অলীক দোলায়ন,
বেদনা ছায় পরে চক্রাবর্তনে,
দেহের সুখ নয় সুধা চিরন্তন।
বাসনা মায়াবিনী নয় তো তারাশিখা,
সে-ক্ষণসঙ্গিনী মোহিনী মরীচিকা,
ধরিতে গেলে হায় চকিতে সে লুকায়
সৌদামিনী প্রায় কৃষ্ণমেঘে, মরি!
কুহেলিকায়া সম সে বাহুবন্ধনে
মিলায় ছায়াময়ী পরমাসুন্দরী।

(১৬)

"ভোগের তৃষ্ণায় ধায় যে—পড়ে হায়
নিত্য নব ফাঁদে রঙিন কামনায়:
বিলায় রঙ্গিণী, তবু সে মায়াবিনী
ক্ষণবাসন্তীরই রূপের গুণ গায়।
আপাত-মনোহর সুখের অন্তে-যে
স্বপ্নভঙ্গের কান্না ওঠে বেজে—
শুনেও শোনে না সে, দেখে না আজো তাই
আশার উপবনে নিরাশানেষ ছায়,
কামনা হ'তে নবকামনা-দালায়নে
আকাশবুক্তির শান্তি সে হারায়।

(১৭)

"বাসনা-নিকেতন নয় তো প্রেমায়ণ,
ভালো যে বাসে পায় সুধার সন্ধান,
না চেয়ে অধিকার বিলায়ে দেয় তার
যা কিছু আপনার—তনুমনপ্রাণ।
সে-ভালোবাসা নয় সহজ, প্রতি জীবে
যে-দেখে প্রেমনাথ প্রেমাস্পদ শিবে,
সবারে বেসে ভালো জ্বালায় চির-আলো
সে তার নির্মল হৃদয়মন্দিরে:
হরষে বেদনায় সর্বেশের পায়
সর্বনিবেদনে সবই সে পায় ফিরে।

ভাদ্র, ১৩৮০—সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

পাখী

মেয়ে যেন রেলগাড়ী, মা বলেন হেসে,
কেন এত তাড়াতাড়ি, কোথা যাবে শুনি?
মেয়ে বলে,
জানি না না, বোসেদের পুকুরের পাড়ে
আতা গাছে ব'সে আছে না-জানা কী পাখী,
এক্ষুনি উড়ে যাবে।
মা হঠাৎ মনে ভাবে, এ মেয়ে বুঝিবা
আবার অজানা পাখী!
চোখে এল জল।

পূর্ণিমায়

"দখিন হাওয়ায়
খেয়া দেবো, ওগো মেয়ে,
পারে যদি কোনো কাজ থাকে তবে চলো।
কাজ নেই?
তবে অকারণে চলো ভেসে,
মোর গাঙে আজ কোটালের বান
ফাগুন পূর্ণিমায়।"

আলোছায়া

আমি ভালবাসি তোমারে এবং তোমারে,
ওগো সুন্দরী দুটি,
তোমরা দুজনে এসো;
এস কালো মায়া-কাজলবাধুরী,
এস গো গৌরী এসো,
এস আলো ছায়া পথে পথে মোর
কল্পনাজাল গাঁথো,
আলপনা আঁকো শালবীথিকার ধূলার পরে।

দান

ফুল ফোটে সে ত ঝরবে বোলেই ফোটে,
ভুলে যাবে তারে,
সে ভয় তো তার নেই।
এক বেলাকার পূর্ণতা তার অসীম কালের দান।

কবিতা

খুঁজেছিলেম কল্পলোকের
চন্দ্রতারায়;
খুঁজেছিলেম পাতালতলের
মুক্তোমণি;
এখন দেখি, শিশিরনাখা
সবুজ ঘাসে
মাটির বক্ষ আঁকড়ে আছে
আমার কবিতাটি।

দুপুরবেলা

শিরীষের ডালে রোদঝিলমিল্ পাতার খেলা,
পিঠে ন্যাজ তুলে বহুয়ার গাছে খেলায় কাঠবিড়ালী;
অশ্বত্থ-তলে তিনটে কুকুর
ছুটোছুটি কোরে গেলে।
পুকুরের ঘাটে জলে পা ডুবিয়ে
চুপ করে মোর খেলা।

চঞ্চলা

বিদায় বেলায় বলেছিলেম, ভুলবে না তো মোরে।
বললে তুমি, রাখবো মনে চিরদিনের মত।
ফিরে এলেম, দেখি, তুমি
তেমনি তো চঞ্চলা,
আপন সাথে খেলায় অন্যমনা।
তোমার ভোলা মনকে তখন নতুন কোরে পাই
নতুন সাধনায়।

কেতকী

আজি বাদলের বাপার দেবতা
বিদ্যুৎকাঁচা গেঁথে
বক্ষে পরেছে মালা,
কেতকীর মুখে লাগালো কাঁটার হাসি।

ফড়িং

পুকুরভরা জলে ঝরে
টুপুর-টাপুর জল,
সবুজ পাতায় পাতায় নাচে
সবুজ ফড়িংটি।
মনে আমার উঠ্‌লো জেগে
হাল্‌কা লয়ের নাচ
বাদ্‌লা-বেলার চঞ্চলতার তালে।

দোয়েল

সুরভরা ঐ সভার মাঝে বসন্ত উৎসব,
লাগ্‌লো ভালো কালো মেয়ের গান,
সে যেন ঐ বকুলবীথির দোয়েল পাখীর মতো।

অকারণ

শালবীথিকার পথে যেতে
দুই সখি সেই দিন
দুপুরবেলায় মোরে দেখে
হাস্‌লো অকারণে।
সেই হাসি কি টান্‌লো আমায়
কিম্বা সরিয়ে দিল,
সেই কথাটাই ভাবি।

বেলিফুলের মালা

ওকি তোমার মেঘের বুকে বকের পাঁতি!
ওকি তোমার কাজলা-নদীর শালবালির বাঁক!
ওগো, তোমার খোঁপার চুলে
বেলিফুলের মালা
যতই দোলে—দোলায় মনে
নতুন উপমা।

হঠাৎ হাওয়ায়

হঠাৎ কখন ঝড়ের হাওয়ায় ওড়ে
ছিঁড়ে-পড়া নতুন অশোক পাতা।
তারি সাথে এই যে উড়ে এলো
কার সে চুলের ফিতে।

জঙ্গল

বন্ধু বলেন, তোমার কাব্য
ও যেন জঙ্গল।
আমি বলি, জঙ্গলে সেই
বসন্ত দেয় ধরা॥

মনের সুর

মণি বোসে বোসে
গান করে আর বলে—
গলায় মেলাতে পারিনে তোমার গান।
আমি বলি—মণি, ও গানের সুর
মিলেছে তোমার মনে,
গলা তাই আর নাগাল না পায় তারে।

সকালের গান

শিরীষ ফুল, শিশির জল, পাখীর ঝাঁক,
সোনার রঙ মেঘের গায়।
বন্ধু ভাই, তোমার গান থাকনা আজ।

বাতাস

যে বাতাসে চপল নাচে
কাশবনে দেয় দোল,
সেই বাতাসেই দোলায় আমার না-বলা সব কথা।

বেরসিক

বন্ধু আমার কবিতার খাতা ছিনিয়ে নিয়ে
ফেলে দিল টান মেরে—
আমি ভাবি, ওটা ভারি বেরসিক লোক।

হাত ধরে মোরে নিল জানালার কাছে,
দেখি, বাগানেতে ডুরে সাড়ী পরা মেয়ে
কলসা গাছের ডাল ধরে দেয় নাড়া।

স্মৃতি

দেয়ালেতে ছবির পরে ধুলো,
টবের গোলাপ শুকিয়ে হলো কাঠি ;
সেই সাড়ী আর সেই আলোয়ান নিয়ে
পাট করে আর গুছিয়ে রাখা কেন ?

ভস্মবাসর

ঘরের কোণে ভাঙা চুড়ি,
মেঝের উপর শুকনো ফুল।

একটি কথা

মোর কেদারার হাতার 'পরে চ'ড়ে বোসে
নিতাই বলে, কিছুই ভালো লাগ্‌চে না আজ।
অনেক কথা বল্‌লে সে যে অনেক বেলা,
একটি কথা বলার সময় বোয়ে গেল।

ঋণগ্রস্ত

চোখের কোণে দিয়ে গেল হাসি,
গানের সুরে শুধ্‌চি তারই ঋণ।

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

নীলনাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা–১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা–৯

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo		
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		১·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম	.. ..	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ -জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৩·৫০
দিব্য জীবনের সন্ধানে	.. ..	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

২৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির